সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

খেলাফত ও রাজতন্ত্র

খেলাফত ও রাজতন্ত্র

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ১১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৫

৬ষ্ঠ প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২২
শ্রাবণ	১৪০৮
জুলাই	২০০১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

خلافت وملوكيت -এর বাংলা অনুবাদ

KHELAFAT-O-RAJTANTRO by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Net Price : Taka 76.00 Only.

গ্রন্থকারের ভূমিকা

ইসলামে খেলাফতের সত্যিকার ধারণা কি প্রথম যুগে কোন মূলনীতির ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কি কি কারণে তা রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছে, এ পরিবর্তনের পরিণতি কি দেখা দিয়েছে; তা যখন দেখা দেয় তখন উম্মতের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?–এ গুলো হচ্ছে এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।

কুরআন মজীদের যেসব আয়াত দ্বারা রাজনীতির মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোক সম্পাত হয়, এ সব বিষয় বিশ্লেষণের নিমিত্ত আমি সর্বাগ্রে সে সব আয়াতকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত করেছি, যাতে আল্লার কিতাব যে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করতে চায়, পাঠকের সম্মুখে যুগপৎ তা উদ্ভাসিত হতে পারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, কুরআন-সুন্নাহ এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের উক্তি দ্বারা আমরা ইসলামের শাসননীতি সম্পর্কে কি জানতে পারি। ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত খেলাফতে রাশেদার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। এর পরের অধ্যায়ে সেসব কার্যকারণ আলোচিত হয়েছে, যা খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণের কারণ হয়েছিল; কোন্ ধারায়, কোন্ পর্যায়ে এ পরিবর্তন সূচীত হয়েছে তাও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অতপর দু'টি স্বতন্ত্র অধ্যায় এ জন্য সংযোজন করা হয়েছে যে, খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে সত্যিকার পার্থক্য কি, রাজতন্ত্র খেলাফতের স্থান গ্রহণ করায় কি কি পরিবর্তন সূচীত হয়েছে, খেলাফতে রাশেদার পতন কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় মতবিরোধের সূচনার কারণ হয়েছিল আর এ সব বিরোধের ফলে কি কি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। অতপর আমি আলোচনা করেছি, রাষ্ট্রশাসন নীতিতে এ পরিবর্তন মুসলমানদের জীবনে যে ছেদ সৃষ্টি করে, তা পূরণ করার জন্যে উম্মাতের আলেম সমাজ কি কি চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)–এর কর্মধারা পেশ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে নানা মহল থেকে কঠোর সমালোচনাও হয়েছে। এ সবের মধ্যে যা যুক্তিগ্রাহ্য, পরিশিষ্টে আমি তার জবাব দিয়েছি। অবশিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আমার নিকট অনুভূত হয়নি। আমার গ্রন্থ এবং সমালোচকদের উক্তি দেখে বিজ্ঞ পাঠক মন্ডলী নিজেরাই অভিমত পেশ করতে পারেন।

লাহোর — আবুল আ'লা

২৮ সফর, ১৩৮৬ হিজরী

"খিলাফত ও মুলূকিয়াত" মাওলানা মওদূদী (রঃ)–এর এক অনবদ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি একদিকে যেমন কুরআন প্রদত্ত ইসলামী রাষ্ট্র ও রাজনীতির ধারণা পেশ করেছেন, অপরদিকে তেমনি রাসূল করীম (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন পরিচালিত ইসলামী খিলাফতের বাস্তব রূপ পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। অতপর খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্য তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে যারা খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের কাংখিত রাষ্ট্রের রূপরেখা এ গ্রন্থে রয়েছে।

ইসলামী খিলাফত কি কারণে এবং কিভাবে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং রাজতন্ত্রে ইসলামী খিলাফতের যেসব নীতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলো তিনি ধামাচাপা না দিয়ে নির্দ্বিধায় এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। সে জন্যে কিছু লোক তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছে। যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনার তিনি জবাব দিয়েছেন, যা এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। নিরেট খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা দান করবে বলে আমরা আশাকরি।

গ্রন্থটি অনূদিত হবার পর পুরোটাই সম্পাদিত হবার প্রয়োজন ছিল। প্রথমদিকে প্রায় অর্ধাংশ সম্পাদিত হয়েছে। বাকিটা দ্বিতীয় সংস্করণেও সম্পাদনা করা গেল না। ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তা করে দেয়া হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের আকাংখীগণ গ্রন্থটি দ্বারা উপকৃত হলেই এর অনুবাদ এবং প্রকাশনা কাজ সার্থকহবে।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়ঃ ১

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ৫৩

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ৭৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ৯৫

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ১৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ১৭৫

সপ্তম অধ্যায়ঃ ১৮৭

অষ্টম অধ্যায়ঃ ২০৫

নবম অধ্যায়ঃ ২২৯

সমালোচনার জবাবে ২৪৫

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা

একঃ বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা

বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনের মৌলিক চিন্তাধারার উপরই তার রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের রাজনৈতিক মতবাদ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তা অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। রাজনৈতিক দর্শনের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত ধারাগুলো আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেঃ

(ক) সমগ্র বিশ্ব-জাহান, মানুষ এবং বিশ্ব-জাহানে যে বস্তুরাজি দ্বারা উপকৃত হয়, আল্লাহ তাআলা সে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط (الانعام : ٧٣)

—এবং তিনিই আসমান যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ط (الرعد : ١٦)

—বল, আল্লাই সকল বস্তুর স্রষ্টা, আর তিনিই একক, মহা-প্রতাপশালী।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج

—লোক সকল! তোমাদের সে রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, আর এতদোভয় থেকে তিনি অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। —আন-নিসা ঃ ১

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ق (البقرة : ٢٩)

—তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনের সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط (فاطر: ٣)

—আল্লাহ ছাড়া এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে আসমান-যমীন থেকে তোমাদেরকে রিয্‌ক (জীবিকা) দান করে? —আল-ফাতির ঃ ৩

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الْخَالِقُونَ ۝ ...... أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْ
رَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝ ...... أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي
تَشْرَبُونَ ۝ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِ
لُونَ ۝ ...... أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ أَأَنتُمْ
أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۝ (الواقعة : ٥٨–٧٢)

—তোমরা কি ভেবে দেখেছো? তোমরা যে শুক্রপাত করো তা থেকে শিশু তোমরা জন্ম দাও, না আমি তার জন্মদাতা?....তোমরা কি চিন্তা করেছো? এই যে তোমরা বীজ বপন করো, তা তোমরা উৎপাদন করো, না আমি তার উৎপাদক? ....তোমরা কি চিন্তা করেছো? তোমরা যে পানি পান করো, মেঘমালা থেকে তোমরা তা বর্ষণ করো, না আমি তার বর্ষণকারী? ....তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো? তোমরা যে আগুন জ্বালাও; তার বৃক্ষ তোমরা সৃষ্টি করেছো? না আমি তার স্রষ্টা? —আল-ওয়াকিয়া ঃ ৫৮-৭২

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى (طٰهٰ : ٦)

—আসমান-যমীন, এতদোভয়ের মধ্যস্থল এবং মাটির গভীর তলদেশে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। —ত্বা-হা ঃ ৬

(খ) তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্বের মালিক, পালক, নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালকও আল্লাহ্ তায়ালা-ই ঃ

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ٥ (الروم : ٢٦)

—আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সব কিছুই তাঁর। সব কিছুই তাঁর ফরমানের অনুগত।

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ (الاعراف : ٥٤)

—চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারকা তিনি সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত। সাবধান। সৃজন এবং কর্তৃত্ব তাঁরই। আল্লাহ্ সারা জাহানের মালিক-পরওয়ারদেগার, একান্ত বরকতের অধিকারী।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۤءِ اِلَى الْاَرْضِ (السجده : ٥)

—আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তিনিই করেন।

(গ) এ বিশ্ব-জগতে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার; আর কারো তা নেই, হতেও পারে না। সার্বভৌমত্বে তাঁর অংশীদার হওয়ার অধিকারও নেই কারো ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط (البقره : ١٠٧)

—তুমি কি জাননা যে, আসমান-যমীনের রাজত্ব আল্লার?

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (الفرقان : ٢)

—এবং রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। —আল-ফোরকান ঃ ২

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ز وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○ (القصص : ٧٠)

—দুনিয়া-আখেরাতের সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য; হুকুম দেয়ার ইখতিয়ার কেবল তাঁরই আছে। তোমরা তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (الانعام : ٥٧)

—আল্লাহ ছাড়া আর কারো ফায়সালার ইখতিয়ার নেই। —আনআম ঃ ৫৯

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ز وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ○

—তিনি ছাড়া বান্দাদের আর কোন ওলী-পৃষ্ঠপোষক নেই। আপন নির্দেশে তিনি কাউকে শরীক করেন না। —আল-কাহ্‌ফ ঃ ২৬

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ط (آل عمران : ١٥٤)

—তারা বলে, আমাদের ইখতিয়ারের মধ্যে কিছু আছে কি? বল, ইখতিয়ার সর্বতোভাবে আল্লারই। —আলে-ইমরান ঃ ১৫৪

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ط (الروم : ٤)

—ইখতিয়ার আল্লারই হাতে—শুরুতেও এবং শেষেও। —আর-রুম ঃ ৪

له ملك السموت والارض ط والى الله ترجع الامور ○

—আসমান যমীনের বাদশাহী তাঁরই। সমুদয় ব্যাপার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।
—আল-হাদীদ ঃ ৫

افمن يخلق كمن لا يخلق ط افلا تذكرون ۝ (النحل : ١٧)

—যে পয়দা করে, সে কি তার মতো হতে পারে, যে পয়দা করে না? তোমরা কি চিন্তা করো না? —আন-নাহাল ঃ ১৭

ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ط (الرعد : ١٦)

—তারা কি আল্লার জন্য এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে, যারা আল্লার মতো কিছু সৃষ্টি করেছে? যাতে সৃষ্টির ব্যাপারটি তাদের কাছে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে। —আর-রাআ'দ ঃ ১৬

قل ارءيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ط

اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السموت ج ......

ان الله يمسك السموت والارض ان تزولا ج ولئن زالتا

ان امسكهما من احد من بعده ط (فاطر : ٤٠-٤١)

—বল, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা (রব হিসেবে) ডাকো, তোমাদের সে সব কল্পিত শরীকদেরকে তোমরা কি কখনো দেখেছো? আমাকে দেখাও, যমীনে তারা কী সৃষ্টি করেছে?

অথবা আসমানে তাদের কোন অংশ আছে? ....মূলত আল্লাহ্-ই আসমান-যমীনকে বিচ্যুতি থেকে আটকে রেখেছেন। আর যদি তা বিচ্যুত হতে থাকে তাহলে তিনি ব্যতীত এমন কেউ নেই, যে তাকে সামলে রাখতে পারে। —ফাতের ঃ ৪০—৪১

(ঘ) সার্বভৌমত্বের সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য, সকল ক্ষমতা-ইখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লার সত্তাতেই কেন্দ্রীভূত। এ বিশ্ব-চরাচরে অন্য কেউ এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অধিকারী আদৌ নেই। তিনিই সকলের ওপর পরাক্রমশালী, তিনি সব কিছুই জানেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত তিনি। সকলের নেগাহ্বান, রক্ষক। সকলের নিরাপত্তা বিধায়ক। চিরঞ্জীব, সদাজাগ্রত, সকল বস্তু-নিচয়ের ওপর ক্ষমতাবান। সকল ক্ষমতা ইখতিয়ার তাঁর হাতে নিবদ্ধ। সমুদয় বস্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁরই ফরমানের অনুগত। কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুই তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি ব্যতীত এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না; পারে না কোন উপকার করতে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর সামনে সুপারিশ পর্যন্ত করতে পারে না। তিনি যাকে চান, পাকড়াও করেন, যাকে খুশী ক্ষমা করেন। তাঁর নির্দেশের ওপর পুনরুক্তি করতে পারে, এমন কেউ নেই। তাঁকে কারো সামনে জবাবদিহি করতে হয় না, কৈফিয়ত দিতে হয় না। সকলেই তাঁর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। তাঁর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে। তাঁর নির্দেশ রদ করতে পারে-এমন ক্ষমতা কারুর নেই। সার্বভৌমত্বের এ সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য কেবল আল্লার জন্য নির্দিষ্ট। এতে কেউই তাঁর শরীক-অংশীদার নেই ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

—তিনিই তো তাঁর বান্দাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অধিকারী— কর্তৃত্বের মালিক। তিনি মহাজ্ঞানী, সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। —আল-আনআম ঃ ১৮

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ◎ (الرعد : ٩)

—প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞাতা মহান, বিপুল মর্যাদার অধিকারী। —রাআদ ঃ ৯

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط (الحشر : ٢٣)

— রাজ্যাধিপতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত। ভুল ভ্রান্তি মুক্ত, শান্তি-নিরাপত্তা দাতা, হেফাজতকারী, প্রতাপশালী, শক্তিবলে নির্দেশ জারিকারী, বিপুল মহিমার অধিকারী, মহত্বের মালিক।

الحي القيوم ج لا تاخذه سنة و لا نوم ط له ما في السموت و ما في الارض ط من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ط يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ج (البقرة : ٢٥٥)

—তিনি চিরঞ্জীব, আপন ক্ষমতাবলে উদ্ভূত। নিদ্রা–তন্দ্রা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান–যমীনে যা কিছু আছে। সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে, এমন কে আছে? যা কিছু মানুষের সামনে আছে, তাও তিনি জানেন ; আর যেসব বিষয় তাদের নিকট প্রচ্ছন্ন তাও তিনি পরিজ্ঞাত। —আল–বাকারা ঃ ২৫৫

تبرك الذي بيده الملك ز و هو على كل شيء قدير ◎

—সকল বরকত–মহিমা সে মহান সত্তার, বাদশাহী যাঁর হাতে। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। —আল–মূলক ঃ ১

بيده ملكوت كل شيء و اليه ترجعون ◎ (يس : ٨٣)

—সমুদয় বস্তুর ইখতিয়ার তাঁর হাতে। তোমাদেরকে তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে।

و له اسلم من في السموت و الارض طوعا و كرها ـ

—আসমান–যমীনে বসবাসকারী সকলেই ইচ্ছায়–অনিচ্ছায় তাঁরই নির্দেশের অনুগত।

—আলে ইমরান ঃ ৮৩

ان العزة لله جميعا ط هو السميع العليم ○ (يونس : ٦٥)

—সকল ক্ষমতা তাঁরই হাতে ন্যস্ত। তিনি সব কিছু শোনেন, জানেন। —ইউনুস ঃ ৬৫

قل امن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا

أو أراد بكم نفعا ط (الفتح : ١١)

—বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের ক্ষতি করতে চান, তাহলে তা থেকে তোমাদেরকে সামান্য পরিমাণ বাঁচাবার ক্ষমতা কার আছে? অথবা তিনি যদি তোমাদের উপকার করতে চান (তা হলে কে তাঁকে বাধা দিতে পারে?)। —আল-ফাত্হ্ঃ ১১

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ج وإن يردك

بخير فلا راد لفضله ط يصيب به من يشاء من عباده ط وهو

الغفور الرحيم ٥ (يونس : ١٠٧)

— আল্লাহ্ যদি তোমার ক্ষতি করেন, তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করার নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেয়ার কেউ নেই। নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান, অনুগ্রহ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ط

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ط والله على كل شيء قدير ٥

—তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ,আল্লাহ্ তার হিসেব নেবেন; অতঃপর যাকে ইচ্ছা মাফ করেন, যাকে খুশী শাস্তি দেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। —বাকারা ঃ ২৮৪

أبصر به وأسمع ط ما لهم من دونه من ولي ز ولا يشرك

في حكمه أحدا ٥ (الكهف : ٢٦)

—তিনি পূর্ণমানের শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি ছাড়া বান্দাদের কোন ওলী—পৃষ্ঠপোষক নেই। তিনি স্বীয় নির্দেশে কাউকে শরীক করেন না। —আল-কাহাফ ঃ ২৬

قل انى لن يجيرنى من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ○ (الجن : ٢٢)

—বল, কেউ আমাকে আল্লার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থলও পেতে পারি না। —আল-জ্বিন ঃ ২২

وهو يجير ولا يجار عليه (المؤمنون : ٨٨)

–তিনি আশ্রয় দান করেন, তাঁর মুকাবিলায় কোনো আশ্রয় দেয়া যায় না। –মু'মিনূন ঃ ৮৮

انه هو يبدئ ويعيد ◎ وهو الغفور الودود ◎

ذو العرش المجيد ○ فعال لما يريد ○ (البروج: ١٣ — ١٦)

–তিনিই সূচনা করেন, তিনিই পুনরুত্থান করেন। তিনি ক্ষমা, মার্জনাকারী। তিনি ভালবাসেন। রাজ্য-সিংহাসনের মালিক, মহান তিনি। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। —আল-বুরুজ ঃ ১৩-১৬

ان الله يحكم ما يريد ○ (المائدة : ١)

—নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা খুশী, ফায়সালা করেন। —আল-মায়েদা ঃ ১

والله يحكم لا معقب لحكمه ط (الرعد : ٤١)

—আল্লাহ ফায়সলা করেন। তাঁর ফায়সলা পূনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। —আর-রাআদ ঃ ৪১

لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ○ (الانبياء : ٢٣)

—তিনি যা কিছু করেন, তার জন্য তাঁকে কারো সামনে জবাবদিহি করতে হয় না। অন্য সকলকেই তাঁর সামনে জবাবদিহি করতে হয়। —আল-আম্বিয়া ঃ ২৩

لا مبدل لكلمته ج ولن تجد من دونه ملتحدا ○

—তাঁর ফরমান পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁর মুকাবিলায় তুমি কোন আশ্রয় স্থল পাবে না।
—আল-কাহাফ ঃ ২৭

اليس الله باحكم الحكمين ـ (التين : ٨)

—আল্লাহ্ কি সব শাসনকর্তার বড় শাসনকর্তা নন? —আত-তীন ঃ ৮

قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع
الملك ممن تشاء ز وتعز من تشاء وتذل من تشاء ط بيدك
الخير ط انك على كل شيء قدير ○ (ال عمران : ٢٦)

—বল, হে খোদা। রাজ্যাধিপতি। যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো; আর যার কাছ থেকে খুশী, রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে খুশী সম্মান দাও, যাকে খুশী অপমান কর। সকল কল্যাণ তোমার ইখতিয়ারাধীন। তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। —আলে-ইমরান ঃ ২৬

ان الارض لله لا يورثها من يشاء من عباده ط (الاعراف : ١٢٨)

—বস্তুত যমীন আল্লার। আপন বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান, তাঁর উত্তরাধিকারী করেন।
—আল-আ'রাফ ঃ ১২৮

দুই ঃ আল্লার সার্বভৌমত্ব

বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে এহেন ধারণার ভিত্তিতে কুরআন বলে, বিশ্ব জাহানের যিনি শাসক পরিচালক, মানুষের শাসক পরিচালকও তিনিই। মানুষের কাজ কারবারেও তিনিই সর্বময় কর্তৃত্বের আধিকারী এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মানবীয় ও অ-মানবীয় শক্তির নিজের পক্ষ থেকে নির্দেশ-ফায়সালা দান করার কোন অধিকার নেই। তবে এ ক্ষেত্রে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, বিশ্ব ব্যবস্থায় আল্লার নিজস্ব শক্তিতেই তাঁর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, এ জন্য কারোর স্বীকৃতির

প্রয়োজন হয় না। এমনকি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ পর্যন্ত সমুদয় বস্তু যেমন তাঁর অনুগত, ঠিক তেমনি মানুষও তার জীবনের ইখতিয়ার বহির্ভূত বিভাগে স্বভাবত তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং কর্তৃত্বের অধীন। তাঁর এ সার্বভৌমত্ব জোর করে চাপিয়ে দেন না। বরং প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থাদির মাধ্যমে, যার মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন—তিনি মানুষকে আহ্বান জানান ইচ্ছা ও চেতনা সহকারে তাঁর এ সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার এবং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করার জন্য। এ পর্যায়ের বিভিন্ন দিক কুরআনে স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

(ক) বস্তুত বিশ্ব-জাহানের রবই মানুষের রব। তাঁর রবুবিয়্যাত স্বীকার করে নেয়াই বাঞ্ছনীয় ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ ... ... قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ط (الانعام : ١٦٢ - ١٦٤)

—বল,আমার সালাত,আমার জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিমিত্ত ..... বল ঃ আল্লাহ ছাড়া আমি কি অন্য কোন রব তালাশ করবো? অথচ তিনিই তো সকল বস্তুর রব। —আল-আনআম ঃ ১৬২—১৬৪

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (الاعراف : ٥٤)

—বস্তুত আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। —আল-আ'রাফ ঃ ৫৪

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلَٰهِ النَّاسِ ○ (الناس : ١-٣)

—বল, মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের মা'বুদের কাছে আমি আশ্রয় চাই।

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

الحي و من يدبر الامر ط فسيقولون الله ج فقل افلا تتقون ○
فذلكم الله ربكم الحق ج فماذا بعد الحق الا الضلل ج
فانى تصرفون ○ (يونس : ٣١-٣٢)

—বল, কে তোমাদেরকে আসমান-যমীন থেকে রিযক দান করেন? শ্রবণ এবং দর্শন শক্তি কার ইখতিয়ারভুক্ত? কে নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে নিষ্প্রাণ বের করেন? কে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা ভয় করো না? আল্লাহ তো তোমাদের প্রকৃত রব। সত্যের পরে গুমরাহী ব্যতীত আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? তাহলে তোমরা কোথায় ঠোকর খেয়ে বেড়াচ্ছো? —ইউনুস ঃ ৩১-৩২

(খ) নির্দেশ দান এবং ফায়সালার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। মানুষের উচিত তাঁরই বন্দেগী করা। এটাই সঠিক পন্থা ঃ

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ط (الشورى : ١٠)

—তোমাদের মধ্যে যে মতভেদই হোক না কেন, তার ফায়সালা করা আল্লার কাজ।

ان الحكم الا لله ط امر الا تعبدوا الا اياه ط ذلك الدين
القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ○ (يوسف : ٤٠)

—আল্লাহ ছাড়া আর কারো নির্দেশ নেই। তাঁরই ফরমান যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করো না। এটিই তো দ্বীনে কাইয়্যেম— সত্য-সঠিক জীবন বিধান। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। —ইউসুফ ঃ ৪০

يقولون هل لنا من الامر من شيء ط قل ان الامر كله
لله ط (ال عمران : ١٥٤)

—তারা বলে,আমাদেরও কি কোন ইখতিয়ার আছে? বল, সমস্ত ইখতিয়ার আল্লারই।

(গ) একমাত্র আল্লাই হুকুম দেয়ার অধিকার ও ইখতিয়ার রাখেন। কারণ তিনিই স্রষ্টা ঃ

ألا له الخلق والأمر ط (الأعراف : ٥٤)

—সাবধান। সৃষ্টি তাঁর, নির্দেশও তাঁরই। —আল আ'রাফ ঃ ৫৪

(ঘ) একমাত্র আল্লাই নির্দেশ দেয়ার অধিকার রাখেন। কারণ তিনিই সমগ্র জগতের বাদশাহ ঃ

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... ... ألم

تعلم أن الله له ملك السموت والأرض ط (المائدة : ٣٨-٤٠)

—চোর-নারী-পুরুষ-উভয়ের হাত কেটে দাও। তুমি কি জাননা যে আসমান-যমীনের বাদশাহী আল্লারই জন্য? —আল-মায়েদা ঃ ৩৮-৪০

(ঙ) আল্লার নির্দেশ সত্য-সঠিক এজন্য যে, তিনিই বাস্তব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন এবং তিনিই সঠিক পথ নির্দেশ দিতে পারেন ঃ

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ج وعسى أن

تحبوا شيئا وهو شر لكم ط والله يعلم وأنتم لا تعلمون ۝

—হতে পারে একটি জিনিস তোমাদের মনপূত নয়; অথচ তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং হতে পারে, একটি জিনিস তোমাদের মনপূত ; অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাই জানেন, তোমরা জান না। —আল-বাকারা ঃ ২১৬

والله يعلم المفسد من المصلح ط (البقرة : ٢٢٠)

—কে বিপর্যয়কারী,আর কে সংশোধনকারী তা আল্লাহ জানেন। —আল-বাকারা ঃ ২২০

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ج ولا يحيطون بشيء

مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ج (البقرة : ٢٥٥)

—যা কিছু তাদের সামনে আছে, তাও তিনি জানেন আর যা তাদের নিকট প্রচ্ছন্ন, তার খবরও তিনি রাখেন। তিনি যেসব বিষয় জ্ঞান দান করতে চান তা ব্যতীত তারা তাঁর জ্ঞানের কোন বিষয়ই জানতে পারে না। —আল-বাকারা ঃ ২৫৫

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...... ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ط

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ (البقرة : ٢٣٢)

—তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও আর তারা তাদের ইদ্দতের মেয়াদে পৌছে, তখন তাদেরকে (নিজেদের পছন্দসই) স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বারণ করো না। ..... ইহা তোমাদের জন্য অধিক মার্জিত এবং পবিত্র পন্থা। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ق...... آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ○ (النساء : ١١)

—তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেদায়াত দিচ্ছেন। .... তোমাদের পিতা-মাতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে উপকারের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা জান না। উত্তরাধিকারের হিস্যা আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।

يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ط ...... يُبَيِّنُ

اللہ لکم ان تضلوا ط و اللہ بکل شیء علیم ٥ (النساء : ١٧٦)

—তারা তোমার কাছে জানতে চায়। বল,আল্লাহ 'কালালা' সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাচ্ছেন।.....আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে বিধান বিশ্লেষণ করছেন, যাতে তোমরা বিপথগামী না হয়ে যাও। এবং তিনি সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন। —আন-নিসা ঃ ১৭৬

و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتب اللہ ط ان اللہ بکل شیء علیم (الانفال : ٧٥)

—আল্লার কিতাবে আত্মীয়-স্বজনরা (অন্যদের তুলনায়) বেশী হকদার। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। —আল-আনফাল ঃ ৭৫

انما الصدقت للفقراء ... ... فریضة من اللہ ط و اللہ علیم حکیم (التوبة : ٦٠)

—সদকা তো নিঃস্বদের জন্য। ....ইহা আল্লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। —আত-তাওবা ঃ ৬০

یایها الذین امنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم

... ... کذلک یبین اللہ لکم الایت و اللہ علیم حکیم ٥

—হে ঈমানদারগণ। তোমাদের দাস-দাসীরা অনুমতি নিয়ে যেন তোমাদের কাছে হাযির হয়। ....এমনি করে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ খুলে বলেন। তিনি সব কিছু জানেন; মহাজ্ঞানী তিনি। —নূর ঃ ৫৮-৫৯

یایها الذین امنوا اذا جاءکم المؤمنت مهجرت

২—

فامتحنوهن ط ... ذلكم حكم الله ط يحكم بينكم ط والله عليم
حكيم ○ (الممتحنة: ١٠)

—হে ঈমানদারগণ। যেসব মুমিন মহিলা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তাদেরকে পরীক্ষা করো ...এটা আল্লার বিধান। তিনি তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।

তিন : আল্লার আইনানুগ সার্বভৌমত্ব

এ সব কারণে কুরআন ফায়সালা করে যে,আনুগত্য হবে নিরঙ্কুশ ভাবে আল্লার আর অনুসরণ অনুবর্তন হবে তাঁর আইন-বিধানের ; এটিই বাঞ্ছনীয়। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের অথবা নিজের নফসের খাহেশের অনুসরণ নিষিদ্ধ :

انا انزلنا اليك الكتب بالحق فاعبد الله مخلصا
له الدين ○ الا لله الدين الخالص ط (الزمر: ٢)

—(হে নবী) আমরা এ কিতাব যথাযথভাবে তোমার প্রতি নাযিল করেছি। সুতরাং দ্বীনকে আল্লার জন্য খালেছ করে তাঁর বন্দেগী করো। সাবধান! খালেছ দ্বীন আল্লারই জন্য।

قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين لا وامرت
لان اكون اول المسلمين (الزمر: ١١ - ١٢)

—বল দ্বীনকে আল্লার জন্য খালেছ করে তাঁর বন্দেগী করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আমিই যেন সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির অবনতকারী হই। —আয-যুমার : ১১-১২

ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا
الطاغوت ج (النحل: ٣٦)

— এবং আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি (এ নির্দেশ দিয়ে) যে,আল্লার বন্দেগী করো এবং তাগূত থেকে বিরত থাকো।[১] —আন-নহল ঃ ৩৬

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا حنفاء ه

—দ্বীনকে আল্লার জন্য খালেছ করে নিবিষ্টভাবে তাঁর বন্দেগী করা ব্যতীত তাদেরকে আর কোন নির্দেশই দেয়া হয়নি। —আল-বাইয়্যেনা ঃ ৫

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من

دونه اولياء ط (الاعراف : ٣)

—তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ কর তা বাদ দিয়ে তোমাদের নেতাদের অনুসরণ করো না। —আল-আ'রাফ ঃ ৩

ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم لا

ما لك من الله من ولي ولا واق ٥ (الرعد : ٣٧)

—তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও তুমি যদি তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো, তাহলে আল্লার মুকাবিলায় তোমার কোন সাহায্যকারী হবে না, হবে না কোন রক্ষাকারী।

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع

اهواء الذين لا يعلمون ٥ (الجاثية : ١٨)

---

১. যে সত্তা আল্লার মুকাবিলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং আল্লাহ ব্যতীত যার বন্দেগী করা হয়—বন্দেগীকারী ব্যক্তি তার প্রভাব-প্রতাপে বাধ্য হয়ে বন্দেগী করুক বা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে করুক—তাকেই বলা হয় তাগূত। সে মানুষ, শয়তান, প্রতীমা বা অন্য যাই কিছু হোক না কেন। (ইবনে জারীর,আত-ত্বাবারী–জামেউল বয়ান ফী তাফসীরুল কুরআন, ৩য় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা -১৩)।

—অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ পদ্ধতির ওপর স্থাপন করেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ করো। যাদের কোন জ্ঞান নেই, তাদের খাহেশের অনুসরণ করো না।

কুরআন বলে, মানুষের কার্যাবলীকে সংগঠিত সুবিন্যস্ত করার জন্য আল্লাহ যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা লংঘন করার অধিকার কারোর নেই :

... تلك حدود الله فلا تعتدوها ج ومن يتعد حدود الله ط

فاولئك هم الظلمون ○ (البقره : ٢٢٩)

.....এসব হচ্ছে আল্লার নির্ধারিত সীমারেখা। এগুলো লংঘন করো না। যারা আল্লার সীমারেখা লংঘন করে, তারাই যালেম —অত্যাচারী। — আল-বাকারা : ২২৯

... تلك حدود الله ط ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ط

.....এসব হচ্ছে আল্লার সীমারেখা। যে আল্লার সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজেই নিজের নফসের ওপর যুলুম করে। —আত-তালাক : ১

... وتلك حدود الله ط وللكفرين عذاب اليم ○ (المجادله : ٤)

.....এসব হচ্ছে আল্লার সীমারেখা। বাধ্য-বাধকতা মেনে চলতে যারা অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। —আল-মুজাদালা : ৪

কুরআন এও বলে যে, আল্লার হুকুমের বিরুদ্ধে যে হুকুমই হোক না কেন, তা শুধু অন্যায় অবৈধই নয়, বরং তা হচ্ছে কুফরী, গুমরাহী, যুলুম-শিরক—অন্যায় এবং পাপাচার। এ ধরনের যে কোন ফায়সালা জাহেলিয়াতের ফায়সালা— ঈমান বিরুদ্ধ ফায়সালা। এ ধরনের ফায়সালা অস্বীকার করা ঈমানের অপরিহার্য দাবী —অবিচ্ছেদ্য অংশ :

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكفرون ○

—আল্লার নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। -মায়েদা : ৪৪

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظلمون ○

—আল্লার নাযিল করা হুকুম অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই যালেম। -মায়েদা : ৪৫

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفسقون ○

—আল্লার নাযিলকৃত নির্দেশ অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই ফাসেক, পাপাচারী।
—আল-মায়েদা : ৪৭

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ط وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة : ٥٠)

—তারা কি জাহিলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লার চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে? —আল-মায়েদা : ৫০

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ط وَيُرِيدُ الشَّيْطٰنُ
أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيدًا (النساء : ٦٠)

—তুমি কি সেসব লোককে দেখোনি, যারা দাবী করে যে, তোমার ওপর নাযিল করা কিতাবের প্রতি তারা ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে তোমার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপরও, অতঃপর ফায়সালার জন্য নিজেদের ব্যাপারে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাকে অস্বীকার করার? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দূরে নিয়ে যেতে চায়। —আন-নিসা : ৬০

চার : রাসূলের মর্যাদা

ওপরের আয়াতসমূহে আল্লাহর যে বিধান মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মানুষের নিকট পৌছার একমাত্র Mcdia তাঁর রাসূল (সা)। তিনিই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বিধান এবং হেদায়াত মানুষের কাছে পৌছান এবং নিজের কথা এবং কাজের দ্বারা সে সব বিধি-বিধান ও হেদায়াতের ব্যাখ্যা দান করেন। সুতরাং রাসূল (সা) মানব জীবনে আল্লাহর আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty)

প্রতিনিধি। এর ভিত্তিতে আনুগত্য অবিকল আল্লাহরই আনুগত্য। রাসূলের আদেশ নিষেধ এবং ফায়সালাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়ার জন্য আল্লাহই নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলের আদেশ-নিষেধ ফায়সালা এমনভাবে স্বীকার করে নিতে হবে, যেন অন্তরে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সংকোচও না থাকে, অন্যথায় ঈমান কোন কাজেই আসবে নাঃ

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ط (النساء : ٦٤)

—আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তা করেছি এ জন্য যে,আল্লার নির্দেশক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। —আন-নিসা ঃ ৬৪

من يطع الرسول فقد اطاع الله ج (النساء : ٨٠)

—যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে মূলত আল্লারই আনুগত্য করে। —আন-নিসা ঃ ৮০

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ط وساءت مصيرا ٥ (النساء : ١١٥)

—হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের সাথে মতবিরোধ করে, তাঁর বিরোধিতা করে এবং ঈমানদারদের পথ ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করে সে নিজে যে দিকে ফিরে যেতে চায়, আমি তাঁকে সে দিকে ফিরিয়ে দেবো। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা। —আন-নিসা ঃ ১১৫

وما اتكم الرسول فخذوه ج وما نهكم عنه فانتهوا ج واتقوا الله ط ان الله شديد العقاب ٥ (الحشر : ٧)

—রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন, তোমরা তা গ্রহণ করো,আর যেসব সম্পর্কে নিষেধ করেন, সে সব থেকে বিরত থাকো। আল্লাকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

—না, তোমার রবের শপথ, তারা কখনো মুমিন হবে না, যতক্ষণ তারা তোমাকে (হে নবী) নিজেদের সকল মতবিরোধে ফায়সালাকারী বলে মেনে না নেয়। অতঃপর তুমি যে ফায়সালা করবে, তাতে নিজেদের অন্তরে তারা কোন রকম সংকীর্ণতা বোধ করবে না ; বরং পুরোপুরি তা মেনে নেবে। —আন-নিসা ঃ ৬৫

পাঁচ ঃ উর্ধতন আইন

কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশ হচ্ছে এমন এক উর্ধতন আইন (Supreme Law), যার মুকাবিলায় ঈমানদার ব্যক্তি শুধু আনুগত্যের পন্থাই অবলম্বন করতে পারে। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং রাসূল ফায়সালা দিয়েছেন, সে সব ব্যাপারে কোন মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে কোন স্বাধীন ফায়সালা দেয়ার অধিকারী নয়। আল্লাহ ও রাসূলের ফায়সালা থেকে দূরে সরে দাঁড়ানো এবং তার বিরোধিতা-অবাধ্যতা ঈমানের পরিপন্থী ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ○ (الاحزاب : ٣٦)

—আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দেয়ার পর সে ব্যাপারে কোন মুমিন নারী-পুরুষের কোন প্রকার ইখতিয়ারই থাকে না। যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী (অবাধ্যতা) করে, সে স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত। —আল-আহযাব ঃ ৩৬

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى
فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ط وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ○
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ
مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ○ (النور : ٤٧ - ٤٨)

—তারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য কবুল করেছি, অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; তারা কখনো মু'মিন নয়। তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে ফায়সালা করেন, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। —আন-নূর ঃ ৪৭-৪৮

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ط وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ○ (النور : ٥١)

—ঈমানদারদের কাজ হচ্ছে এই যে, যখন রাসূল তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এজন্য তাদেরকে আল্লাহ্ এবং রাসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। এমন ব্যক্তিরাই সফলতা লাভ করবে। —আন-নূর ঃ ৫১

ছয় ঃ খেলাফত

কুরআনের বিধান মতে মানবীয় শাসনের সত্যিকার রূপ হচ্ছে, রাষ্ট্র আল্লাহ্ এবং রাসূলের আইনগত কর্তৃত্ব (Legal Supremacy) স্বীকার করে তাঁর সপক্ষে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ত্যাগ করবে এবং আসল শাসকের অধীনে খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) এর ভূমিকা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আইনগত, প্রশাসনিক বা বিচার সম্বন্ধীয় যাই হোক না কেন—উপরে আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব, রাসূলের মর্যাদা ও উর্ধতন আইন শিরোনামায় বর্ণিত চৌহদ্দীর মধ্যে অবশ্যি সীমিত থাকবে ঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط (المائده : ٤٨)

—(হে নবী।) আমি তোমার প্রতি এ কিতাব সত্য-সঠিকভাবে নাযিল করেছি। তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করে এবং তার হেফাযত করে। সুতরাং আল্লাহ্ যা কিছু নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী লোকদের মধ্যে তুমি ফায়সালা করো। আর মানুষের খাহেশের অনুবর্তন করতে গিয়ে তোমার নিকট আগত সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ

النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

—হে দাউদ! আমি তোমাকে যমীনে খলীফা (প্রতিনিধি) করেছি। সুতরাং তুমি সত্যানুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা করো এবং নফসের খাহেশ (মনের অভিলাষ এবং কামনা বাসনা)-এর অনুসরণ করো না। এমন করলে তা তোমাকে আল্লার পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

সাত ঃ খেলাফতের তাৎপর্য

কুরআনে এ খেলাফতের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ যমীনের বুকে মানুষ যে শক্তি-সামর্থ লাভ করেছে, তা সবই সম্ভব হয়েছে আল্লার দান ও অনুগ্রহে। আল্লাহ্ মানুষকে এমন মর্যাদা দান করেছেন, যার ফলে মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ তাঁরই দেয়া স্বাধীন ক্ষমতা বলে তাঁর যমীন ব্যবহার করে। এ জন্য দুনিয়ার বুকে মানুষের স্বাধীন মালিকানা নেই। বরং সে প্রকৃত মালিকের খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط

—এবং স্মরণ কর, তোমার রব যখন ফিরিশতাদের বলেছিলেন, আমি যমীনে একজন খলীফা বানাবো। —আল-বাকারা ঃ ৩১

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ (الاعراف : ١٠)

—(মানব মন্ডলী।) আমি তোমাদেরকে যমীনের বুকে স্বাধীন কর্মক্ষমতা দিয়ে সংস্থাপন করেছি এবং তোমাদের জন্য তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছি।

—আল-আ'রাফ ঃ ১০

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ ○ (الحج : ٦٥)

—তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য বিজিত করে দিয়েছেন? —আল-হজ্জ ঃ ৬৫

যমীনের কোনও অংশে যে জাতি ক্ষমতা লাভ করে, মূলত সে জাতি সেখানে আল্লার খলিফা ঃ

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح - (الاعراف: ٦٩)

—(হে আদ কওম)। যমীনে আল্লাহ যখন তোমাদেরকে নূহের কওমের পরে খলীফা করেছিলেন, তখনকার কথা স্মরণ করো।—আ'রাফ ঃ ৬৯

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ۝ (الاعراف : ٧٤)

—(হে সামুদ কওম)। স্মরণ কর তখনকার কথা, যখন তিনি আদ কওমের পরে তোমাদেরকে খলীফা করেছিলেন। —আল-আরাফ ঃ ৭৪

عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الارض

فينظر كيف تعملون - (الاعراف : ١٢٩)

—(হে বনী-ইসরাঈল)। সে সময় নিকটবর্তী যখন তোমাদের রব তোমাদের দুশমন (ফেরাউন)-কে ধ্বংস করে তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন। এবং তিনি দেখবেন, তোমরা কেমন কার্য কর। —আল-আরাফ ঃ ১২৯

ثم جعلنكم خلئف فى الارض من بعدهم لننظر كيف

تعملون (يونس : ١٤)

—অতঃপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করেছি, তোমরা কেমন কাজ কর, তা দেখার জন্য। —ইউনুস ঃ ১৪

কিন্তু এ খেলাফত কেবলমাত্র তখন সঠিক এবং বৈধ হতে পারে; যখন তা হবে সত্যিকার মালিকের (আল্লাহ তায়ালার) নির্দেশের অনুসারী। তা থেকে বিমুখ হয়ে যে স্বেচ্ছাচার মূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তা খেলাফত হবে না। বরং খেলাফতের পরিবর্তে তা হবে "বাগাওয়াত" তথা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঃ

هو الذى جعلكم خلئف فى الارض ط فمن كفر فعليه
كفره ط و لا يزيد الكفرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ج
و لا يزيد الكفرين كفرهم الا خسارا ٥ (فاطر : ٣٩)

—তিনি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করেছেন। অতঃপর যে কুফরী করবে–তার কুফরী তার ওপর শাস্তি স্বরূপ আপতিত হবে। আর কাফেরদের কুফরী তাদের রব–এর কাছে তাঁর গযব ছাড়া অন্য কোন বিষয় বৃদ্ধি করতে পারে না। কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করতে পারে। —আল–ফাতের ঃ ৩৯

الم تر كيف فعل ربك بعاد ... ... و ثمود الذين
جابوا الصخر بالواد ص و فرعون ذى الاوتاد ص الذين طغوا
فى البلاد ص (الفجر : ٦ - ١١)

—তুমি কি দেখনি, তোমার রব আদ –এর সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?... .... এবং সামুদের সাথে ; যারা উপত্যকায় পাথর কেটেছিল (গৃহ নির্মাণের জন্য) এবং খুঁটি–তাঁবুর অধিকারী ফেরাউনের সাথেও —যারা দেশে অবাধ্যতা সৃষ্টি করেছিল? —আল ফজর

اذهب الى فرعون انه طغى ز ... ... فقال انا ربكم الاعلى ز

—(হে মূসা!) ফেরাউনের কাছে যাও। কারণ, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। .... ফেরাউন লোকদের বলেছিল,আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব—পালনকর্তা–পরওয়ারদেগার।
—আন–নাযেআত ঃ ১৭–২৪

وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنهم
فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم ص ..... يعبدونني

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا - (النور : ٥٥)

—তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন, যেমন তিনি খলীফা করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে ... ... তারা আমার বন্দেগী করবে,আমার সাথে অন্য কিছুকেই শরীক করবে না।

আট ঃ সামষ্টিক খেলাফত

কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দল এ বৈধ এবং সত্য–সঠিক ধরনের খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব)–এর একক ধারক–বাহক নয়। বরং যে দল (Community) উপরোক্ত মূলনীতিগুলো স্বীকার করে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্র–সরকার প্রতিষ্ঠা করে, সে দলই হয় এ খেলাফতের ধারক–বাহক। সূরায় নূর –এর ৫৫ নং আয়াতের لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ বাক্যাংশ এ ব্যাপারে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন। এ বাক্যাংশের আলোকে ঈমানদারদের জামায়াতের প্রতিটি ব্যক্তিই খেলাফতের সমান অংশীদার। সাধারণ মুমিনদের খেলাফতের অধিকার হরণ করে তা নিজের কুক্ষিগত করার অধিকার কোন ব্যক্তি–গোষ্ঠীর নেই। কোন ব্যক্তি বা দল নিজের স্বপক্ষে আল্লার বিশেষ খেলাফতের দাবীও করতে পারে না। এ বিষয়টিই ইসলামী খেলাফতকে মুলুকিয়্যাত (একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র) গোষ্ঠীতন্ত্র এবং ধর্মীয় যাজক–সম্প্রদায়ের শাসন থেকে পৃথক করে তাকে গণতন্ত্রাভিমুখী করে। কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্র এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব (Popular Soverignty)–এর মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামী গণতন্ত্রে (ইসলামের জমহূরী খেলাফত) জনগণ স্বয়ং আল্লার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে আল্লার বিধানের সীমার মধ্যেই সীমিত করে দেয়।

নয় ঃ রাষ্ট্রের আনুগত্যের সীমা

এ খেলাফত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে রাষ্ট্র–সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণ শুধু ভাল কাজে (মারুফ) তার আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবে মা'সিয়াত (আইনের বিরুদ্ধাচরণ, পাপ অন্যায়)—এ কোন আনুগত্য নেই ; নেই কোন সহযোগিতা ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ

لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ ... وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ

—হে নবী। ঈমানদার মহিলারা যখন তোমার নিকট এসব বিষয়ের বায়আ'ত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করার জন্য আসে যে, তারা আল্লার সাথে শরীক করবে না, এবং কোন বৈধ

বিধানের ব্যাপারে তোমার নাফরমানী (অবাধ্যতা) করবে না, তখন তুমি তাদের বায়আত কবুল করো। —আল-মুমতাহানা ঃ ১২

وتعاونوا على البر والتقوى ص ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ص واتقوا الله ط ان الله شديد العقاب ۝ (المائده : ۲)

—নেকী এবং পরহেযগারী—ভাল কাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করো ; পাপ এবং ঔদ্ধত্যে সহযোগিতা করো না। আল্লাকে ভয় করো । আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

ولا تطع منهم اثما او كفورا ۝ (الدهر : ۲۴)

—তাদের মধ্য হতে কোন পাপাচারী এবং অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করো না।

দশ ঃ শূরা

সে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যাবলী—প্রতিষ্ঠা-সংগঠন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান এবং উলিল আম্‌র-এর নির্বাচন, শাসনতান্ত্রিক এবং প্রশাসনিক কার্যাবলী পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ঈমানদারদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হওয়া উচিত ; এ পরামর্শ কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি হউক বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ঃ

امرهم شورى بينهم ص (الشورى : ۳۸)

—এবং মুসলমানদের কার্যাবলী পারস্পারিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।[২]

এগার ঃ উলিল আম্‌র-এর গুণাবলী

এ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উলিল আম্‌র এর নির্বাচনে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার , তা এই ঃ

(ক) যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে খেলাফত ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হচ্ছে, তাকে সে সব মূলনীতি মেনে চলতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি নীতিগতভাবে একটি ব্যবস্থার বিরোধী, তার ওপর সে ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায় না ঃ

---

২ এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, উর্দু সংস্করণ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৮—৫১০ দ্রষ্টব্য।

يا يها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى

الامر منكم ○ (النساء : ٥٩)

—হে ঈমানদারগণ। আনুগত্য কর আল্লার এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলিল আমর। —আন-নিসা ঃ ৫৯

يا يها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم

—হে ঈমানদারগণ। নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে গোপনীয় বিষয়ের অংশীদার করো না।[৩]
—আলে-ইমরান ঃ ১১

ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين

وليجة ط (التوبة : ١٦)

—তোমরা কি মনে করে বসেছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে, আল্লাহ, রাসূল এবং মু'মিনদের ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের ব্যাপারে দখলদার বানায়নি আল্লাহ এখনও তা পরখ করেননি।[৪] আত-তাওবা ঃ ১৬

---

৩. মূলে بطانة (বিতানাতুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হিঃ ১১৪৪ খৃঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন এরূপে ঃ কোন ব্যক্তির 'বিতানা' এবং 'ওয়ালিজা' সে ব্যক্তি যে তার বিশিষ্ট বন্ধু নির্বাচিত সাথী, যার ওপর নির্ভর করে সে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (আল-কাশ্শাফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬২)।

৪. মূলে وليجة (ওয়ালীজা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যামাখশারীর উদ্ধৃতি দিয়ে ওপরে তার একটি ব্যাখ্যাও উল্লেখিত হয়েছে। অপর এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাগেব ইসফাহানী। তিনি লিখেছেন ঃ 'ওয়ালীজা বলা হয় তাকে মানুষ যাকে তার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ সে নিজস্ব লোকদের পর্যায়ভুক্ত নয়'।

فلان وليجة فى القوم আরবের এ বাগধারা থেকে এটি গৃহীত। এর অর্থ- 'অমুক ব্যক্তি সে জাতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অথচ সে ব্যক্তি সে জাতির লোক নয়।'

[মুফরাদাত ফি গারীবিল কুরআন, আল-মাতবাআতুল খাইরিয়া, মিসর ১৩২২ হিজরী।]

(খ) সে যালেম ফাসেক–ফাজের, আল্লাবিমুখ এবং সীমালংঘনকারী হবে না। বরং ঈমানদার, আল্লাহভীরু এবং নেককার হতে হবে তাকে। কোন যালেম বা ফাসেক ব্যক্তি যদি এমারত বা ইমামের পদ অধিকার করে বসে, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তার এমারত (নেতৃত্ব–কর্তৃত্ব) বাতেল ঃ

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ط قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ط قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ (البقرة : ١٢٤)

—এবং স্মরণ কর, ইবরাহীমকে তার রব যখন কয়েকটি কথার ব্যাপারে পরীক্ষা করছিলেন এবং তা সে পূর্ণ করেছিল। তখন তার রব বলেছিলেন—আমি তোমাকে লোকদের ইমাম (নেতা) বানাবো। ইবরাহীম বললো–আমার বংশধরদের মধ্যেও? তিনি বললেন, যালেমরা আমার আহদ–অঙ্গীকার লাভ করে না।[৫] –আল–বাকারা ঃ ১২৪

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ز أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝ (ص : ٢٨)

---

৫. প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ (ফিকাহ শাস্ত্রবেত্তা) আবুবকর আল জাস্সাস (মৃত্যু ৩৭০ হিজরী, ৯৮০ ঈসায়ী) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, অভিধানে ইমামের অর্থ সে ব্যক্তি, যার অনুসরণ করা হয় —সে অনুসরণ হক–বাতিল, ন্যায়–অন্যায় যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ইমাম বলতে কেবল সে ব্যক্তিকেই বুঝায়, যে আনুগত্যের যোগ্য, যার অনুকরণ অবশ্য করণীয়। সুতরাং এদিক থেকে ইমামতের উন্নত পর্যায়ে রয়েছেন নবী–রসূলগণ, সত্যাশ্রয়ী খলীফাগণ এবং পরে সত্যানুসারী ওলামা এবং কাযী। এরপর তিনি লিখেছেন ঃ সুতরাং কোন যালেম নবী হতে পারে না। নবীর প্রতিনিধি কাযী বা এমন পদ মর্যাদার অধিকারী হওয়াও তার জন্য বৈধ নয়, দ্বীনের ব্যাপ্যারে যার কথা মেনে চলা অপরিহার্য কর্তব্য। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাসেক পাপাচারী–দুরাচারী ব্যক্তির ইমামত বাতেল। সে খলীফা হতে পারে না। সে যদি নিজেই এমন পদ–মর্যাদায় জেঁকে বসে , তবে তার অনুগমন–অনুসরণ এবং আনুগত্য জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।
[আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৯–৮০, আল–মাতবায়াতুল বাহিয়্যা, মিসর, ১৩৪৬ হিজরী।]

—যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে আমরা কি সে সব লোকদের মত করবো, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে? আমরা কি মুত্তাকী-পরহেযগারদেরকে ফাসেকদের মত করবো?—ছাদ : ২৮

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوه

وكان امره فرطا ○ (الكهف : ٢٨)

—এমন কোন লোকের আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে তার নফসের কামনা-বাসনা (খাহেসে-নফস)-এর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং যার কার্যধারা সীমাতিক্রম করেছে।—আল-কাহাফ : ২৮

ولا تطيعوا امر المسرفين ○ الذين يفسدون في الارض

ولا يصلحون ○ (الشعراء : ١٥١ - ١٥٢)

—সে সব সীমালংঘনকারীর আনুগত্য করো না, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে—সংস্কার-সংশোধন করে না।— আশ-শুয়ারা : ১৫১-১৫২

ان اكرمكم عند الله اتقكم ط (الحجرات : ١٣)

—তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লার নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী-পরহেযগার—সবচেয়ে বেশী আল্লাভীরু।

(গ) সে অজ্ঞ-মূর্খ হবে না; বরং তাকে হতে হবে বিজ্ঞ-জ্ঞানী। প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে তাকে। খেলাফতের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য তাকে পর্যাপ্ত শারীরিক-মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما

—যে ধন-সম্পদকে আল্লাহ্ তোমাদের জীবন-জীবিকার অবলম্বন করেছেন, তা নির্বোধ ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিও না। —আন-নিসা : ৫

قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك

منه ولم يؤت سعة من المال ط قال ان الله اصطفه عليكم

وزاده بسطة في العلم والجسم ط (البقره : ٢٤٧)

—(বনী-ইসরাঈল) বললো সে (তালুত) আমাদের ওপর শাসন-কর্তৃত্ব চালাবার অধিকার পেল কোথায়? অথচ তার তুলনায় আমরা শাসনকার্যের বেশী হকদার। আর তাকে তো ধন-সম্পদে প্রাচুর্যও দেয়া হয়নি। নবী বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের মুকাবিলায় তাকে নিযুক্ত করেছেন এবং তার জ্ঞান-শক্তিতে প্রশস্ততা দান করেছেন। —আল-বাকারা ঃ ২৪৭

وشددنا ملكه واتينه الحكمة وفصل الخطاب ○

—এবং দাউদের রাজত্বকে আমরা সুদৃঢ় করেছি, তাকে দিয়েছি জ্ঞান-কৌশল এবং চূড়ান্ত ফায়সলাকারী কথা বলার যোগ্যতা। —সাদ ঃ ২০

قال اجعلني على خزائن الارض ج اني حفيظ عليم ○

—ইউসুফ বললো, আমাকে যমীনের ভান্ডারসমূহের কার্যে নিযুক্ত করো। কারণ, আমি হেফাযতকারী এবং ওয়াকেফহাল। —ইউসুফ ঃ ৫৫

ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه

الذين يستنبطونه منهم ط (النساء : ٨٣)

—আর এরা যদি (গুজব না ছড়িয়ে) খবরটি রাসূল এবং তাদের উলিল আম্‌র-এর নিকট পৌঁছাতো, তাহলে তা এমন ব্যক্তিদের জ্ঞানে আসতো, তাদের মধ্যে যারা বিষয়ের গভীরে পৌঁছতে সক্ষম। —আন-নিসা ঃ ৮৩

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ط

—বল, যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই, উভয়ে কি সমান হতে পারে? —যুমার ঃ ৯

(ঘ) তাকে এমন আমানতদার হতে হবে, যাতে আস্থার সাথে তার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا لا

—আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানতসমূহ তার যোগ্য ব্যক্তির কাছে ফেরত দেয়ার জন্য[৬]। —আন-নিসা ঃ ৫৮

বার ঃ শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি

এ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যেসব মৌলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তা এই ঃ

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج فَإِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط

(ক) —তোমরা যারা ঈমান এনেছো। আনুগত্য করো আল্লার এবং আনুগত্য করো রাসূলের, আর তোমাদের উলিল আমর–এর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ্ এবং রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো—যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। —আন-নিসা ঃ ৫৯

আলোচ্য আয়াতটি শাসনতন্ত্রের ছ'টি ধারা স্পষ্ট করে তুলে ধরে ঃ

এক ঃ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য সকল আনুগত্যের চেয়ে অগ্রগণ্য।

দুই ঃ উলিল আমর–এর আনুগত্য আল্লাহ্–রাসূলের আনুগত্যের অধীন।

তিন ঃ উলিল আমর ঈমানদারদের মধ্য হতে হবে।

---

৬. দায়িত্বপূর্ণ পদ তাদেরকেই দান করা উচিত, যারা তার যোগ্য অধিকারী—এ অর্থও এতে শামিল রয়েছে।
[আলূসী, রুহুল মা'আনী, ৫ম খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, ইদারাতুত তাবায়াতিল মুনিরিয়া, মিসর, ১৩৪৫ হিজরী।]

চার ঃ শাসকবর্গ এবং সরকারের সাথে মতবিরোধের অধিকার জনগণের রয়েছে।

পাঁচ ঃ বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ এবং রাসূলের বিধানই হবে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী দলীল।

ছয় ঃ খেলাফত ব্যবস্থায় এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে, যা উলীল আম্র এবং জনগণের চাপ-প্রভাব মুক্ত হয়ে উর্ধ্বতন আইন অনুযায়ী সকল বিরোধ মীমাংসা করতে পারে।

(খ) প্রশাসন যন্ত্রের (Executive Body) ক্ষমতা ইখতিয়ার অবশ্যই আল্লার সীমারেখা দ্বারা সীমিত হবে, হবে আল্লাহ-রাসূলের আইনে বাঁধা। তা লংঘন করে, প্রশাসন যন্ত্র এমন কোন নীতি (Policy) গ্রহণ করতে পারে না, এমন কোন নির্দেশ দিতে পারে না, যা মা'সিয়াত (পাপাচার ; কুরআন-সুন্নার যে কোন স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশের পরিপন্থী)-এর সংজ্ঞায় পড়ে। কারণ, এ আইনানুগ সীমারেখার বাইরে গিয়ে আনুগত্য দাবী করার অধিকারই তার নেই। (এ সম্পর্কে ওপরের ৩, ৫ ও ৯ নং প্যারাগ্রাফে আমরা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ উল্লেখ করেছি।) এ ছাড়াও প্রশাসনিক কাঠামো অবশ্যই শূরা অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হতে হবে। এবং শূরা অর্থাৎ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে তাকে কার্য পরিচালনা করতে হবে। ওপরে ১০ নং প্যারাগ্রাফে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন এবং পরামর্শ সম্পর্কে কুরআন কোন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট রূপ-কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং এক সামগ্রিক মূলনীতি নিরূপণ করে বিভিন্ন যুগে সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তা কার্যকর করার পথ উন্মুক্ত রেখেছে।

(গ) আইন পরিষদ (Legislature) অবশ্যই পরামর্শভিত্তিক হবে (১০ নং প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তার আইন প্রণয়ণের অধিকার সর্বাবস্থায়ই ৩ এবং ৫ নং প্যারাগ্রাফে বর্ণিত সীমারেখায় সীমিত হতে বাধ্য। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং রাসূল কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেননি বা মূলনীতি এবং সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আইন পরিষদ সে সব ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে পারে। তা কার্যকর করার জন্য প্রাসঙ্গিক নিয়ম-নীতির পরামর্শ দিতে পারে, প্রস্তাব পেশ করতে পারে। কিন্তু তাতে রদবদল করতে পারে না। অবশ্য যেসব ব্যাপারে উর্ধতন আইন প্রণেতা কোন সুস্পষ্ট বিধান দেয়নি, সীমারেখা এবং মূলনীতি নির্ধারণ করেননি; সে সব ব্যাপারে ইসলামের স্পিরিট (Spirit) এবং সাধারণ মূলনীতি অনুযায়ী আইন পরিষদ যে কোন প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে পারে। কারণ সে ব্যাপারে কোন নির্দেশ না থাকাই এ কথার প্রমাণ যে, শরীয়াত প্রণেতা আ ঈমানদারের শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

(ঘ) বিচার বিভাগকে (Judiciary) সকল প্রকার হস্তক্ষেপ এবং চাপ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে; যেন সরকার এবং জনগণ সকলের ব্যাপারে আইন অনুযায়ী পক্ষপাতহীন রায় দিতে পারে। ওপরে ৩ এবং ৫ নম্বর প্যারাগ্রাফে যেসব সীমারেখার উল্লেখ করা হয়েছে, তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নিজের এবং অন্যের অভিলাষ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সত্য এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে মামলার রায় দেয়া হবে তার কর্তব্য ঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

—আল্লার নাযেলকৃত বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করো এবং তাদের কামনা–বাসনা (খাহেশ)–এর অনুসরণ করো না। —আল–মায়েদা ঃ ৪৮

و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ط (ص : ٢٦)

—নিজেদের নফসের কামনা–বাসনার অনুসরণ করো না। (এরূপ করলে) তা তোমাকে আল্লার পথ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। —সাদ ঃ ২৬

و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ط (لنساء : ٥٨)

—মানুষের মধ্যে যখন ফায়সালা করবে, ইনসাফের সাথে করবে।—আন–নিসা ঃ ৫৮

তের ঃ রাষ্ট্রের লক্ষ্য

এ রাষ্ট্রকে দুটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করতে হবে।

এক ঃ মানব জীবনে ইনসাফ–সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হোক ; যুলুম–নির্যাতনের অবসান হোক ঃ

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت و انزلنا معهم الكتب

و الميزان ليقوم الناس بالقسط ج و انزلنا الحديد فيه

باس شديد و منافع للناس (الحديد : ٢٥)

—আমরা স্পষ্ট হেদায়াত দিয়ে আমাদের রাসূল প্রেরণ করেছি, আর তাদের সাথে কিতাব এবং 'আল–মিযান' [৭] নাযিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আমরা লোহা [৮] নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে কঠিন শক্তি এবং মানুষের জন্য কল্যাণ। —আল–হাদীদ ঃ ২৫

---

৭. মুজাহিদ কাতাদা ইত্যাকার তাফসীরকারদের মতে মীযান অর্থ আদল ন্যায় বিচার। (ইবনে কাসীর ঃ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা–৩১৪ ; মাতবাআতু মুস্তফা মুহাম্মাদ, মিসর, ১৯৩৭)।

৮. লোহার অর্থ রাজনৈতিক শক্তি। এদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ ঔদ্ধত্য অবলম্বন করলে তাদের বিরুদ্ধে তরবারীর শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। (আর–রাযী ঃ মাফাতিহুল গায়েব, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা–১০১, আল -মাতবাআতুশ শারফিয়া, মিসর, ১৩২৪ হিজরী)।

দুই ঃ সরকারী ক্ষমতা এবং উপায়-উপকরণ দ্বারা "সালাত প্রতিষ্ঠা" এবং যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে—যা ইসলামী জীবনের স্তম্ভ। কল্যাণ এবং পুণ্যের উন্নতি সাধন করতে হবে। বিশ্বে ইসলামের আগমনের ইহাই আসল উদ্দেশ্য। অন্যায়-অকল্যাণের প্রতিরোধ করতে হবে। অন্যায়-অকল্যাণ আল্লার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য ঃ

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة

وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ط (الحج : ٤١)

—তারা এমন ব্যক্তি, আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে, ন্যায়ের আদেশ করে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে। —আল-হজ্জ ঃ ৪১

চৌদ্দ ঃ মৌলিক অধিকার

এ ব্যবস্থায় বসবাসকারী মুসলিম অ-মুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো এই। এসব অধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।[১]

(ক) জীবন সংরক্ষণ ঃ

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ط (بنى اسرائيل : ٣٣)

—যে জীবনকে আল্লাহ্ হারাম-সম্মানার্হ করেছেন, হক ব্যতীত তাকে হত্যা করো না।

(খ) মালিকানার অধিকার সংরক্ষণ ঃ

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (البقره ١٨٨ - النساء ٢٩)

—নিজেদের সম্পদ পরস্পরে অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না।

(গ) সম্মান-সম্ভ্রম সংরক্ষণ ঃ

لا يسخر قوم من قوم ..... ج ولا تلمزوا انفسكم

---

১. মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য মানুষের মৌলিক অধিকার, তাফহীমাত, ৩য় খন্ড, ২৪৮-২৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط ...... وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط

— একদল যেন অপর দলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করে। ......একে অপরকে দোষারোপ করো না, একে অন্যকে বিরূপ পদবী দিও না। ....একে অন্যের গীবত করো না—তার অনুপস্থিতিতে তাকে মন্দ বলো না। —আল-হুজুরাত ঃ ১১-১২

(ঘ) ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা সংরক্ষণ ঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا

—অনুমতি গ্রহণ না করে নিজেদের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহে প্রবেশ করো না। —নূর ঃ ২৭

وَلَا تَجَسَّسُوا (الحجرات : ١٢)

—মানুষের গোপন কথা খুঁজে বেড়াইও না। —আল-হুজুরাত ঃ ১২

(ঙ) যুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াষ তুলবার অধিকার ঃ

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ط (النساء : ١٤٨)

—প্রকাশ্য নিন্দাবাদ আল্লাহ্ পসন্দ করেন না, অবশ্য যদি কারো ওপর যুলুম হয়ে থাকে।

(চ) ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার, সমালোচনার স্বাধীনতার অধিকারও এর পর্যায়ভুক্ত ঃ

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

—বনী-ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম-এর ভাষায় তাদের ওপর লানত (অভিসম্পাত) করা হয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা নাফরমানী করেছিল ; করেছিল বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন। তারা একে অপরকে মন্দ কাজ করা থেকে বারণ করতো না। তারা যা করতো, তা কতই না মন্দ ছিল। —আল-মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯

انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا

بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ○ (الاعراف : ١٦٥)

—যারা মন্দ কার্য থেকে বারণ করতো, আমরা তাদেরকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছি ; আর যালেমদের কঠোর আযাবে পাকড়াও করেছি—তারা যে ফিসক-পাপাচার করতো, তার প্রতিদানে। —আল-আ'রাফ ঃ ১৬৫

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف

وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ط (ال عمران : ١١٠)

—তোমরা সে সর্বোত্তম উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লার ওপর ঈমান রাখবে।

(ছ) সংগঠনের স্বাধীনতা (Freedom of Association) -এর অধিকার। অবশ্য এজন্য শর্ত এই যে, তা মঙ্গল-কল্যাণ কার্যে ব্যবহার হবে। সমাজে দলাদলি এবং মৌল-বিরোধ ছড়াবার কাজের মাধ্যম হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হবে না ঃ

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف

وينهون عن المنكر ط واولئك هم المفلحون ○ ولا تكونوا

كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينت ط

وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ (ال عمران : ١٠٤ - ١٠٥)

—তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা বাঞ্ছনীয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। এমন লোকেরাই হবে সফলকাম। যারা নানা দল–উপদলে বিভক্ত হয়েছে, স্পষ্ট হেদায়াত আসার পরও যারা মতভেদ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। এমন লোকদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

(জ) বিবেক–বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ لا (البقره : ٢٥٦)

—দ্বীনে কোন যবরদস্তি নেই। -আল–বাকারা ঃ ২৫৬

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ (يونس : ٩٩)

—মুমিন হয়ে যাওয়ার জন্য তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে?

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج (البقره : ١٩١)

—ফেতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক। [১০] —আল–বাকারা ঃ ১৯১

(ঝ) ধর্মীয় ব্যাপারে মনোকষ্ট থেকে মুক্ত থাকার অধিকার ঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (الانعام : ١٠٩)

—আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব উপাস্যকে ডাকে; তোমরা তাদের গালি দিও না।

এ ব্যাপারে কুরআন স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা যেতে পারে; কিন্তু তা করতে হবে সুন্দরভাবে, উত্তম পন্থায় ঃ

---

১০. ফেতনার মানে কোন ব্যক্তির ওপর শক্তি প্রয়োগ করে তাকে নিজের দ্বীন পরিবর্তন করতে বাধ্য করা। (ইবনে জরীর, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১১)।

ولا تجادلوا اهل الكتب الا بالتى هى احسن ق (العنكبوت : ٤٦)

—সুন্দর (Fair) পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে বহছ করো না।

(ঞ) প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তার নিজের কাজের জন্যই দায়ী, একের কর্মের জন্য অপরকে পাকড়াও করা যাবে না—এ অধিকার ঃ

ولا تكسب كل نفس الا عليها ج ولا تزر وازرة وزر اخرى ج

—প্রত্যেক ব্যক্তি যে মন্দ কাজ করে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হয়, কোন ভার বহনকারী অপরের বোঝা বহন করে না।[১১] —আল-আনআম ঃ ১৬৫

ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة

فتصبحوا على ما فعلتم ندمين ٥ (الحجرات : ٦)

—কোন ফাসেক পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো। এমন যেন না হয় যে, তোমরা না বুঝে-শোনে কোন দলের ক্ষতি করে বসো, আর নিজের কাজের জন্য পরিতাপ করো।—আল-হুজুরাত ঃ ৬

(ট) বিনা প্রমাণে এবং সুবিচারের সুবিহিত দাবী পূরণ না করে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন কবা যাবে না—এ অধিকার ঃ

ولا تقف ما ليس لك به علم ط (بنى اسرائيل : ٣٦)

—এমন কোন ব্যাপারের পেছনে পড়ো না, যার জ্ঞান তোমাদের নেই।—বনী-ইসরাঈল ঃ ৩৬

واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ط

---

১১. অর্থাৎ কোন অপরাধী যে অপরাধই করুক না কেন সে জন্য সে-ই দায়ী। সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি ধৃত হবে না। তার নিজের অপরাধ ব্যতীত অন্যের অপরাধের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হতে পারে না। (ইবনে জরীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৩)

—মানুষের ব্যাপারে যখন ফায়সালা করবে, আদল (ন্যায়) –এর সাথে ফায়সালা করবে। —আন–নিসা ঃ ৫৮

(ঠ) অভাবী এবং বঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে তাদের জীবন ধারণের অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে–এ অধিকার ঃ

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ○ (الذاريات ؛ ١٩)

—এবং তাদের সম্পদে সাহায্য প্রার্থী বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। —আয–যারিয়াত ঃ ১৯

(ড) রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ–বৈষম্য করবে না বরং সকলের সাথে সমান আচরণ করবে- এ অধিকার ঃ

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ

طَائِفَةً مِّنْهُمْ ... ... إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ○ (القصص ؛ ٤)

—ফেরাউন যমীনে ঔদ্ধত্য করেছে, যমীনের বাসিন্দাদেরকে নানা দলে বিভক্ত করেছে, তাদের একদলকে দুর্বল করে রাখতো সে......নিশ্চিত সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পর্যায়ভুক্ত ছিল।

পনর ঃ নাগরিকদের ওপর সরকারের অধিকার

এ ব্যবস্থায় নাগরিকদের ওপর সরকারের অধিকারগুলো এই ঃ

(ক) তারা সরকারের আনুগত্য করবে, সরকারকে মেনে চলবে ঃ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ج

— আনুগত্য করো আল্লার এবং আনুগত্য করো রাসূলের, আর তাদের তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আম্‌র। —আন–নিসা ঃ ৫৯

(খ) তারা আইন মেনে চলবে, শাসন–শৃংখলায় ফাটল ধরাবে না ঃ

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف : ٥٦)

—সংস্কার-সংশোধনের পর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي

الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا (المائدة : ٣٣)

—যারা আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি এই ঃ তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিবিদ্ধ করা হবে.......। —আল-মায়েদা ঃ ৩৩

(গ) তারা সরকারের সকল ভাল কাজে সহযোগিতা করবে ঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ص (المائدة : ٢)

— ভাল কাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা সহযোগিতা করো।

(ঘ) প্রতিরক্ষা কাজে তারা জান-মাল দ্বারা সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের সাহায্য করবে ঃ

مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ

إِلَى الْأَرْضِ ط ... ... إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لا

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ط ... ... انْفِرُوا

خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ (التوبة : ٣٨-٤١)

— তোমাদের কি হয়েছে? আল্লার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার জন্য বলা হলে তোমরা যমীনকে আঁকড়ে ধরে থাকো।..........তোমরা যদি বেরিয়ে না পড়ো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন কওমকে এনে দাঁড় করাবেন. তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।.......তোমরা বেরিয়ে পড়ো–হালকা হও বা ভারী হও। এবং জান–মাল দিয়ে আল্লার পথে জেহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো। —আত–তাওবা ঃ ৩৮–৪১

ষোল ঃ বৈদেশিক রাজনীতির মূলনীতি

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) সম্পর্কে কুরআন মজীদে যেসব হেদায়াত দেয়া হয়েছে, তা এই ঃ

(ক) চুক্তি–অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। চুক্তি ভঙ্গ করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়লে সে ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষকে পূর্বাহ্নে অবহিত করতে হবে ঃ

واوفوا بالعهد ج ان العهد كان مسئولا ٥ (بنى اسرائيل : ٣٤)

— চুক্তি–অঙ্গীকার পুরো করো, চুক্তি সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد
توكيدها ... ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد
قوة انكاثا ط تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون
امة هى اربى من امة ط انما يبلوكم الله به ط وليبينن
لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفون ٥ (النحل : ٩١-٩٢)

— আল্লার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো, যখন তোমরা অঙ্গীকার করো। পাকা–পোক্ত শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না। ......সে মহিলার মতো হয়ো না যে আপন শ্রম–মেহনত দ্বারা সূতা

কেটে পরে তা টুকরো টুকরো করে ফেলে। এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে বেশী ফায়দা হাসিল করার জন্য তোমরা নিজেদের কসমকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণার মাধ্যম করো না। আল্লাহ এদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। কেয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তোমাদের মত বিরোধের রহস্য উন্মোচন করবেন।

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ط ان الله يحب المتقين ○ (التوبة : ٧)

—দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষণ তোমাদের সাথে অঙ্গীকারে অটল থাকে, তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকী–পরহেযগারদের পছন্দ করেন। —আত–তাওবা : ৭

الا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ط (التوبة : ٤)

—মুশরিকদের মধ্যে তোমরা যাদের সাথে অঙ্গীকার করেছো, অতঃপর তোমাদের সাথে ওফাদারীতে তারাও ত্রুটি করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে কারো সাহায্যও করেনি, তবে তাদের অঙ্গীকার মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করো।—আত–তাওবা : ৪

وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ط (الانفال : ٧٢)

—(আর যদি শত্রুর এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানরা) তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। অবশ্য এমন কোন জাতির বিরুদ্ধে এ সাহায্য করা যাবে না, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। — আল–আনফাল : ৭২

واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ط ان الله

لا يحب الخائنين ٥ (الانفال : ٥٨)

—কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের যদি খেয়ানত (চুক্তিভঙ্গ)–এর আশংকা হয়, তা হলে (তাদের চুক্তি) তাদের প্রতি ছুঁড়ে মারো। অবশ্য সমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে (তা করবে)।[১৩] আল্লাহ নিশ্চয়ই খেয়ানতকারীকে পসন্দ করেন না। —আল–আনফাল ঃ ৫৮

(খ) কাজ–কর্মে বিশ্বস্ততা এবং সততা ঃ

ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم (النحل : ٩٤)

—তোমাদের শপথকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণা–প্রবঞ্চনার মাধ্যম করো না।[১৪]

(গ) আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার ঃ

ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا ط اعدلوا قف

هو اقرب للتقوى ز (المائدة : ٨)

–এবং কোন দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটুকু ক্ষিপ্ত না করে, যাতে তোমরা না ইনসাফ করে বসো। ন্যায় বিচার করো, তা তাকওয়ার নিকটবর্তী। —আল–মায়েদা ঃ ৮

(ঘ) যুদ্ধে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সীমারেখার মর্যাদা ঃ

فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ص

... الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ...

---

১৩. অর্থাৎ তোমাদের এবং তাঁদের মধ্যে যে চুক্তি বা সন্ধিপত্র হয়েছিল, তা বাতিল হয়ে যাওয়ার খবর তাদেরকে দিয়ে দাও, যাতে তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষ সমান হয়। আর তোমরা যদি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কর, তখন অপর পক্ষ যেন এ ধারণায় না থাকে যে, তোমরা তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছ। (আল–জাস্সাস, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩)।

১৪. অর্থাৎ প্রতারণা করার নিয়তে চুক্তি করবে না, যাতে অপর পক্ষ তো তোমাদের কসমের ভিত্তিতে তোমাদের পক্ষ হতে নিশ্চিত হয়ে যায় আর তোমাদের ইচ্ছা এই হয় যে, সুযোগ পেলে তোমরা লংঘন করবে। —ইবনে জারীর, ১৪শ খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১২।

—যদি তারা (অর্থাৎ দুশমনের সাথে মিলিত মুনাফেক মুসলমানরা) না মানে, তা হলে তাদেরকে পাকড়াও করো ; যেখানে পাও, তাদেরকে হত্যা করো।.......তাদেরকে বাদে, যারা এমন কোন জাতির সাথে মিলিত হয়েছে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। —আন-নিসা ঃ ৯০

(ঙ) সন্ধিকামীতা ঃ

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا (الانفال : ٦١)

—তারা যদি সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়।

(চ) দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্তি ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○ (القصص : ٨٣)

—যমীনে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-বাহাদুরী (প্রতিষ্ঠা করতে) চায় না, চায় না বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ; পরকালের নিবাস তো আমরা শুধু তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করবো শুভ পরিণাম পরহেযগারদের জন্য। —আল-ক্বাসাস ঃ ৮৩

(ছ) শত্রুভাবাপন্ন নয়, এমন শক্তির সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ ঃ

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○ (الممتحنة : ٨)

—যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, তোমাদের নিবাস থেকেও তোমাদেরকে বের করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে বারণ করেন না। ইনসাফকারীদেরকে আল্লাহ নিশ্চিত পসন্দ করেন। —আল-মুমতাহানা ঃ ৮

(জ) সদাচারীদের সাথে সদাচার ঃ

هل جزاء الاحسان الا الاحسان ۝ (الرحمن : ٦٠)

—এহসানের বিনিময় এহসান ছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারে?

(ঝ) যারা বাড়াবাড়ি করে, তাদের সাথে ততটুকু বাড়াবাড়ি করো–যতটুকু তারা করেছে

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

عليكم ص واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ۝

—সুতরাং যারা বাড়াবাড়ি করে, তোমরাও তাদের সাথে ততটুকু বাড়াবাড়ি করো, যতটুকু তারা করেছে। এবং আল্লাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। বাকারা : ১৯৪

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ط ولئن

صبرتم لهو خير للصبرين ۝ (النحل : ١٢٦)

—আর যদি প্রতিশোধ নিতেই হয় তবে ততটুকু, যতটুকু তোমাদেরকে উত্যক্ত করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্য ধারণ করো, তবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য তাই উত্তম। —আন-নাহাল : ১২৬

وجزؤا سيئة سيئة مثلها ج فمن عفا واصلح فاجره على

الله ط انه لا يحب الظلمين ۝ ولمن انتصر بعد ظلمه

فاولئك ما عليهم من سبيل ۝ انما السبيل على الذين

يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق ط اولئك لهم

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ (الشورى : ٤٠-٤٢)

—আর অন্যায়ের বিনিময়ে ততটুকু অন্যায়, যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং শুদ্ধি করে নেয়, তার বিনিময় আল্লার যিম্মায়। আল্লাহ্ যালেমদের পসন্দ করেন না। নির্যাতিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর যুলুম করে। যমীনে না–হক ঔদ্ধত্য করে। এসব লোকদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।—আশ–শূরা ঃ ৪০—৪২

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

কুরআনের এ ষোলটি দফায় রাষ্ট্রের যে চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে, তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো এই ঃ

এক ঃ একটি স্বাধীন জাতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে আত্মসর্পণ করবে, তাঁর অধীনে কর্তৃত্ব–সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে খেলাফতের ভূমিকা গ্রহণ করে সে সব বিধি–বিধান এবং নির্দেশাবলী কার্যকরী করবে, আল–কুরআন এবং রাসূলের মাধ্যমে তিনি যা দান করেছেন। একটি স্বাধীন জাতির পক্ষ থেকে বুঝে–শোনে এহেন ঘোষণার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

দুই ঃ সার্বভৌমত্বকে আল্লার জন্য বিশেষিত করার সীমা পর্যন্ত সে রাষ্ট্র থিয়াক্রেসী (Theacracy) –এর বুনিয়াদী দর্শনের সাথে একমত। কিন্তু সে দর্শন কার্যকরী করার ব্যাপারে থিয়াক্রেসী থেকে তার পথ ভিন্ন হয়ে যায় । ধর্মীয় যাজকদের কোন বিশেষ শ্রেণীকে আল্লার বিশেষ ক্ষমতার ধারক বাহক করা এবং 'হিল ও আকদ'–এর সমস্ত ক্ষমতা এ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র দেশের সীমার মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত ঈমানদারকে (যারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে আত্মসমর্পণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) আল্লার খেলাফতের ধারক–বাহক প্রতিপন্ন করে । 'হিল ও আকদ'–এর চূড়ান্ত ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে তাদের হাতে ন্যস্ত করে।

তিন ঃ রাষ্ট্র–প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন, পরিচালন, সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে—জমহুরিয়াতের এ নীতিতে ইসলামী রাষ্ট্র গণতন্ত্র (Democracy)–র সাথে একমত । কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ লাগামহীন নয় । রাষ্ট্রে আইন–কানুন, জনগণের জীবন–যাপনের মূলনীতি, আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি, রাষ্ট্রের উপায়–উপকরণ—সব কিছুই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হবে, এমন নয় । এমনও হতে পারে না যে, যেদিকে জনগণ ঝুঁকে পড়বে, ইসলামী রাষ্ট্রও সেদিকেই নুয়ে পড়বে। বরং আল্লাহ্–রাসূলের ঊর্ধতন আইন তার নিজস্ব নিয়ম–নীতি, সীমারেখা, নৈতিক বিধি–বিধান এবং নির্দেশাবলী দ্বারা জনগণের ইচ্ছা–বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। রাষ্ট্র এমন এক সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হয়, তার পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা–ইখতিয়ার, শাসন বিভাগ, আইন

বিভাগ, বিচার বিভাগ—কারোই নেই। সামগ্রিকভাবে গোটা জাতিরও নেই সে ক্ষমতা-ইখতিয়ার। হাঁ, জাতি যদি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ঈমানের বৃত্ত থেকে দূরে সরে যেতে চায়, তা স্বতন্ত্র কথা।

চার ঃ ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তক রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্র পরিচালনা স্বভাবতই তাদের কাজ হতে পারে,যারা তার মৌলিক দর্শন এবং বিধি-বিধান স্বীকার করে। কিন্তু তা স্বীকার করে না—এমন যতো ব্যক্তিই সে রাষ্ট্র সীমায় আইনের অনুগত হয়ে বাস করতে রাজী হয়, তাদেরকে সে সব নাগরিক অধিকার পুরোপুরিই দেয়, যা দেয় রাষ্ট্রের আদর্শ এবং মূলনীতি মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাগরিকদেরকে।

পাঁচ ঃ তা এমন এক রাষ্ট্র, যা বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং ভৌগলিক জাতীয়তার পরিবর্তে শুধু নীতি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মানবজাতির যে কোন সদস্য ইচ্ছা করলে সে সব মূলনীতি স্বীকার করে নিতে পারে ; কোন প্রকার ভেদ-বৈষম্য ছাড়াই সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে সে ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বের যেখানেই কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, নিশ্চিত তা হবে ইসলামী রাষ্ট্র, তা আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হোক বা এশিয়ায় ; সে রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলী কালো হোক বা সাদা বা হরিদ্র। এ ধরনের একটি নিরঙ্কুশ আইনভিত্তিক রাষ্ট্রের বিশ্ব-রাষ্ট্রে (World state) রূপান্তরিত হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেও যদি এ ধরনের অনেক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাও হবে ইসলামী রাষ্ট্র। কোন জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে সে সব রাষ্ট্রের মধ্যে পরিপূর্ণ ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা সম্ভব। কোনও এক সময় তারা একমত হয়ে বিশ্ব-ফেডারেশন (World-federation) -ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ছয় ঃ রাজনীতিকে স্বার্থের পরিবর্তে নীতি-নৈতিকতার অনুগত করা এবং আল্লাভীতি-পরহেযগারীর সাথে তা পরিচালনা করা সে রাষ্ট্রের মৌল প্রাণশক্তি (Real Spirit)। নৈতিক-চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বই সেখানে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি—একক মানদণ্ড। সে রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলী এবং 'আহলুল হিল্ ওয়াল আকদ'-এর নির্বচনের ব্যাপারেও শারীরিক মানসিক যোগ্যতার সাথে নৈতিক পবিত্রতাও সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার সকল আভ্যন্তরীণ প্রশাসন বিভাগকেও পরিচালিত হতে হবে দিয়ানাত অমানত-সততা-বিশ্বস্ততা পক্ষপাতমুক্ত নির্ভিক ইনসাফ-সুবিচারের ভিত্তিতে। আর তার বৈদেশিক নীতিকেও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সম্পূর্ণ সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠা, চুক্তি-অঙ্গীকারের প্রতি আস্থা, শান্তি-প্রিয়তা, আন্তর্জাতিক সুবিচার এবং সদাচরণের ভিত্তির ওপর।

সাত ঃ নিছক পুলিশের দায়িত্ব পালন করার জন্য এ রাষ্ট্র নয়। শুধু আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা তার কাজ নয় ; বরং তা হচ্ছে একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। সামাজিক সুবিচার, ন্যায়ের বিকাশ আর অন্যায়ের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত তাকে নেতিবাচকভাবে কাজ করতে হবে।

আট ঃ অধিকার, মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার সাম্য, আইনের শাসন, ভাল কাজে সহযোগিতা, খারাপ কাজে অসহযোগিতা, আল্লার সম্মুখে দায়িত্বের অনুভূতি, অধিকারের

চেয়েও বড় করে কর্তব্যের অনুভূতি, ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্র—সকলের এক লক্ষ্যে ঐক্যমত, সমাজের কোন ব্যক্তিকে জীবন যাপনের অপরিহার্য উপাদান-উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকতে না দেয়া এসব হচ্ছে সে রাষ্ট্রের মৌলিক মূল্যমান (Basic Values)।

নয় ঃ এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র লাগামহীন এবং সামগ্রীক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ব্যক্তিকে নিরীহ দাসে পরিণত করতে পারে না, আর ব্যক্তিও সীমাহীন স্বাধীনতা পেয়ে ঔদ্ধত্যপরায়ণ এবং সামাজিক স্বার্থের দুশমন হতে পারে না। এতে ব্যক্তিকে একদিকে মৌলিক অধিকার দিয়ে এবং রাষ্ট্রকে উর্ধতন আইন এবং শূরার অনুগত করে ব্যক্তি সত্ত্বার উদ্ভব-বিকাশের সকল সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছে ; ক্ষমতার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তিকে করা হয়েছে নিরাপদ ; কিন্তু অপরদিকে ব্যক্তিকে নৈতিক নীতিমালার ডোরে শক্তভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। তার ওপর এ কর্তব্যও অরোপ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র আল্লার বিধান অনুযায়ী কাজ করলে মনে- প্রাণে রাষ্ট্রের আনুগত্য করবে, ভাল কাজে তার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে, রাষ্ট্র শৃংখলায় ফাটল ধরানো থেকে বিরত থাকবে, তার সংরক্ষণ কাজে জান-মাল দিয়ে যে কোন ধরণের ত্যাগ স্বীকারে যেন বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধও না করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের শাসন-নীতি

ইসলামের শাসন-নীতি

ইতিপূর্বে কোরআন মজীদের যে রাজনৈতিক শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে তা বাস্তবে রূপায়িত করাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজ। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর যে মুসলিম সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে এবং হিজরতের পর রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে তা যে রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করে, তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল কুরআন মজীদের রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে।

এক : আল্লার আইনের কর্তৃত্ব

এ রাষ্ট্রের প্রথম মূলনীতি ছিল এই যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং ঈমানদারদের শাসন হচ্ছে মূলতঃ 'খেলাফত' বা আল্লার প্রতিনিধিত্বশীল শাসন। কাজেই বলগাহীনভাবে কাজ করার তার কোন অধিকার নেই। বরং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের উৎস থেকে উৎসারিত আল্লার আইনের অধীনে কাজ করা তার অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে এ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে আগের অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে বিশেষ করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এ ব্যাপারে একান্ত স্পষ্ট :

আন-নিসা : ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৮০, ১০৫ ; আল-মায়েদা : ৪৪, ৪৫, ৪৭ ; আল-আ'রাফ : ৩ ; ইউসুফ : ৪০ ; আন-নূর : ৫৪, ৫৫ ; আল-আহযাব : ৩৬ এবং আল-হাশর : ৭।

নবী (সঃ)-ও তার অসংখ্য বাণীতে এ মূলনীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন :

عليكم بكتاب الله ! احلوا حلاله و حرموا حرامه -

—আল্লার কিতাব মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আল্লার কিতাব যা হালাল করে দিয়েছে, তোমরা তাকে হালাল মনে করো, আর যা হারাম করেছে, তোমরা তাকে হারাম মনে করো। [১]

---

১. কানযুল 'উম্মাল, ত্বাবরানী এবং মুসনাদে আহমাদের উদ্ধৃতিতে, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯০৭—৯৬৬ ; দায়েরাতুল মায়ারেফ, হায়দরাবাদ সংস্করণ ১৯৫৫।

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا
تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء
من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ـ

—আল্লাহ্ তাআলা কিছু ফরায়েয নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা তা নষ্ট করো না, কিছু হারাম বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, তোমরা তা লংঘন করো না, কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন, তোমরা তা অতিক্রম করো না, ভুল না করেও কিছু ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তোমরা তার সন্ধানে পড়ো না।[২]

من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ـ

—যে ব্যক্তি আল্লার কিতাব মেনে চলে, সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হবে না, পরকালেও হবে না সে হতভাগা।[৩]

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ـ
كتاب الله وسنة رسوله ـ

—আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, —আল্লার কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ।[৪]

ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا ـ

---

২ মিশকাত, দারেকুতনীর উদ্ধৃতিতে-বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ, কানযুল ওম্মাল, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৮১, ৯৮২।

৩. মিশকাত, রাযীন-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত অধ্যায়।

৪. মিশকাত মুয়াত্তার উদ্ধৃতিতে, আলোচ্য অধ্যায়, কানযুল ওম্মাল, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৭৭. ৯৪৯, ৯৫৫, ১০০১।

—আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছি, তা গ্রহণ করো, আর যে বিষয় থেকে বারণ করছি, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।[৫]

দুই ঃ আদল—সকল মানুষের প্রতি সুবিচার

দ্বিতীয় যে মূলনীতির ওপর সে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তা ছিল এ কুরআন-সুন্নার দেয়া আইন সকলের জন্য সমান, রাষ্ট্রের সামান্যতম ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলের উপর তা সমভাবে প্রয়োগ করা উচিত। তাতে কারো জন্য কোন ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে এ কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ - (الشورى - ١٥)

—এবং তোমাদের মধ্যে আদ্‌ল-সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার-নীতি অবলম্বন করার জন্য আমি আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া আমার কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক—আর তা হচ্ছে আদ্‌ল ও সুবিচারের সম্পর্ক। সত্য যার পক্ষে,আমি তার সাথী ; সত্য যার বিরুদ্ধে, আমি তার বিরোধী। আমার দ্বীনে কারও জন্য কোন পার্থক্য মূলক ব্যবহারের অবকাশ নেই। আপন-পর, ছোট-বড়, শরীফ-কমীনের জন্য পৃথক পৃথক অধিকার সংরক্ষিত নেই। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য ; যা গুনাহ, তা সকলের জন্যই গুনাহ ; যা হারাম, তা সবার জন্যই হারাম ; যা হালাল, তা সবার জন্যই হালাল ; যা ফরয, তা সকলের জন্যই ফরয। আল্লার আইনের এ সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আমার নিজের সত্তাও মুক্ত নয়, নয় ব্যতিক্রম। নবী (সঃ) নিজে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ (بِنْتَ مُحَمَّدٍ ص) فَعَلَتْ ذَالِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا -

—তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মাত অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, নিম্ন পর্যায়ের অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দান করতো, আর উচ্চ পর্যায়ের অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিতো। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ নিহিত,

৫. কান্‌যুল ওম্মাল, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৮৬।

(মুহাম্মাদের আপন কন্যা) ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।[৬]

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه ـ

—আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আপন সত্তা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখেছি।[৭]

তিন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সাম্য

এ রাষ্ট্রের তৃতীয় মূলনীতি ছিল, বংশ-বর্ণ-ভাষা এবং দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের অধিকার সমান । এ রাষ্ট্রের পরিসীমায় কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল,বংশ বা জাতি কোন বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না, অন্যের মুকাবিলায় কারো মর্যাদা খাটোও হতে পারে না।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

انما المؤمنون اخوة ـ (الحجرات : ١٠)

—মুমিনরা একে অন্যের ভাই ।—আল-হুজুরাত ঃ ১০

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ط ان اكرمكم عند الله اتقكم ـ

—হে মানব মন্ডলী। এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে নানা গোত্র, নানা জাতিতে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। মূলত আল্লার নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মানার্হ, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাকে ভয় করে ।-আল-হুজুরাত ঃ ১৩

নবী (সঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি এ মূলনীতিকে আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করছে ঃ

---

৬. বুখারী, কিতাবুল হুদূদ, অধ্যায় ১১-১২

৭. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা-১১৬, আল-মাতবাআতুস সলফিয়া, মিসর, ২য় সংস্করণ, ১৩৫২ হিঃ ; মুসনাদে আবু দাউদ আত-তায়ালেসী, হাদীস নং-৫৫, দায়েরাতুল মাআরেফ. হায়দারাবাদ সংস্করণ, ১৩২১ হিজরী।

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم -

—আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে তাকান।[৮]

المسلمون إخوة، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى -

—মুসলমানরা ভাই ভাই। কারো ওপর কারো কোন ফযীলত নেই কিন্তু তাক্ওয়ার ভিত্তিতে।[৯]

يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي - ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى -

—হে মানব জাতি। শোন, তোমাদের রব এক। অনারবের ওপর আরবের বা আরবের ওপর অনারবের কোন মর্যাদা নেই। সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদারও নেই কোন শ্রেষ্ঠত্ব। হাঁ, অবশ্য তাকওয়ার বিচারে।[১০]

من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلوتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم -

---

৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর, মুসলিম এবং ইবনে মাজার উদ্ধৃতিতে, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা —২১৭, মুস্তফা মুহাম্মাদ প্রেস, মিসর-১৯৩৭।

৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর, তিবরাণীর উদ্ধৃতিতে, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা —২১৭।

১০. তসীরে রুহুল মাআনী, বায়হাকী এবং ইবনে মারদুইয়ার উদ্ধৃতিতে ২৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা —১৪৮, ইদারাতুত তাবয়াতিল মুনিরিয়া, মিসর।

—যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের জবাই করা জন্তু খায়, সে মুসলমান। মুসলমানের যে অধিকার, তারও সে অধিকার, মুসলমানের যে কর্তব্য, তারও সে কর্তব্য।[১১]

المؤمنون تتكافأ دماءهم وهم يد على من سواهم - ويسعى بذمتهم أدناهم -

—সকল মু'মিনের রক্তের মর্যাদা সমান, অন্যের মুকাবিলায় তারা সবাই এক। তাদের একজন সামান্যতম ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিতে পারে।[১২]

ليس على المسلم جزية —মুসলমানদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা যেতে পারে না।[১৩]

চার : সরকারের দয়িত্ব ও জবাবদিহি

এ রাষ্ট্রের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিল, শাসন কর্তৃত্ব এবং তার ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অর্থ-সম্পদ আল্লাহ এবং মুসলমানদের আমানত। আল্লাভীরু, ঈমানদার ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের হাতে তা ন্যস্ত করা উচিত। কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত বা স্বার্থবুদ্ধি প্রোণোদিত হয়ে এ আমানতে খেয়ানত করার অধিকার রাখে না। এ আমানত যাদের সোপর্দ করা হবে তারা এজন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেন ঃ

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ط إن الله نعما يعظكم به ط إن الله كان سميعا بصيرا ○ (النساء : ٥٨)

—আমানত বহনের যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আমানত সোপর্দ করার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে। ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন।

---

১১. বুখারী, কিতাবুস সালাত, অধ্যায়-২৮।
১২. আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, অধ্যায়-১১, নাসায়ী, কিতাবুল কাসামাত, অধ্যায়-১০, ১৪।
১৩. আবু দাউদ, কিতাবুল ইমারত, অধ্যায়-৩৪।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته - فالإمام الأعظم
الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته -

—সাবধান। তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দয়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা—যিনি সকলের ওপর শাসক হন—তিনিও দায়িত্বশীল তাঁকেও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।[১৪]

ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش
لهم إلا حرم الله عليه الجنة -

—যিনি মুসলিম প্রজাদের কাজ-কারবারের প্রধান দায়িত্বশীল, কোনো শাসক যদি তাদের সাথে প্রতারণা এবং খেয়ানতকারী অবস্থায় মারা যান তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।[১৫]

ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح
إلا لم يدخل معهم في الجنة -

— মুসলিম রাষ্ট্রের কোন পদাধিকারী শাসক যিনি নিজের পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেন না, নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন না ; তিনি কখনো মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না[১৬]

يا أبا ذر إنك ضعيف - وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة

---

১৪. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়—১। মুসলিম কিতাবুল এমারাত, অধ্যায়—৫।

১৫. বুখারী, কিতাবুল আহকম, আধ্যায়—৮। মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়—৬১ ; কিতাবুল এমারাত, অধ্যায়—৫।

১৬. মুসলিম,কিতাবুল এমারাত, অধ্যায় —৫।

خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ـ

—(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যারকে বলেন,) আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ, আর সরকারের পদ-মর্যাদা একটা আমানত। কেয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং অপমানের কারণ হবে ; অবশ্য তার জন্য নয়, যে পুরোপুরি তার হক আদায় করে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।[১৭]

من أخون الخيانة تجارة الوالي في رعيته ـ

—শাসকের জন্য আপন প্রজাদের মধ্যে ব্যবসা করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খেয়ানত।[১৮]

من ولي لنا عملا ولم تكن له زوجة فليتخذ زوجة ، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما ، أو ليس له مسكن فليتخذ مسكنا ، أو ليس له دابة فليتخذ دابة ـ فمن أصاب سوى ذلك فهو غال أو سارق ـ

—যে ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রের কোন পদ গ্রহণ করে, তার স্ত্রী না থাকলে বিবাহ করবে, খাদেম না থাকলে একজন খাদেম গ্রহণ করবে, ঘর না থাকলে একখানা ঘর করে নেবে, (যাতায়াতের) বাহন না থাকলে একটা বাহন গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়, সে খেয়ানতকারী অথবা চোর।[১৯]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেনঃ

من يكن أميرا فإنه من أطول الناس حسابا وأغلظه

১৭. কানযুল ওম্মাল, ষষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং—৬৮, ১২২।

১৮. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং–৭৮

১৯. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং–৩৪৬

عذابا ، و من لا يكن اميرا ، فانه من ايسر الناس حسابا و اهونه

عذابا ، لان الامراء اقرب الناس من ظلم المؤمنين -

و من يظلم المؤمنين فانما يخفر الله -

—যে ব্যক্তি শাসক হবে, তাকে সবচেয়ে কঠিন হিসেব দিতে হবে, আর সবচেয়ে কঠিন আযাবের আশংকায় পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি শাসক হবে না, তাকে হালকা হিসেব দিতে হবে, তার জন্য হালকা আযাবের আশংকা আছে। কারণ শাসকের মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর যুলুমের সম্ভাবনা অনেক বেশী। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর যুলুম করে, সে আল্লার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।[২০]

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ

لو هلك حمل من ولد الضان ضياعا بشاطئ الفرات خشيت

ان يسألني الله -

—ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরীর বাচ্চাও হারিয়ে যায় (বা ধ্বংস হয়) তবে আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ্ আমাকে সে জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।[২১]

পাঁচ ঃ শূরা বা পরামর্শ

এ রাষ্ট্রের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিল মুসলমানদের পরামর্শ এবং তাদের পারস্পরিক সম্মতি ক্রমে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হতে হবে। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনাও করতে হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

و امرهم شورى بينهم - (الشورى : ٣٨)

—আর মুসলমানদের কাজকর্ম (সম্পন্ন হয়) পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে।

---

২০. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং–২৫০৫।

২১. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং–২৫১২।

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ - (ال عمران ۱۵۹ :)

—হে নবী ! কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে আরয করি যে, আপনার পর আমাদের সামনে যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যে সম্পর্কে কুরআনে কোন নির্দেশ না থাকে এবং আপনার কাছ থেকেও সে ব্যাপারে আমরা কিছু না শুনে থাকি, তখন আমরা কি করবো? তিনি বলেনঃ

شَاوِرُوا فِيهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ وَلَا تُمْضُوا فِيهِ بِرَأْيِ خَاصَّةٍ -

—এ ব্যাপারে দ্বীনের জ্ঞান সম্পন্ন এবং ইবাদাত গুযার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ কর এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী ফায়সালা করবে না।[২২]

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ

مَنْ دَعَا اِلَى اِمَارَةِ نَفْسِهِ اَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ لَا تَقْتُلُوْهُ -

—মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া যে ব্যক্তি তার নিজের বা অন্য কারো নেতৃত্বের (এমারাত) প্রতি আহ্বান জানায়, তাকে হত্যা না করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।[২৩]

---

২২. হাদীসে ইবাদাতগুযার অর্থে এমন সব ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লার বন্দেগী করে, স্বাধীনভাবে নিজের মন মতো কাজ করে না। এ থেকে এই অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, যাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে, কেবল তাদের ইবাদাতগুযারীর গুণটিই দেখে নেয়া হবে ; মতামত এবং পরামর্শ দানের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য অন্যান্য যেসব গুণাবলী প্রয়োজন, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

২৩. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২৫৭৭। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ উক্তির তাৎপর্য এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির জোর-পূর্বক চেপে বসার চেষ্টা করা এক মারাত্মক অপরাধ, তা বরদাস্ত করা উম্মাতের উচিত নয়।

অপর এক বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ উক্তি বর্ণিত আছেঃ لا خلافة الا عن مشورة—পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত নেই।[২৪]

ছয় ঃ ভাল কাজে আনুগত্য

৬ষ্ঠ মূলনীতি—যার ওপর এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এই ছিল যে, কেবল মাত্র মা'রুফ—ভাল কাজেই —সরকারের আনুগত্য অপরিহার্য। পাপাচারে (মা'সিয়াত) আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারুর নেই। অন্য কথায়, এ মূলনীতির তাৎপর্য এই যে, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কেবল সেসব নির্দেশই তাদের অধীন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রজাবৃন্দের জন্য মেনে চলা ওয়াজেব, যা আইনানুগ। আইনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়ার তাদের কোন অধিকার নেই ; তা মেনে চলাও কারো উচিত নয়। কুরআন মজিদে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বায়'আত—আনুগত্যের শপথ গ্রহণকেও মা'রুফে আনুগত্যের শর্তে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁর পক্ষ থেকে কোন মা'সিয়াত (পাপাচার) এর নির্দেশ আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না ঃ

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ - (الممتحنة : ١٢)

—এবং কোন মা'রুফ কাজে তারা আপনার নাফরমানী—অবাধ্যতা করবে না।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب او كره ما لم يؤمر بمعصية - فاذا امر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة -

— একজন মুসলমানের ওপর তার আমীরের আনুগত্য করা—শোনা এবং মেনে চলা—ফরয ; তা তার পসন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ তাকে কোন মা'সিয়াত—পাপাচারের নির্দেশ না দেয়া হয়। মা'সিয়াত-এর নির্দেশ দেয়া হলে কোন আনুগত্য নেই।[২৫]

لا طاعة في معصية الله - انما الطاعة في المعروف -

---

২৪. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২৩৫৪।

২৫. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়—৪; মুসলিম, কিতাবুল এমারাত, অধ্যায়—৮। আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায়—৯৫। নাসায়ী, কিতাবুল বায়আত, অধ্যায়—৩৩। ইবনে মাজা, আবওয়াবুল জিহাদ, অধ্যায়—৪০।

—আল্লার নাফরমানীতে কোন আনুগত্য নেই ; আনুগত্য কেবল মা'রূফ কাজে।[২৬]

নবী (সঃ) এর বিভিন্ন উক্তিতে বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও তিনি বলেছেন, لا طاعة لمن عصى الله (যে আল্লার নাফরমানী করে, তার জন্য কোন আনুগত্য নেই),কখনো বলেছেন: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق (স্রষ্টার নাফরমানীতে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই),কখনো বলেছেন: لا طاعة لمن لم يطع الله (যে আল্লার আনুগত্য করে না তার জন্য কোন আনুগত্য নেই), কখনো বলেছেন : من امركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه - (যে শাসক তোমাকে কোন মা'সিয়াত -এর নির্দেশ দেয়, তার আনুগত্য করো না)।[২৭]

হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ

من ولي امر امة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فلم يقم فيهم بكتاب الله ، فعليه بهلة الله -

—যে ব্যক্তিকে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মাতের কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে লোকদের মধ্যে আল্লার কিতাব অনুযায়ী কাজ করেনি, তার ওপর আল্লার লানত—অভিসম্পাত।[২৮]

এ কারণেই খলীফা হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রথম ভাষণেই ঘোষণা করেছিলেন ঃ

اطيعوني ما اطعت الله ورسوله - فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم -

---

২৬. মুসলিম, কিতাবুল এমারাত, অধ্যায়—৮। আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায়—৯৫। নাসায়ী, কিতাবুল বায়আত, অধ্যায়—৩৩।

২৭. কানযুল ওম্মাল,৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং—২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৯, ৩০১।

২৮.কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং—২৫০৫

—যতক্ষণ আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। যখন আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবো, তখন তোমাদের ওপর আমার কোন আনুগত্য নেই।[২৯]

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ

حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة ،
فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا
وأن يجيبوا إذا دعوا ـ

—আল্লার নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা এবং আমানত আদায় করে দেয়া মুসলমানদের শাসকের ওপর ফরয। শাসক যখন এভাবে কাজ করে তখন তা শুনা ও মেনে চলা এবং তাদেরকে আহ্বান জানালে তাতে সাড়া দেয়া লোকদের কর্তব্য।[৩০]

একদা তিনি তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ

ما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم
وما كرهتم ، وما أمرتكم به من معصية الله فلا طاعة لأحد في
المعصية ـ الطاعة في المعروف ، الطاعة في المعروف ، الطاعة في
المعروف ـ

---

২৯. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদিস নং–২২৮২। অপর এক বর্ণনায় হযরত আবুবকর (রাঃ)–এর শব্দগুলো এই; وان عصيت الله فاعصوني —আর আমি যদি আল্লার নাফরমানী করি, তাহলে তোমরা আমার নাফরমানী করো। —কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস—২৩৩০।

৩০. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং—২৫৩১

—আল্লার আনুগত্য করে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তা মেনে চলা তোমাদের ওপর ফরয—সে নির্দেশ তোমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আর আল্লার নাফরমানী করে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তাতে আল্লার সাথে মা'সিয়াত বা পাপাচারের ক্ষেত্রে কারো জন্য আনুগত্য নেই ; আনুগত্য কেবল মা'রূফে, আনুগত্য কেবল মা'রূফে, আনুগত্য কেবল মা'রূফে। [৩১]

সাত : পদ-মর্যাদার দাবী এবং লোভ নিষিদ্ধ

এটাও সে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ছিল যে, সাধারণত রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদ বিশেষত খেলাফতের জন্য সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি অযোগ্য-অনুপযুক্ত, যে নিজে পদ লাভের অভিলাষী এবং সে জন্য সচেষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেন :

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ط (القصص : ۸۳)

—আখেরাতের ঘর আমি তাদেরকে দেবো, যারা যমীনে নিজের মহত্ব খুঁজে বেড়ায় না, বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। —আল-কাসাস : ৮৩

নবী (সঃ) বলেন :

انا والله لا نولي على عملنا هذا احدا سأله او حرص عليه -

—আল্লার শপথ, এমন কোন ব্যক্তিকে আমরা এ সরকারের পদ মর্যাদা দেই না, যে তা চায় এবং তার জন্য লোভ করে। [৩২]

ان اخونكم عندنا من طلبه -

—যে ব্যক্তি নিজে তা সন্ধান করে, আমাদের নিকট সে-ই সবচেয়ে বেশী খেয়ানতকারী। [৩৩]

---

৩১. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫৮৭।
৩২. বুখারী কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়—৭। মুসলিম কিতাবুল এমারাত, অধ্যায় — ৩
৩৩. আবু দাউদ, কিতাবুল এমারাত, অধ্যায়-২

إنا لا نستعمل على عملنا من أراده -

—আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে আমাদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে গ্রহণ করি না, যে নিজে উক্ত পদের অভিলাষী।[৩৪]

يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسئل الإمارة - فإنك إذا أوتيتها عن مسئلة وكلت إليها - وإن أوتيتها عن غير مسئلة أعنت عليها -

—আবদুর রহমান ইবনে সামুরাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন] আবদুর রহমান ! সরকারী পদ দাবী করো না। কেননা চেষ্টা তদবীর করার পর যদি তা তোমাকে দেয়া হয়, তবে তোমাকে তার হাতে সঁপে দেয়া হবে, আর যদি চেষ্টা-তদবীর ছাড়াই তা লাভ করো, তবে তার হক আদায় করার ব্যাপারে আল্লার পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে।[৩৫]

আট ঃ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য

এ রাষ্ট্রের শাসক এবং তার সরকারের সর্ব প্রথম কর্তব্য এই সাব্যস্ত হয়েছিল যে, কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই যথাযথভাবে সে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের চারিত্রিক মানদন্ডানুযায়ী ভালো ও সদ-গুণাবলীর বিকাশ এবং মন্দ ও অসৎ গুণাবলীর বিনাশ সাধন করবে। কুরআন মজীদে এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

---

৩৪. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-২০৬ ।

৩৫. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৬৯। এখানে কারো যেন সন্দেহ না হয় যে, এটা যদি মূলনীতি হয়ে থাকে, তা হলে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের বাদশার নিকট সরকারের পদ দাবী করলেন কন? মূলত হযরত ইউসুফ (আঃ) কোন ইসলামী রাষ্ট্রে এ পদ দাবী করেন নি, দাবী করেছিলেন এক কাফের রাষ্ট্রে কাফের সরকারের কাছে। সেখানে এক বিশেষ মনস্তাত্বিক সন্ধিক্ষণে তিনি উপলব্ধি করেন যে, আমি যদি বাদশার নিকট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ দাবী করি, তবে তা পেতে পারি। আর তার মাধ্যমে এদেশে আল্লার দ্বীন বিস্তার করার পথ সুগম হতে পারে। কিন্তু আমি যদি ক্ষমতার দাবী থেকে বিরত থাকি, তা হলে কাফের জাতির হেদায়াতের যে দুর্লভ সুযোগ আমি পাচ্ছি, তা হাত ছাড়া হয়ে যাবে । এটা ছিল এক বিশেষ পরিস্থিতি, তার ওপর ইসলামের সাধারণ নিয়ম আরোপ করা যায় না।

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا
الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ط (الحج : ٤١)

—(মুসলমান তারা) যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।
—আল-হজ্জ ঃ ৪১

কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্বের মূল লক্ষ্যও এটিই ঃ

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
ويكون الرسول عليكم شهيدا ط (البقرة : ١٤٣)

—এমনি করে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাত (বা ভারসাম্যপূর্ণ পথে অবিচল উম্মাত) করেছি, যেন তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হও আর রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। —আল-বাকারা ঃ ১৪৩

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون
عن المنكر وتؤمنون بالله - (ال عمران : ١١٠)

—তোমরা সে সর্বোত্তম উম্মাত, মানুষের (সংশোধন এবং পথ প্রদর্শনের) জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লার প্রতি ঈমান রাখবে।

এতদ্ব্যতীত যে কাজের জন্য মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর পূর্বেকার সকল নবী-রাসূল আদিষ্ট ছিলেন, কুরআনের দৃষ্টিতে তা ছিল এই ঃ

ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ط (الشورى : ١٣)

—দ্বীন কায়েম করো এবং তাতে বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ো না।—শূরা ঃ ১৩

অমুসলিম বিশ্বের মুকাবিলায় তাঁর সকল চেষ্টা সাধনাই ছিল এ উদ্দেশ্য ঃ

يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ج (الانفال : ٣٩)

—দ্বীন যেন সর্বতোভাবে আল্লার জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায়।

অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের উম্মাতের মতো তাঁর উম্মাতের জন্যও আল্লার নির্দেশ ছিল ঃ

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لا حُنَفَاءَ - (البينة : ٥)

—তারা নিজের দ্বীনকে একমাত্র আল্লার জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লার বন্দেগী করবে। —আল-বাইয়েনা ঃ ৫

এ জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম কাজ ছিল, দ্বীনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাকে কায়েম করা, তার মধ্যে এমন কোন সংমিশ্রণ হ'তে না দেয়া, যা মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী নীতি সৃষ্টি করে। এ শেষ বিষয়টি সম্পর্কে নবী (সঃ) তাঁর সাহাবী এবং স্থলাভিষিক্তদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ -

—আমাদের এ দ্বীনে যে ব্যক্তি এমন কোন বিষয় উদ্ভাবন করবে, যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। ৩৬

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ - فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ

بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -

—সাবধান। নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বেদআত, আর সকল বেদআতই গুমরাহী, পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত। ৩৭

---

৩৬. মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।
৩৭. ঐ

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام -

—যে ব্যক্তি কোন বেদআত উদ্ভাবকের সম্মান করে, সে ইসলামের মূলোৎপাটনে সাহায্য করে। [৩৮]

এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁর এ উক্তিও দেখতে পাই যে, তিন ব্যক্তি আল্লার সবচেয়ে বেশী না-পসন্দ, তাদের একজন হচ্ছে সে ব্যক্তি ঃ

مبتغ فى الاسلام سنة الجاهلية -

—যে ইসলামে কোনো জাহেলী রীতিনীতির প্রচলন করতে চায়। [৩৯]

নয় ঃ আমর বিল মা'রূফ ও নাহ্ই আনিল মুনকার এর অধিকার এবং কর্তব্য

এ রাষ্ট্রের সর্বশেষ মূলনীতি—যা তাকে সঠিক পথে টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা দেয়—তা ছিল, মুসলিম সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি সত্যবাক্য উচ্চারণ করবে, নেকী ও কল্যাণের সহায়তা করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানেই কোন ভুল এবং অন্যায় কার্য হতে দেখবে, সেখানেই তাকে প্রতিহত করতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করবে। মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের এটা শুধু অধিকারই নয়, বরং অপরিহার্য কর্তব্যও। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

تعاونوا على البر والتقوى ص ولا تعاونوا على الاثم

والعدوان ص (المائدة : ٢)

—নেকী এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্য করো এবং গুনাহ্ ও অবাধ্যতার কাজে সাহায্য করো না। —আল-মায়েদা ঃ ২

يايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ۝

—ঈমানদাররা! আল্লাকে ভয় করো এবং সত্য সঠিক কথা বলো। —আল-আহ্যাব ঃ ৭০

يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو

৩৮. ঐ ৩৯. ঐ।

على انفسكم او الوالدين و الاقربين ج (النساء : ١٣٥)

—ঈমারদাররা। তোমরা সকলে ন্যায় বিচারে অটল-অবিচল থাকো এবং আল্লার জন্য সাক্ষ্যদাতা হও—তোমাদের সাক্ষ্য স্বয়ং তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যাক না কেন।

المنفقون و المنفقت بعضهم من بعض م يامرون بالمنكر
و ينهون عن المعروف ... و المؤمنون و المؤمنت بعضهم
اولياء بعض ، يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر -

—মুনাফিক নারী-পুরুষ একই থলের বিড়াল, তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়, ভাল কাজ থেকে বারণ করে।......আর মু'মিন নারী-পুরুষ একে অন্যের সাথী, তারা ভাল কাজের নির্দেশ দান করে আর মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। —আত-তাওবা ঃ ৬৭-৭১

আল-কুরআনে ঈমানদারদের এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উক্ত হয়েছে ঃ

الامرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و الحفظون
لحدود الله ط (التوبة : ١١٢)

—নেকীর নির্দেশ দানকারী, মন্দ কাজ থেকে বারণকারী এবং আল্লার সীমারেখা সংরক্ষণকারী। —আত-তাওবা ঃ ১১২

এ ব্যাপারে নবী (সঃ)-এর এরশাদ এই ঃ

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده - فان لم يستطع
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه - و ذالك اضعف الايمان -

—তোমাদের কেউ যদি কোন মুনকার (অসৎ কাজ) দেখে, তবে তার উচিত হাত দিয়ে তা প্রতিহত করা। তা যদি না পারে, তবে মুখ দ্বারা বারণ করবে, তাও যদি না পারে, তবে অন্তর দ্বারা (খারাপ জানবে এবং বারণ করার আগ্রহ রাখবে), আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।[৪০]

ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ،
و يفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده ، فهو مؤمن ، و من
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،
و ليس وراء ذالك حبة خردل من الايمان ـ

—অতঃপর অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থানে বসবে। তারা এমন সব কথা বলবে, যা নিজেরা করবে না, এমন সব কাজ করবে, যার নির্দেশ দেয়া হয়নি তাদেরকে। যে হাতের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে, সে মুমিন; যে জিহ্বার সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে, সে মু'মিন ; অন্তর দিয়ে যে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে, সে মু'মিন। ঈমানের এর চেয়ে ক্ষুদ্র সামান্যতম পর্যায়ও নেই।[৪১]

افضل الجهاد كلمة عدل (او حق) عند سلطان جائر ـ

—যালেম শাসকের সামনে ন্যায় বা সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জেহাদ।[৪২]

ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه او شك
ان يعمهم الله بعقاب منه ـ

---

৪০. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়–২০। তিরমিযি, আবওযাবুল ফিতান, অধ্যায়–১২। আবু দাউদ, কিতবুল মালাহেম, অধ্যায়–১৭, ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ফিতান, অধ্যায়–২০।

৪১. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়–২০

৪২. আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, অধ্যায়–১৭। তিরমিযি, কিতাবুল ফিতান, অধ্যায়–১২। নাসায়ী, কিতাবুল বায়আত, অধ্যায়–৩৬। ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ফিতান, অধ্যায়–২০।

—যালেমকে দেখেও যারা তার হাত ধরে না (বাধা দেয় না) তাঁদের ওপর আল্লাহর আযাব প্রেরণ করা দূরে নয়। [৪৩]

انه ستكون بعدى امراء - من صدقهم بكذبهم واعانهم
على ظلمهم فليس منى ولست منهم -

—আমার পরে কিছু লোক শাসক হবে। যে ব্যক্তি মিথ্যার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে আমার নয় এবং আমি তার নই। [৪৪]

سيكون عليكم ائمة ، يملكون ارزاقكم يحدثونكم
فيكذبونكم ، ويعملون فيسيئون العمل ، لا يرضون
منكم حتى تحسنوا قبيحهم ، وتصدقوا كذبهم ، فاعطوهم
الحق ما رضوا به ، فاذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك
فهو شهيد -

—অনতিবিলম্বে এমন সব লোক তোমাদের ওপর শাসক হবে, যাদের হাতে থাকবে তোমাদের জীবিকা, তারা তোমাদের সাথে কথা বললে মিথ্যা বলবে, কাজ করলে খারাপ কাজ করবে। তোমরা যতক্ষণ তাদের মন্দ কাজের প্রশংসা না করবে, তাদের মিথ্যায় বিশ্বাস না করবে, ততক্ষণ তারা তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না। সত্যকে বরদাশত করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সামনে সত্য পেশ করে যাও। তারপর যদি তারা তার সীমালংঘন করে যায়, তাহলে যে ব্যক্তি এ জন্য নিহত হবে, সে শহীদ। [৪৫]

---
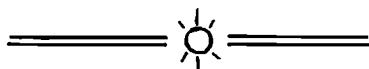
৪৩. আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, অধ্যায়-১৭। তিরমিযি, কিতাবুল ফিতান, অধ্যায়-১২

৪৪. নাসায়ী, কিতাবুল বায়আত, অধ্যায়—৩৪-৩৫

৪৫. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং—২৯৭।

من ارضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله -

—যে ব্যক্তি কোন শাসককে রাযী করার জন্য এমন কথা বলে, যা তার প্রতিপালককে নারায করে, সে ব্যক্তি আল্লার দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে।[৪৬]

৪৬. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং—৩০৯।

তৃতীয় অধ্যায়

খেলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য

খেলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য

আগের অধ্যায়ে ইসলামের যে শাসননীতি বিবৃত হয়েছে, নবী (সঃ)-এর পরে সেসব মূলনীতির ওপর খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত (সঃ)-এর প্রত্যক্ষ শিক্ষা-দীক্ষা ও কার্যকর নেতৃত্বের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রত্যেক সদস্যই জানতো, ইসলামের বিধি বিধান ও প্রাণসত্তা অনুযায়ী কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। নিজের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে হযরত (সঃ) কোন ফায়সালা না দিয়ে গেলেও ইসলাম একটি শূরাভিত্তিক খেলাফত দাবী করে—মুসলিম সমাজের সদস্যরা এ কথা অবগত ছিল। তাই সেখানে কোন বংশানুক্রমিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বল প্রয়োগে কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি, খেলাফত লাভ করার জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা-তদবীর করেনি বা নামমাত্র প্রচেষ্টাও চালায়নি। বরং জনগণ তাদের স্বাধীন মর্যীমতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলীফা নির্বাচিত করে। মুসলিম মিল্লাত এ খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা (সত্যাশ্রয়ী খেলাফত) বলে গ্রহণ করেছে। এ থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পায় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটিই ছিল খেলাফতের সত্যিকার পদ্ধতি।

এক ঃ নির্বাচনী খেলাফত

নবী করীম (সঃ)-এর স্থলাভিষিক্তের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেন। মদীনার সকলেই (বস্তুত তখন তারা কার্যত সারা দেশের প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল) কোন প্রকার চাপ-প্রভাব এবং প্রলোভন ব্যতীত নিজেরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে পসন্দ করে তাঁর হাতে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর ওফাতকালে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সম্পর্কে ওসিয়াত লিখান, অতঃপর জনগণকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেন ঃ

"অমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তার ওপর সন্তুষ্ট? আল্লার শপথ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। আমার কোন আত্মীয়-স্বজনকে নয়, বরং ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।"

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে ঃ আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো এবং মানবো।[১]

হযরত ওমর (রাঃ)-এর জীবনের শেষ বছর হজ্জের সময় এক ব্যক্তি বললো ঃ ওমর (রাঃ) মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বায়আত করবো। কারণ, আবুবকর (রাঃ)-এর বায়আতও তো হঠাৎই হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছেন।[২] হযরত ওমর (রাঃ) এ সম্পর্কে জানতে পেরে

---

১. আততাবারী—তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা— ৬১৮। আল-মাতবাআতুল ইস্তেকামা, কায়রো ১৯৩৯।

২ তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সাকীফায়ে বনী-সায়েদার মজলিসে হযরত ওমর (রাঃ) হঠাৎ

বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমি এক ভাষণ দেবো। জনগণের ওপর যারা জোরপূর্বক নিজেদেরকে চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে, তাদের সম্পর্কে আমি জনগণকে সতর্ক করে দেবো। মদীনায় পৌঁছে তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সাকীফায়ে বনী-সায়েদার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে বলেন যে, তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ) -এর নাম প্রস্তাব করে আমি তাঁর হাতে বায়আত করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ তখন যদি এ রকম না করতাম এবং খেলাফতের মীমাংসা না করেই আমরা মজলিস ছেড়ে উঠে আসতাম, তবে রাতারাতি লোকদের কোন ভুল সিদ্ধান্ত করে বসার আশংকা ছিল। আর সে ফায়সালা মেনে নেয়া এবং তা পরিবর্তন করা-উভয়ই আমাদের জন্য কঠিন হতো। এ পদক্ষেপটি সাফল্য মন্ডিত হলেও ভবিষ্যতের জন্য একে নযীর হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আবুবকরের মতো উন্নত মানের এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তোমাদের মধ্যে আর কে আছে? এখন কোন ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে বায়আত করে তাহলে সে এবং যার হাতে বায়আত করা হবে—উভয়েই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে।[৩]

তাঁর নিজের ব্যাখ্যা করা এ পদ্ধতি অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) খেলাফতের ফায়সালা করার জন্য তাঁর ওফাতকালে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেন ঃ "মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করো।" খেলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সে জন্য তিনি খেলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন।[৪] ছ'ব্যক্তিকে নিয়ে এ নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মতে এরা ছিলেন কওমের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয়।

কমিটির সদস্য আবদুর রহমান (রাঃ) ইবনে আওফকে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলিফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করে। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,

---

দাঁড়িয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেছেন এবং হাত বাড়িয়ে তখনই তাঁর হাতে বায়আত করেছেন। তাঁকে খলীফা করার ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কোন পরামর্শ করেননি।

৩. বুখারী, কিতাবুল মোহারেবীন, অধ্যায়—১৬। মুসনাদে আহমাদ, ১ম খন্ড, হাদীস নম্বর—৩৯১। তৃতীয় সংস্করণ, দারুল মাআরেফ, মিসর ১৯৪৯। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর শব্দগুলো ছিল এই ঃ "মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোন আমীরের হাতে বায়আত করে, তার কোন বায়আত নেই ; এবং যার হাতে বায়আত করে, তারও কোন বায়আত নেই।" অপর এক বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ বাক্যও দেখা যায়—"পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে এমারাত দেয়া হলে তা কবুল করা তার জন্য হালাল নয়।" -(ইবনে হাযার, ফতহুলবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১২৫, আল-মাতবায়াতুল খাইরিয়া, কায়রো, ১৩২৫ হিজরী।)

৪. আত্‌তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—২৯২। ইবনুল আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৪-৩৫। ইদারাতুত তিবআতিল মুনীরিয়া, মিসর, ১৩৫৬ হিজরী। তাবাকাতে ইবনে সাআদ, তৃতীয়

অধিকাংশ লোকই হযরত ওসমান (রাঃ)–এর পক্ষে।[৫] তাই তাঁকেই খেলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ জনসমাবেশে তার বায়আত হয়।

হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাহাদাতের পর কিছু লোক হযরত আলী (রাঃ)–কে খলীফা করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ "এমন করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এটা তো শূরার সদস্য এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তারা যাঁকে খলীফা করতে চান, তিনিই খলীফা হবেন। আমরা মিলিত হবো এবং এ ব্যাপারে চিন্তা–ভবনা করবো।"[৬] তাবারী হযরত আলী (রাঃ) এর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে, তা হচ্ছে ঃ "গোপনে আমার বায়আত অনুষ্ঠিত হতে পারে না, তা হতে হবে মুসলমানদের মর্জী অনুযায়ী।"[৭]

হযরত আলী (রাঃ)–এর ওফাতকালে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আমরা আপনার পুত্র হযরত হাসান (রাঃ)–এর হাতে বায়আত করবো? জবাবে তিনি বলেন ঃ "আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছি না, নিষেধও করছি না। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে ভালোভাবে বিবেচনা করতে পারো।"[৮] তিনি যখন আপন পুত্রদেরকে শেষ ওসিয়াত করছিলেন, ঠিক সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমীরুল মু'মিনীন। আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেন না কেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ "আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।"[৯]

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খেলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাহাবীদের সর্বসম্মত মত এই ছিল যে, খেলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক পদ–মর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খেলাফত নয়, বরং তা বাদশাহী—রাজতন্ত্র। খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবায়ে কেরামগণ পোষণ করতেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) তা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৪৪, বৈরুত সংস্করণ ১৯৫৭। ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৯।

৫. আত্‌তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—২৯৬। ইবনুল আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৬। আল–বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—১৪৬।

৬. ইবনে কোতায়বা, আল–ইমামা ওয়াস সিয়াসা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৪১।

৭. আত্‌তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৫০।

৮. আত্‌তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা—১১২। আল–মাসউদী, মুরুজুয্‌ যাহাব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৬। আল–মাতবাআতুল বাহিয়্যা, মিসর, ১২৪৬ হিজরী।

৯. ইবনে কাসীর, আল–বেদায়া ওয়ান নেহায়া, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা—১৩–১৪ মাতবাআতুস সাআদাত, মিসর। আল–মাউদি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৬।

ان الامارة ما اؤتمر فيها و ان الملك ما غلب عليه

بالسيف -

—এমারাত (অর্থাৎ খেলাফত) হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে, আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।[১০]

দুই : শূরাভিত্তিক সরকার

এ খলীফা চুতষ্টয় সরকারের কার্যনির্বাহ এবং আইন প্রণয়ণের ব্যাপারে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে কোন কাজ করতেন না। সুনানে দারামীতে হযরত মায়মুন ইবনে মাহরানের একটি বর্ণনা আছে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ)–এর নীতি ছিল, তাঁর সামনে কোন বিষয় উত্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব কি বলে। সেখানে কোন নির্দেশ না পেলে এ ধরনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি ফায়সালা দিয়েছেন, তা জানতে চেষ্টা করতেন। রাসূলের সুন্নায়ও কোন নির্দেশ না পেলে জাতীয় শীর্ষস্থানীয় এবং সৎ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ করতেন। সকলের পরামর্শক্রমে যে মতই স্থির হতো, তদানুযায়ী ফায়সালা করতেন।[১১] হযরত ওমর (রাঃ)–এর কর্মনীতিও ছিল অনুরূপ।[১২]

পরামর্শের ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শূরার সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) এক পরামর্শ সভার উদ্বোধনী ভাষণে খেলাফতের পলিসি ব্যক্ত করেছেন এরূপে :

"আমি আপনাদেরকে যে জন্য কষ্ট দিয়েছি, তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আপনাদের কার্যাদির আমানাতের যে ভার আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা বহন করার কাজে আপনারাও আমার সঙ্গে শরীক হবেন। আমি আপনাদের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি। আজ আপনারাই সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্য থেকে যাদের ইচ্ছা, আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন ; আবার যাদের ইচ্ছা আমার সাথে এক মতও হতে পারেন। আপনাদের যে আমার মতামতকে সমর্থন করতে হবে—এমন কোন কথা নেই এবং আমি তা চাই–ও না।"[১৩]

তিন : বায়তুলমাল একটি আমানাত

তাঁরা বায়তুলমালকে আল্লাহ এবং জনগণের আমানাত মনে করতেন। বেআইনীভাবে বায়তুলমালের মধ্যে কিছু প্রবেশ করা ও বেআইনীভাবে তা থেকে কিছু বের হয়ে যাওয়াকে তারা

১০. তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা–১১৩
১১. সুনানে দারামী, বাবুল ফুতইয়া ওয়ামা ফিহে মিনাশ শিদ্দাতে।
১২. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস—২২৮১
১৩. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা—২৫।

জায়েয মনে করতেন না। শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিগত স্বার্থে বায়তুলমাল ব্যবহার তাঁদের মতে হারাম ছিল। তাদের মতে খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যই ছিল এই যে, রাজা-বাদশাহরা জাতীয়ভান্ডারকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে নিজেদের খাহেশ মতো স্বাধীনভাবে তাতে তসরুফ করতো, আর খলীফা তাকে আল্লাহ্ এবং জনগণের আমানাত মনে করে সত্য-ন্যায়-নীতি মোতাবেক এক একটি পাই পয়সা উসুল করতেন, আর তা ব্যয়ও করতেন সত্য-ন্যায়-নীতি অনুসারে। হযরত ওমর (রাঃ) একদা হযরত সালমান ফারসীকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমি বাদশাহ্, না খলীফা?" তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেন ঃ "মুসলমানদের ভূমি থেকে আপনি যদি এক দেরহামও অন্যায়ভাবে উসুল এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তাহলে আপনি খলীফা নন, বাদশাহ্।" অপর এক প্রসঙ্গে একদা হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় মজলিসে বলেন ঃ "আল্লার কসম, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না যে, আমি বাদশা, না খলীফা। আমি যদি বাদশাহ হয়ে গিয়ে থাকি। তবে তা তো এক সাংঘাতিক কথা।" এতে জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ "আমীরুল মুমিনীন। এতদোভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।" হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি পার্থক্য? তিনি বললেন ঃ "খলীফা অন্যায়ভাবে কিছুই গ্রহণ করেন না, অন্যায়ভাবে কিছুই ব্যয়ও করেন না। আল্লার মেহেরবানীতে আপনিও অনুরূপ। আর বাদশাহ তো মানুষের ওপর যুলুম করে, অন্যায়ভাবে একজনের কাছ থেকে উসুল করে; আর অন্যায়ভাবেই অপরজনকে দান করে।" [১৪]

এ ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা প্রণিধান যোগ্য। হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পরদিন কাপড়ের থান কাঁধে নিয়ে বিক্রি করার জন্য বেরিয়েছেন। কারণ, খেলাফতের পূর্বে এটিই ছিল তাঁর জীবিকার অবলম্বন। পথে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে দেখা। তিনি বললেন, আপনি একি করছেন? জবাব দিলেন, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াবো কোত্থেকে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, মুসলমানদের নেতৃত্বের ভার আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে। ব্যবসায়ের সাথে খেলাফতের কাজ চলতে পারে না। চলুন আবু ওবায়দা (বায়তুল মালের খাজাঞ্চী)-এর সাথে আলাপ করি। তাই হলো। হযরত ওমর (রাঃ) আবু ওবায়দার সাথে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, একজন সাধারণ মুহাজিরের আমদানীর মান সামনে রেখে আমি আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিচ্ছি। এ ভাতা মুহাজিরদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির সমানও নয় ; আবার সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তির পর্যায়েরও নয়। এমনিভাবে তাঁর জন্য একটা ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এর পরিমাণ ছিল বার্ষিক চার হাযার দিরহামের কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ওসিয়াত করে যান যে, আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আট হাযার দিরহাম বায়তুলমালকে ফেরত দেবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট তা আনা হলে তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ আবুবকর (রাঃ)-এর প্রতি রহমত করুন। উত্তরসূরীদেরকে তিনি মুশকিলে ফেলেছেন।" [১৫]

বায়তুলমালে খলীফার অধিকার কতটুকু এ প্রসঙ্গে খলীফা ওমর (রাঃ) একদা তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ

---

১৪. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৬-৩০৭।

১৫. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং ২২৮০-২২৮৫।

"গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে এক জোড়া কাপড়, কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার-পরিজনের জন্য—এ ছাড়া আল্লার সম্পদের মধ্যে আর কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। আমি তো মুসলমানদের একজন সাধারণ ব্যক্তি বৈ কিছুই নই।"[১৬]

অপর এক ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"এ সম্পদের ব্যাপারে তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুকেই আমি ন্যায় মনে করি না। ন্যায় ভাবে গ্রহণ করা হবে, ন্যায় মুতাবিক প্রদান করা হবে এবং বাতেল থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে। এতীমের সম্পদের সাথে তার অভিভাবকের যে সম্পর্ক, তোমাদের এ সম্পদের সাথে আমার সম্পর্কও ঠিক অনুরূপ। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না, অভাবী হলে মা'রুফ পন্থায় গ্রহণ করবো।"[১৭]

হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর বেতনের মান যা ছিল, হযরত আলী (রাঃ)-ও তাঁর বেতনের মান তাই রাখলেন। তিনি পায়ের হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝবরাবর পর্যন্ত উঁচু তহবন্দ পরতেন। তাও আবার ছিল তালিযুক্ত।[১৮] সারাজীবন কখনো একটু আরামে কাটাবার সুযোগ হয়নি। একবার শীতের মওসুমে জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। দেখেন, তিনি একখানা ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে বসে আছেন আর শীতে কাঁপছেন।[১৯] শাহাদাতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব নিয়ে দেখা গেল মাত্র ৭শত দিরহাম। তাও তিনি এক পয়সা এক পয়সা করে সঞ্চয় করেছেন একটা গোলাম খরিদ করার জন্য।[২০] আমীরুল মু'মিনীন বলে চিনতে পেরে তাঁর কাছ থেকে যাতে কম মূল্য কেউ গ্রহণ না করে—এ ভয়ে কোন পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে বাজারে কখনো কোন জিনিস কিনতেন না।[২১] সে সময় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে তাঁর সংঘর্ষ চলছিল, কেউ কেউ তাঁকে পরামর্শ দেন ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যে রকম লোকদেরকে অঢেল দান-দক্ষিণা করে তাঁর সাথি করে নিচ্ছেন আপনিও তেমনি বায়তুলমালের ভান্ডার উজাড় করে টাকার বন্যা বইয়ে দিয়ে সমর্থক সংগ্রহ করুন। কিন্তু তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন "তোমরা কি চাও, আমি অন্যায়ভাবে সফল হই?"[২২] তাঁর আপন ভাই হযরত আকীল (রাঃ) তাঁর কাছে টাকা দাবী করেন বায়তুলমাল থেকে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করে বলেন ঃ "তুমি কি চাও তোমার ভাইও মুসলমানদের টাকা তোমাকে দিয়ে জাহান্নামে যাক?"[২৩]

---

১৬. ইবনে কাসীর, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, পৃষ্ঠা—১৩৪।
১৭. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা—১১৭।
১৮. ইবনে সাআদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—২৮।
১৯. ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৩।
২০. ইবনে সাআদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৮।
২১. ইবনে সাআদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—২৮। ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৩।
২২. ইবনে আবিল হাদীদ, নাহজুল বালাগার ভাষ্য, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা—১৮২। দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা, মিসর, ১৩২৯ হিজরী।
২৩. ইবনে কোতাইবা—আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৭১। হাফেয ইবনে হাজার তাঁর আল-ইসাবা গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আকীলের কিছু ঋণ ছিল। হযরত আলী (রাঃ)

৬—

চার ঃ রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কি ছিল, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিজের মর্যাদা এবং কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা কি ধারণা পোষণ করতেন, স্বীয় রাষ্ট্রে তাঁরা কোন্ নীতি মেনে চলতেন?—খেলাফতের মঞ্চ থেকে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ্যে এসব বিষয় ব্যক্ত করেছেন। মসজিদে নববীতে গণ বায়আত ও সপথের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সে সত্তার শপথ , যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত, আমি নিজে ইচ্ছা করে এ পদ গ্রহণ করিনি। অন্যের পরিবর্তে আমি নিজে এ পদ লাভের চেষ্টাও করিনি, এ জন্য আমি কখনো আল্লার নিকট দোয়াও করিনি। এ জন্য আমার অন্তরে কখনো লোভ সৃষ্টি হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরবদের মধ্যে ধর্ম ত্যাগের ফেতনার সূচনা হবে—এ আশংকায় আমি অনিচ্ছা সত্বে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এ পদে আমার কোন শান্তি নেই। বরং এটা এক বিরাট বোঝা, যা আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য আল্লাহ্ যদি আমার সাহায্য করেন। আমার ইচ্ছা ছিল, অন্য কেউ এ গুরুদায়িত্ব-ভার বহন করুক। এখনও আপনারা ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লা (সঃ)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে কাউকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নিতে পারেন। আমার বায়আত এ ব্যাপারে আপনাদের প্রতিবন্ধক হবে না। আপনারা যদি আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মানদন্ডে যাচাই করেন, তাঁর কাছে আপনারা যে আশা পোষণ করতেন, আমার কাছেও যদি সে আশা করেন, তবে তার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ, তিনি শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন, তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো। আমি সঠিক কাজ করলে আমার সহযোগিতা করবেন, অন্যায় করলে আমাকে সোজা করে দেবেন। সততা হচ্ছে একটি আমানত—গচ্ছিত ধন। আর মিথ্যা একটি খেয়ানত—গচ্ছিত সম্পদ অপহরণ। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল। আল্লার ইচ্ছায় যতক্ষণ আমি তার অধিকার তাকে দান না করি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল-যতক্ষণ আল্লার ইচ্ছায় আমি তার কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে না পারি। কোন জাতি আল্লার রাস্তায় চেষ্টা সাধনা ত্যাগ করার পরও আল্লাহ্ তার ওপর অপমান চাপিয়ে দেননি-এমনটি কখনো হয়নি। কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করার পরও আল্লাহ্ তাদেরকে সাধারণ বিপদে নিপতিত করেন না-এমনও হয় না। আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ)-এর অনুগত থাকি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। আমি আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ)-এর নাফরমানী করলে তোমাদের ওপর আমার কোন আনুগত্য নেই। আমি অনুসরণকারী, কোন নতুন পথের উদ্ভাবক নই।" [২৪]

তা পরিশোধ করতে অস্বীকার করেন। তাই তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর দলে ভিড়ে ছিলেন।—আল-ইসাবা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৮৭। মাতবাআতু মুস্তফা মুহাম্মাদ, মিসর ১৯৩৯।

২৪. আত্‌তাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৫০। ইবনে হিশাম, আস সীরাতুন নববিয়্যা, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা—৩১১, মাতবাআতু মুস্তফা আল-বাবী, মিসর—১৯৩৬, কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং—২২৬১, ২২৬৪, ২২৬৮, ২২৭৮, ২২৯১, ২২৯৯।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ

"লোক সকল। আল্লার অবাধ্যতায় কারোর আনুগত্য করতে হবে—নিজের সম্পর্কে এমন অধিকারের দাবী কেউ করতে পারে না। ....লোক সকল। আমার ওপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে, আমি তোমাদের নিকট তা ব্যক্ত করছি। এসব অধিকারের জন্য তোমরা আমাকে পাকড়াও করতে পারো। আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, খেরাজ বা আল্লার দেয়া 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে বা রক্তপাত ছাড়াই যে গনীমাতের মাল লব্ধ হয়) থেকে বেআইনীভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবো না। আর আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, এভাবে যে অর্থ আমার হাতে আসে, অন্যায়ভাবে তার কোন অংশেও আমি ব্যয় করবো না।" ২৫

সিরিয়া ও ফিলিস্তিন যুদ্ধে হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে প্রেরণ কালে হযরত আবুবকর (রাঃ) যে হেদায়াত দান করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"আমর। আপন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কাজে আল্লাকে ভয় করে চলো। তাঁকে লজ্জা করে চলো। কারণ, তিনি তোমাকে এবং তোমার সকল কর্মকেই দেখতে পান। ....পরকালের জন্য কাজ করো। তোমার সকল কর্মে আল্লার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখো। সঙ্গী-সাথীদের সাথে এমনভাবে আচরণ করবে, যেন তারা তোমার সন্তান। মানুষের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়িয়ো না। বাহ্য কাজের ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে আচরণ করো। ...... নিজেকে সংযত রাখবে, তোমার প্রজা সাধারণও ঠিক থাকবে।" ২৬

হযরত ওমর (রাঃ) শাসনকর্তাদের কোন এলাকায় প্রেরণকালে সম্বোধন করে বলতেন ঃ

"মানুষের দন্ড-মুন্ডের মালিক বনে বসার জন্য আমি তোমাদেরকে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মাতের ওপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করছি না। বরং আমি তোমাদেরকে এ জন্য নিযুক্ত করছি যে, তোমরা সালাত কায়েম করবে, মানুষের মধ্যে ইনসাফের ফায়সালা করবে, ন্যায়ের সাথে তাদের অধিকার বন্টন করবে।" ২৭

বায়আতের পর হযরত ওসমান (রাঃ) প্রথম যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"শোন, আমি অনুসরণকারী, নতুন পথের উদ্ভাবক নই। জেনে রেখো, আল্লার কিতাব এবং রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাহ মেনে চলার পর আমি তোমাদের নিকট তিনটি বিষয় মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। এক ঃ আমার খেলাফতের পূর্বে তোমরা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে নীতি নির্ধারণ করেছো, আমি তা মেনে চলবো। দুই ঃ যেসব ব্যাপারে পূর্বে কোন নীতি-পন্থা নির্ধারিত হয়নি, সেসব ব্যাপারে সকলের সাথে পরামর্শক্রমে কল্যাণাভিসারীদের পন্থা নির্ধারণ করবো। তিন ঃ আইনের দৃষ্টিতে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবো।" ২৮

---

২৫. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা—১১৭।
২৬. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং—২৩১৩।
২৭. আততাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—২৭৩।
২৮. আততাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৪৬।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত কায়েস ইবনে সা'দকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার কালে মিসরবাসীদের নামে যে ফরমান দান করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"সাবধান! আমি আল্লার কিতাব এবং তাঁর রাসূল (সঃ)–এর সুন্নাহ্ মুতাবিক আমল করবো– আমার ওপর তোমাদের এ অধিকার রয়েছে। আল্লার নির্ধারিত অধিকার অনুযায়ী আমি তোমাদের কাজ–কারবার পরিচালনা করবো এবং রাসূলুল্লার সুন্নাহ কার্যকরী করবো। তোমাদের অগোচরেও তোমাদের কল্যাণ কামনা করবো।"

প্রকাশ্য জনসমাবেশে এ ফরমান পাঠ করে শোনাবার পর হযরত কায়েস ইবনে সাআ'দ ঘোষণা করেন ঃ "আমি তোমাদের সাথে এভাবে আচরণ না করলে তোমাদের ওপর আমার কোন বায়আত নেই।" [২৯]

হযরত আলী (রাঃ) জনৈক গবর্ণরকে লিখেন ঃ

"তোমরা এবং জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করো না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক। এর ফলে তারা সত্যিকার অবস্থা জানতে পারে না। ক্ষুদ্র বিষয় তাদের জন্য বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়, আর বিরাট বিষয় ক্ষুদ্র। তাদের জন্য ভাল মন্দ হয়ে দেখা দেয়, আর মন্দ গ্রহণ করে ভালর আকার ; সত্য–মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।" [৩০]

"হযরত আলী (রাঃ) কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি অনুরূপ কাজও করেছেন। তিনি নিজে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন, জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন, ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেকটি বাজারে চক্কর দিয়ে দেখতেন, ব্যবসায়ীরা কাজ–কারবারে প্রতারণা করছে কিনা। এ দৈনন্দিন ঘোরাঘুরির ফলে কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে দেখে ধারণাই করতে পারতো না যে, মুসলিম জাহানের খলীফা তার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ, তাঁর পোশাক থেকে বাদশাহীর কোন পরিচয় পাওয়া যেতোনা, তাঁর আগে আগে পথ করে দেয়ার জন্য কোন রক্ষীবাহিনীও দৌড়ে যেতো না।" [৩১]

একবার হযরত ওমর (রাঃ) প্রকাশ্য ঘোষণা করেন ঃ

"তোমাদেরকে পিটাবার জন্য আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আমি গবর্ণরদেরকে নিযুক্ত করিনি। তাদেরকে নিযুক্ত করেছি এ জন্য যে, তারা তোমাদেরকে দ্বীন এবং নবীর তরীকা–পদ্ধতি শিক্ষা দেবে। কারো সাথে এই নির্দেশ বিরোধী ব্যবহার করা হলে সে আমার কাছে অভিযোগ উত্থাপন করুক। আল্লার কসম করে বলছি, আমি তার (গবর্ণর) কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। এতে হযরত আমর ইবনুল আস (মিসরের গবর্ণর) দাঁড়িয়ে বলেন ঃ "কেউ যদি মুসলমানদের শাসক হয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদেরকে মারে, আপনি কি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবেন?"

---

২৯. আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৫৫০–৫৫১।
৩০. ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৮।
৩১. ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা—৪–৫।

হযরত ওমর (রাঃ) জবাব দেন : "হাঁ, আল্লার শপথ করে বলছি, আমি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবো। আমি আল্লার রাসূল (সঃ)-কে তাঁর নিজের সত্তা থেকেও প্রতি বিধান দিতে দেখেছি।" ৩২

আর একবার হজ্জ উপলক্ষে হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত গবর্ণরকে ডেকে প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলেন : এদের বিরুদ্ধে কারোর ওপর কোন অত্যাচারের অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারো নির্দ্বিধায়। গোটা সমাবেশ থেকে মাত্র একজন লোক উঠে হযরত আমর ইবনুল আস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন : তিনি অন্যায় ভাবে আমাকে একশ দোররা মেরেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন : ওঠ এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। হযরত আমর ইবনুল আস প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি গবর্ণরদের বিরুদ্ধে এ পথ উন্মুক্ত করবেন না । কিন্তু তিনি বললেন : "আমি আল্লার রাসূলকে নিজের থেকে প্রতিশোধ দিতে দেখেছি। হে অভিযোগকারী, এসে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" শেষ পর্যন্ত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে প্রতিটি বেত্রাঘাতের জন্য দু'আশরাফী দিয়ে আপন পিঠ রক্ষা করতে হয়। ৩৩

পাঁচ : আইনের প্রাধান্য

এ খলীফারা নিজেকেও আইনের উর্ধে মনে করতেন না। বরং আইনের দৃষ্টিতে নিজেকে এবং দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে (সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম যিম্মি) সমান মনে করতেন। রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি (কাযী) নিযুক্ত করলেও খলীফাদের বিরুদ্ধে রায়দানে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন—যেমন স্বাধীন একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যাপারে। একবার হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-এর মধ্যে এক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উভয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-কে শালিস নিযুক্ত করেন, বাদী-বিবাদী উভয়ে যায়েদ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। যায়েদ (রাঃ) দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-কে তাঁর আসনে বসাতে চাইলেন ; কিন্তু তিনি উবাই (রাঃ)-এর সাথে বসলেন। অতঃপর হযরত উবাই (রাঃ) তাঁর আর্যী পেশ করলেন, হযরত ওমর (রাঃ) অভিযোগ অস্বীকার করলেন। নিয়ম অনুযায়ী যায়েদ (রাঃ)-এর উচিত ছিল হযরত ওমরের কাছ থেকে কসম আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন, হযরত ওমর নিজে কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেন : "যতক্ষণ যায়েদের কাছে একজন সাধারণ মুসলমান এবং ওমর সমান না হয়, ততক্ষণ যায়েদ বিচারক হতে পারে না।" ৩৪

এমনি একটি ঘটনা ঘটে জনৈক খৃষ্টানের সাথে হযরত আলী (রাঃ)-এর। কূফার বাজারে হযরত আলী (রাঃ) দেখতে পেলেন, জনৈক খৃষ্টান তাঁর হারানো লৌহবর্ম বিক্রি করছে। আমীরুল মু'মিনীন

---

৩২. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা—১১৫। মুসনাদে আবু দাউদ আত্‌তায়ালেসী, হাদীস নং—৫৫। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৩০। আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—২৭৩।

৩৩. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা—১১৬।

৩৪. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৬। দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫ হিজরী।

হিসেবে তিনি সে ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ম ছিনিয়ে নেননি বরং কাযীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাযী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দান করলেন। [৩৫]

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আলী (রাঃ) এবং জনৈক যিম্মী বাদী-বিবাদী হিসেবে কাযী শোরাইহ্-এর আদালতে উপস্থিত হন। কাযী দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি (হযরত আলী) বলেন, "এটা তোমার প্রথম বে-ইনসাফী।" [৩৬]

ছয় ঃ বংশ-গোত্রের পক্ষপাতমুক্ত শাসন

ইসলামের প্রাথমিক যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইসলামের নীতি এবং প্রাণশক্তি অনুযায়ী তখন বংশ-গোত্র এবং দেশের পক্ষপাতের উর্ধে উঠে সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করা হতো—কারো সাথে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করা হতো না।

আল্লার রাসূলের ওফাতের পরে আরবের গোত্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ঝঞ্ঝার বেগে। নবুয়াতের দাবীদারদের অভ্যুদয় এবং ইসলাম ত্যাগের হিড়িকের মধ্যে এ উপাদান ছিল সবচেয়ে ক্রিয়াশীল। মোসায়লামার জনৈক ভক্তের উক্তি ঃ "আমি জানি, মোসায়লামা মিথ্যাবাদী। কিন্তু 'রাবীআর' মিথ্যাবাদী 'মোযারের' সত্যবাদীর চেয়ে উত্তম।" [৩৭] মিথ্যা নবুয়াতের অপর এক দাবীদার তোলাইহার সমর্থনে বনু গাতফানের জনৈক সর্দার বলেন ঃ "খোদার কসম, কুরাইশের নবীর অনুসরণ করার চেয়ে আমাদের বন্ধুগোত্রের নবীর অনুসরণ আমার নিকট অধিক প্রিয়।" [৩৮]

মদীনায় যখন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে বায়আত অনুষ্ঠিত হয়, তখন গোত্রবাদের ভিত্তিতে হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) তাঁর খেলাফত স্বীকার করা থেকে বিরত ছিলেন। এমনি করে গোত্রবাদের ভিত্তিতেই হযরত আবু সুফিয়ানের নিকট তাঁর খেলাফত ছিল অপসন্দনীয়। তিনি হজরত আলী (রাঃ) নিকট গিয়ে বলেছিলেন ঃ "কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের লোক কি করে খলীফা হয়ে গেল? তুমি নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে প্রস্তুত হলে আমি পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা সমগ্র উপত্যকা ভরে ফেলবো।" কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এক মোক্ষম জবাব দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন ঃ তোমার এ কথা ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা প্রমাণ করে। তুমি কোন পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনী আনো, আমি তা কখনো চাই না। মুসলমানরা পরস্পরের কল্যাণকামী। তারা একে অপরকে ভালবাসে।—তাদের আবাস ও দৈহিক সত্তার মধ্যে যতোই ব্যবধান থাক না কেন। অবশ্য মুনাফিক একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী। আমরা

---

৩৫. ঐ

৩৬. ইবনে খাল্লেকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৮, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৪৮।

৩৭. আত্‌তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫০৮।

৩৮. ঐ, পৃষ্ঠা—৪৮৭।

আবুবকরকে এ পদের যোগ্য মনে করি। তিনি এ পদের যোগ্য না হলে আমরা কখনো তাঁকে এ পদে নিয়োজিত হতে দিতাম না।" ৩৯

এ পরিবেশে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং তারপর হযরত ওমর (রাঃ) নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতমুক্ত ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে কেবল আরবের বিভিন্ন গোত্রে নয়, বরং অ-আরব নওমুসলিমদের সাথেও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং আপন বংশ-গোত্রের সাথে কোন প্রকার ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। এর ফলে সব রকম বংশ গোত্রবাদ বিলীন হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের দাবী অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক প্রাণশক্তি ফুটে ওঠে। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে আপন গোত্রের কোন লোককে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করেননি। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর গোটা শাসনকালে তাঁর গোত্রের একজন মাত্র ব্যক্তিকে—যার নাম ছিল নো'মান ইবনে আদী—বসরার নিকটে মায়দান নামক এক ক্ষুদ্র এলাকার তহশিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। অল্প কিছুদিন পরই আবার এ পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন। ৪০ এদিক থেকে এ দু'জন খলীফার কর্মধারা সত্যিকার আদর্শভিত্তিক ছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) জীবনের শেষ অধ্যায়ে আশংকাবোধ করলেন, তাঁর পরে আরবের গোত্রবাদ (ইসলামী আন্দোলনের বিরাট বিপ্লবী প্রভাবের ফলেও যা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি) পুনরায় যেন মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে এবং তার ফলে ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়ে যায়। একদা তাঁর সম্ভাব্য উত্তরশূরীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ব্যাপারে বলেন ঃ "অমি তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করলে তিনি বনী

---

৩৯. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস—২৩৭৪। আততাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৪৯। ইবনুআব্দিল বার, আল-ইস্তিআব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৮৯।

৪০. হযরত নুমান ইবনে আদী (রাঃ) ছিলেন প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্যতম। হযরত ওমর (রাঃ)-এরও আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে যারা মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়া চলে যান, তাঁদের মধ্যে তিনি এবং তাঁর পিতা আদীও ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাঁকে মাইসান—এর তহসিলদার নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে যাননি। তিনি সেখানে স্ত্রীর বিরহে কিছু কবিতা রচনা করেন। এ সকল কবিতায় কেবল মদের বিষয় উল্লেখ ছিল। এতে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে পদচ্যুত করেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তাকে কোন পদ না দেয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। ইবনে আব্দুল বার, আল-ইস্তীআ'ব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৯৬। দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, মুজামুল বুলদান, ইয়াকূত হামাবী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪২—২৪৩। দারে ছাদের, বৈরুত, ১৯৫৭। অপর এক ব্যক্তি, হযরত কোদামা ইবনে মাযউন—যিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন—তিনি তাঁকে বাহরাইন-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের অন্যতম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি তাঁকে বরখাস্ত করে দণ্ড দান করেন। (আল—ইস্তীআ'ব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৩৪. ইবনে হাজার, আল—ইসাবা) ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১৯—২২০।

আবিমুয়াইত (বনী উমাইয়্যা)-কে লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। আর তারা লোকদের মধ্যে আল্লার নাফরমানী করে বেড়াবে। আল্লার কসম, আমি ওসমানকে স্থলাভিষিক্ত করলে সে তাই করবে। আর ওসমান তাই করলে তারা অবশ্যই পাপাচার করবে। এক্ষেত্রে জনগণ বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করবে।"[৪১] ওফাতকালেও এ বিষয়টি তার স্মরণ ছিল। শেষ সময়ে তিনি হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর প্রত্যেককে ডেকে বলেন ঃ "আমার পরে তোমরা খলীফা হলে স্ব-স্ব গোত্রের লোকদেরকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেবে না।[৪২] উপরন্তু ছয় সদস্যের নির্বাচনী শূরার জন্য তিনি যে হেদায়াত দিয়ে যান, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়টিও ছিল ঃ নির্বাচিত খলীফারা এ কথাটি মেনে চলবেন যে, তাঁরা আপন গোত্রের সাথে কোন ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করবেন না।[৪৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) এ ক্ষেত্রে ঈপ্সিত মানদণ্ড বজায় রাখতে সক্ষম হননি। তাঁর শাসনামলে বনী উমাইয়াকে ব্যাপকভাবে বিরাট বিরাট পদ এবং বায়তুলমাল থেকে দান-দক্ষিণা দেয়া হয়। অন্যান্য গোত্র তিক্ততার সাথে তা অনুধাবন করতে থাকে।[৪৪] তাঁর কাছে এটা ছিল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারের দাবী। তিনি বলতেন ঃ "ওমর (রাঃ) আল্লার জন্য তাঁর নিকটাত্মীয়দের বঞ্চিত করতেন.

---

৪১. ইবনে আব্দুল বার, আল-ইস্তীআ'ব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৬৭। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্, ইযালাতুল খিফা, মাকসাদে আউয়াল, পৃষ্ঠা—৩৪২, বেরিলী সংস্করণ। কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন তোলেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওপর কি ইলহাম (সূক্ষ্ম ওহী) হয়েছিল, যার ভিত্তিতে তিনি হলফ করে এমন কথা বলেছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে যা অক্ষরে অক্ষরে ঘটে গিয়েছিল? এর জবাব এই যে, দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কখনো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাকে যুক্তির আলোকে পুনর্বিন্যাস করলে ভাবীকালে ঘটিতব্য বিষয় তাঁর সামনে এমনিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যেমন ২ + ২ = ৪। ফলে ইলহাম ব্যতীতই তিনি দিব্য দৃষ্টি বলে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। আরবদের মধ্যে গোত্রবাদের বীজাণু কতো গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে, হযরত ওমর (রাঃ) তা জানতেন। তিনি এ-ও জানতেন যে, ইসলামের ২৫—৩০ বৎসরের প্রচার এখনও সে সব বীজানু সমূলে উৎপাটিত করতে পারেনি। এ কারণে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যদি তাঁর এবং হজরত অবুবকর (রাঃ)—এর নীতিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা হয়। তাঁর উত্তরসূরীরা যদি নিজ গোত্রের লোকদেরকে বড় বড় পদ দান করা শুরু করেন, তাহলে গোত্রবাদ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবে—কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। ফলে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেবে।

৪২. আত্‌তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৬৪। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৪০—৩৪৪।

৪৩. ফতহুলবারী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৯—৫০। মুহিবুদ্দীন আত্‌তাবারী, আর—রিয়াযুন নাযেরা ফী মানাকিবিল আ'শারা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭৬, হোসাইনিয়া প্রেস, মিসর, ১৩২৭ হিজরী। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১২৫, আল—মাতবাআতুল কুবরা, মিসর, ১২৮৪ হিজরী।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাঃ) তাঁর ইযালাতুল খিফায় এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মাকসাদে আউয়াল, পৃষ্ঠা—৩২৪ দ্রষ্টব্য।)

৪৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৬।

আর আমি আল্লার জন্য আমার নিকটাত্মীয়দের দান করছি।"৪৫ একবার তিনি বলেন ঃ "বায়তুলমালের ব্যাপারে আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) নিজেও অসচ্ছল অবস্থায় থাকা পসন্দ করতেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনকে সেভাবে রাখতে ভাল বাসতেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচার পসন্দ করি।" ৪৬ অবশেষে এর ফল তাই হয়েছে হযরত ওমর (রাঃ) যা আশংকা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। কেবল তিনি যে শহীদ হন তাই নয়, বরং গোত্রবাদের চাপা দেয়া স্ফুলিঙ্গ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং অবশেষে এরি অগ্নিশিখা খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

আট ঃ গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি

সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতাই ছিল এ খেলাফতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরাজির অন্যতম। খলীফারা সর্বক্ষণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকতেন। তাঁরা নিজেরা শূরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের কোন সরকারী দল ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধেও কোন দলের অস্তিত্ব ছিল না। মুক্ত পরিবেশে সকল সদস্য নিজ নিজ ঈমান এবং বিবেক অনুযায়ী মত প্রকাশ করতেন। চিন্তাশীল, উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে সকল বিষয় যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা হতো। কোন কিছুই গোপন করা হতো না। ফায়সালা হতো দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে, কারোর দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্বার্থ সংরক্ষণ বা দলাদলির ভিত্তিতে নয়। কেবল শূরার মাধ্যমেই খলীফারা জাতির সম্মুখে উপস্থিত হতেন না ; বরং দৈনিক পাঁচবার সালাতের জামায়াতে, সপ্তাহে একবার জুময়ার জামায়াতে এবং বৎসরে দু'বার ঈদের জামায়াতে ও হজ্জ-এর সম্মেলনে তাঁরা জাতির সামনে উপস্থিত হতেন। অন্যদিকে এ সব সময় জাতিও তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেতো। তাঁদের নিবাস ছিল জনগণের মধ্যেই। কোন দারোয়ান ছিল না তাঁদের গৃহে। সকল সময়ে সকলের জন্য তাঁদের দ্বার খোলা থাকতো। তাঁরা হাট-বাজারে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতেন। তাঁদের কোন দেহরক্ষী ছিল না, ছিল না কোন রক্ষী বাহিনী। এ সব সময়ে ও সুযোগে যে কোন ব্যক্তি তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে, সমালোচনা করতে ও তাঁদের নিকট থেকে হিসাব চাইতে পারতো। তাঁদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করার স্বাধীনতা ছিল সকলেরই। এ স্বাধীনতা ব্যবহারের তাঁরা কেবল অনুমতিই দিতেন না, বরং এ জন্য লোকদেরকে উৎসাহিতও করতেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের প্রথম ভাষণেই প্রকাশ্যে বলে দিয়েছিলেন, আমি সোজা পথে চললে আমার সাহায্য করো, বাঁকা পথে চললে আমাকে সোজা করে দেবে। একদা হযরত ওমর (রাঃ) জুমআর খোতবায় মতপ্রকাশ করেন যে, কোন ব্যক্তিকে যেন বিবাহে চারশ' দেরহামের বেশী মোহর ধার্যের অনুমতি না দেয়া হয়। জনৈকা মহিলা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলেন, আপনার এমন নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকার নেই। কুরআন স্তুপিকৃত সম্পদ (কেনতার) মোহর হিসাবে দান করার অনুমতি দিচ্ছে। আপনি কে তার সীমা নির্ধারণকারী? হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁর মত প্রত্যাহার

---

৪৫. আত্তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৯১।

৪৬. কান্যুল ওম্মাল, ৫মখণ্ড, হাদীস—২৩২৪। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪

করেন।[৪৭] আর একবার হযরত সালমান ফারসী প্রকাশ্য মজলিসে তাঁর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন—'আমাদের সকলের ভাগে এক একখানা চাদর পড়েছে। আপনি দু'খানা চাদর কোথায় পেলেন?' হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)–এর সাক্ষ্য পেশ করলেন যে, দ্বিতীয় চাদরখানা তিনি পিতাকে ধার দিয়েছেন।[৪৮] একদা তিনি মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি যদি কোন ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে? হযরত বিশ্‌র (রাঃ) ইবনে সা'দ বললেন, এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মতো সোজা করে দেবো হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ।'[৪৯] হযরত ওসমান (রাঃ) সবচেয়ে বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি কখনো জোরপূর্বক কারো মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। বরং সব সময় অভিযোগ এবং সমালোচনার জবাবে প্রকাশ্যে নিজের সাফাই পেশ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর খেলাফত কালে খারেজীদের অত্যন্ত কটু উক্তিকেও শান্ত মনে বরদাশত করেছেন। একদা পাঁচজন খারেজীকে গ্রেফতার করে তাঁর সামনে হাযির করা হলো। এরা সকলেই প্রকাশ্যে তাঁকে গালি দিচ্ছিলো। তাদের একজন প্রকাশ্যেই বলছিল–আল্লার কসম আমি আলীকে হত্যা করবো। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এদের সকলকেই ছেড়ে দেন এবং নিজের লোকদেরকে বলেন, তোমরা ইচ্ছে করলে তাদের গাল–মন্দের জবাবে গালমন্দ দিতে পারো। কিন্তু কার্যত কোন বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিছক মৌখিক বিরোধিতা এমন কোন অপরাধ নয়, যার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে।[৫০]

ওপরে আমরা খেলাফতে রাশেদার যে অধ্যায়ের আলোচনা করেছি, তা ছিল আলোর মীনার। পরবর্তীকালে ফোকাহা–মোহাদ্দেসীন এবং সাধারণ দ্বীনদার মুসলমান সে আলোর মীনারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁরা এ মীনারকেই আদর্শ মনে করে আসছেন।

---

৪৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর, আবু ইয়ালা ও ইবনুল মুনযির, এর উদ্ধৃতিতে, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৬৭।

৪৮. মুহিবুদ্দীন আত—তাবারী, আররিয়াযুন নাযেরা ফী মানাকিবিল আশারা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৬। মিসরীয় সংস্করণ। ইবনুল জাওযী, সীরাতে ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃষ্ঠা—১২৭।

৪৯. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস—২৪১৪।

৫০. সুরুখসী, আল–মাবসূত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৫। সাআদাত প্রেস, মিসর, ১৩২৪ হিজরী।

চতুর্থ অধ্যায়

খেলাফতে রাশেদা থেকে রাজতন্ত্র পর্যন্ত

খেলাফতে রাশেদা থেকে রাজতন্ত্র পর্যন্ত

আগের অধ্যায়ে খেলাফতে রাশেদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত খেলাফতে রাশেদা কেবল একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ছিল না, বরং তা ছিল নবুয়াতের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল একটি ব্যবস্থা অর্থাৎ দেশের শাসন-শৃংখলা বজায় রাখা, শান্তি স্থাপন ও সীমান্ত রক্ষা করাই কেবল তার দায়িত্ব ছিল না ; বরং তা মুসলমানদের সামাজিক জীবনে শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং পথ-প্রদর্শকের এমন সব দায়িত্ব পালন করেছে, যা নবী (সঃ) তাঁর জীবনে পালন করেছেন। দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রে সত্য-সনাতন দ্বীনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাকে তার সত্যিকার আকার-আঙ্গিক এবং প্রাণ-ধারায় সঞ্জীবিত করে পরিচালনা করা এবং বিশ্বে মুসলমানদের গোটা সামাজিক শক্তিনিচয়কে আল্লার কালেমা বুলন্দ করার কাজে নিয়োজিত করাই ছিল তার দায়িত্ব। এ কারণে তাকে কেবল খেলাফতে রাশেদা না বলে বরং এ সঙ্গে খেলাফতে মুরশেদা সত্য—পথ প্রদর্শক খেলাফত—বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত—নুবয়াতের পদাংক অনুসারী খেলফত—কথাটিতে এ উভয় বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এ ধরনের রাষ্ট্রই ইসলামের অভিপ্রেত, নিছক রাজনৈতিক শাসন-কর্তৃত্ব নয়—দ্বীনের সামান্য জ্ঞানসপন্ন কোন ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারে না।

যে সকল পর্যায় অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এ খেলাফত রাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে, এখানে আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করবো। এ পরিবর্তন মুসলমানদের রাষ্ট্রকে ইসলামের শাসন-নীতি থেকে কতটা দূরে সরিয়ে নিয়েছে, মুসলমানদের সমাজ জীবনে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, আমরা তাও আলোচনা করবো।

পরিবর্তনের সূচনা

হযরত ওমর (রাঃ) যেখান থেকে এ পরিবর্তনের আশংকা করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই এ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ওফাতের নিকটবর্তী কালে যে বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী আশংকা করতেন, তা ছিল এই যে, তাঁর স্থলাভিষিক্তরা যেন তাদের বংশ, গোত্র এবং নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর সময় থেকে তাঁর (হযরত ওমর) শাসনকাল পর্যন্ত অব্যাহত নীতির পরিবর্তন না করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর গোটা শাসনামলে হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত বনী হাশেমের অপর কোন ব্যক্তিকে কোন পদ দান করেননি। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর খেলাফত কালে নিজের বংশ-গোত্র থেকে কোন ব্যক্তিকে আদৌ কোন পদে নিয়োগ করেননি। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর দশ বৎসরের শাসনামলে বনী আদীর কেবলমাত্র একজন লোককে একটি ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত করেন এবং অবিলম্বেই তাকে সে পদ থেকে বরখাস্ত করেন এ কারণে সে সময় গোত্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। হযরত ওমর (রাঃ)-এর আশংকা ছিল, এ নীতি পরিবর্তিত হলে তা মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হবে। তাই তিনি তাঁর তিনজন সম্ভাব্য উত্তর সূরী—হযরত ওসমান, হযরত আলী এবং হযরত

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে পৃথক পৃথকভাবে ডেকে ওসিয়াত করেন—আমার পরে তোমরা খলীফা হলে তোমাদের গোত্রের লোকদেরকে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে না।[১]

কিন্তু তাঁর পরে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ধীরে ধীরে এ নীতি থেকে দূরে সরে যান। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে একের পর এক বিরাট বিরাট পদ দান করতে থাকেন। তিনি তাদেরকে এমনসব সুযোগ-সুবিধা দান করেন, যা জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে সমালোচনার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়।[২] তিনি হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) পদচ্যুত করে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী মোয়াইতকে কূফার গবর্ণর নিযুক্ত করেন। এরপরে তাঁর অপর এক বন্ধু সাঈদ ইবনে আসকে এ পদ দান করেন। হযরত আবু মূসা আশআ'রীকে (রাঃ) বসরার গবর্ণরের পদ থেকে বরখাস্ত করে তাঁর মামাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আ'মেরকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। হযরত আমর ইবনুল আসকে মিসরের গবর্ণরী থেকে সরিয়ে নিজের দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনে সা'আদ ইবনে আবিশারাহকে নিযুক্ত করেন। সাইয়্যেদেনা হযরত

---

১. তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৬৪। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা— ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪।

২ উদাহরণ স্বরূপ, তিনি আফ্রিকার গনীমাতের মালের এক—পঞ্চমাংশের সম্পূর্ণ অংশই (৫ লক্ষ দীনার) মারওয়ানকে দান করেন। এ ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর তাঁর গবেষণা বিবৃত করেছেন এ ভাবে ঃ
আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবিসারাহ আফ্রিকার গনিমাতের মালের এক—পঞ্চমাংষ মদীনায় নিয়ে আসেন এবং মারওয়ান ইবনুল হাকাম ৫ লক্ষ দীনার দিয়ে তা খরীদ করেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) তার নিকট থেকে এ মূল্য গ্রহণ করেননি। যেসব কারণে হযরত ওসমান (রাঃ)—এর সমালোচনা করা হয়, এটাও ছিল তার অন্যতম। আফ্রিকার মালে গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যতো বর্ণনা পাওয়া যায় এ বর্ণনা তন্মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ। কেউ কেউ বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) আফ্রিকার গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ আবদুল্লাহ ইবনে সা'আদকে দান করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, মারওয়ান ইবনে হাকামকে দান করেন। এ বর্ণনা থেকে এ তত্ত্ব জানা যায় যে, হযরত ওসমান (রাঃ) আফ্রিকার প্রথম যুদ্ধের গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দকে দান করেন আর দ্বিতীয় যুদ্ধ—যাতে আফ্রিকার গোটা এলাকা বিজিত হয়—তার গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ মারওয়ানকে দান করেন। –
–(আল-কামেল ফিত তারীখ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৬, মাতবাআতুত তিবআতীল মুনীরিয়্যাহ, মিসর ১৩৪৮ হিজরী)।
ইবনে সা'আদও তাবাকাত-এ ইমাম যুহরীর সনদে বর্ণনা করেন ঃ كتب لمروان خمس مصر
হযরত ওসমান (রাঃ) মিসরের গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ মারওয়ানকে লিখে দিয়েছেন—(৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪)। ইমাম যুহরীর এ বর্ণনা সম্পর্কে আপত্তি করা চলে যে, ইবনে সা'আদ এ বর্ণনাটি ওয়াকেদীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন! আর ওয়াকেদী বিশ্বাসভাজন বর্ণনাকারী নয়। কিন্তু প্রথমত, সকল মুহাদ্দিদসই ইবনে সা'আদকে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসভাজন বলে স্বীকার করেন। তাঁর সম্পর্কে স্বীকার করা হয় যে, তিনি যাচাই—বাছাই

ওমর ফারুক (রাঃ)-এর যামানায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কেবল সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন।[৩] হযরত ওসমান (রাঃ) দামেস্ক, হেমছ, ফিলিস্তিন, জর্দান এবং লেবাননের গোটা এলাকা তাঁর শাসনাধীন করে দেন। অতঃপর তাঁর চাচাত ভাই মারওয়ান ইবনুল হাকামকে তিনি তাঁর সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন, যার ফলে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এমনি করে একই বংশের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়।

কেবল সাধারণ লোকদের ওপরই নয়, বড় বড় সাহাবীদের ওপরও এসব বিষয়ের প্রতিক্রিয়া খুব একটা শুভ হয়নি ; হতেও পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালীদ ইবনে ওকবা কূফার গবর্ণরীর পরওয়ানা নিয়ে হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন ঃ "জানি না, আমার পরে তুমি বেশী জ্ঞানী হয়ে গেছ, না আমি বোকা হয়ে গেছি।" তিনি জবাব দেন ঃ আবু ইসহাক ! ক্রুদ্ধ হয়ো না। এটাতো বাদশাহী। সকালে একজন এ নিয়ে মৌজ করে, সন্ধ্যায় আর একজ.ন।" হযরত সা'আদ বলেন ঃ "বুঝতে পেরেছি, সত্যিই তোমরা একে বাদশাহী বানিয়ে ছাড়বে।" প্রায় এহেন মনোভাব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও ব্যক্ত করেন।[৪]

এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, সাইয়্যেদেনা হযরত ওসমান (রাঃ) নিজের বংশের যেসব ব্যক্তিদেরকে এসব সরকারী পদ দান করেন, তাঁরা নিজেদের উন্নত পর্যায়ের প্রশাসনিক এবং সামরিক দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তাঁদের হাতে বহু ভূখণ্ড বিজিত হয়েছে। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, যোগ্যতা কেবল এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উৎকৃষ্ট যোগ্যতার অধিকারী আরও অনেকেই

করে রেওয়ায়াত গ্রহণ করতেন। এ কারণে তাঁর কিতাব 'তাবাকাত' ইসলামের ইতিহাসের একান্ত নির্ভরযোগ্য উৎস বলে স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, স্বয়ং ওয়াকেদী সম্পর্কেও জ্ঞানীরা এ কথা জানেন যে আহকাম এবং সুনান সম্পর্কে তাঁর হাদীসকে রদ করা হয়েছে। বাকি থাকে ইতিহাস এবং বিশেষ করে মাগাযী এবং সিয়ার অধ্যায়। এ ব্যাপারে কে ওয়াকেদীর বর্ণনা গ্রহণ করেননি? ইতিহাসের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি যদি বর্ণনার প্রমাণের জন্য হুবহু এমনসব শর্ত আরোপ করে শরীয়াতের বিধানের ক্ষেত্রে মুদহাদ্দিদসগণ যা আরোপ করেছেন, তাহলে ইসলামের ইতিহাসের শতকরা ৯০ ভাগ বরং তার চেয়েও বেশী অংশকে বাদ দিতে হবে। —(এখানে উল্লেখ্য যে, ইবনে খালদুন—কেউ কেউ যাঁকে অন্যদের চেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন—তিনি ইবনে আসীর এবং ইবনে সা'দের এ বর্ণনা সমর্থন করেছেন। দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট পৃষ্ঠা—১৩৯—১৪০)।

৩. হাফেয ইবনে কাসীর বলেন ঃ

والصواب ان الذى جمع لمعاوية الشام كلها عثمان بن عفان واما عمر فانه انما ولاه بعض اعمالها ـ

"সত্য কথা এই যে, হযরত ওসমান (রাঃ) সিরিয়ার গোটা এলাকা হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) গবর্ণরীতে সংযোজন করেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কেবল সিরিয়ার অংশবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।"—আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৪

৪. ইবনে আবদুল বার আল—এস্তীআব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬০৪।

বর্তমান ছিলেন। তাঁরা ইতিপূর্বে এদের চেয়েও উত্তম খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। খোরাসান থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত গোটা এলাকা একই বংশের গবর্ণরদের অধীনে আনা এবং কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটেও একই বংশেরই লোক নিয়োগ করার জন্য নিছক যোগ্যতাই একমাত্র ভিত্তি হতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রধান যে বংশের হবেন, রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে সে বংশের লোকদের নিয়োগ করা প্রথমত এমনিতেই আপত্তিকর। কিন্তু এ ছাড়াও আরো এমন কিছু কার্যকারণ ছিল, যার ফলে পরিস্থিতিতে আরও জটিলতা দেখা দেয় ঃ

প্রথমত এ খান্দানের যেসব লোক হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন 'তোলাকা'। তোলাকা মানে হচ্ছে, মক্কার এমন এক বংশ, যারা শেষ পর্যন্ত নবী (সঃ) এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরোধী ছিল । মক্কা বিজয়ের পর হুযুর (সঃ) তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ), ওয়ালীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) এবং মারওয়ান ইবনুল হাকাম এ ক্ষমাপ্রাপ্ত বংশের লোক ছিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে সা'আদ ইবনে আবি সারাহ তো মুসলমান হওয়ার পরে মুর্তাদ হয়ে যান। মক্কা বিজয়ের পর যেসব ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এরা খানায়ে কা'বার গেলাফ জড়িয়ে ধরে থাকলেও এদেরকে হত্যা করে দাও, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। হযরত ওসমান (রাঃ) তাকে নিয়ে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত হন এবং তিনি নিছক হযরত ওসমানের মর্যাদার খাতিরে তাকে ক্ষমা করে দেন। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সারির মুসলমানগণ, ইসলামের বিজয়ের জন্য যাঁরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, যাদের ত্যাগ-কুরবানীর ফলে আল্লার দ্বীন বিজয়ী হয়েছে, তাদেরকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে এরা উম্মাতের নেতা হবে—স্বভাবত এটা কেউ পসন্দ করতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য এরা উপযুক্তও ছিলেন না। কারণ, তারা ঈমান অবশ্য এনেছিলেন, কিন্তু নবী করীম (সঃ)-এর সান্নিধ্য ও প্রশিক্ষণ দ্বারা এতটুকু উপকৃত হওয়ার তাদের সুযোগ হয়নি, যাতে তাদের মন-মানসিকতা এবং নীতি-নৈতিকতার আমূল পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। তারা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, এবং বিজেতা হতে পারেন। বাস্তবে তারা তাই প্রমাণিত হয়েছেন। কিন্তু ইসলাম তো নিছক রাজ্য জয় আর দেশ শাসনের জন্যই আসেনি। ইসলাম প্রথমত এবং মূলত মঙ্গল-কল্যাণের একটি ব্যাপক আহ্বান বিশেষ। এর নেতৃত্বের জন্য প্রশাসনিক এবং সামরিক যোগ্যতার চেয়ে মানসিক এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বেশী। আর এ বিবেচনায় এদের স্থান ছিল সাহাবা-তাবেঈনদের প্রথম সারিতে নয়, বরং পেছনের সারিতে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ মারওয়ান ইবনে হাকামের অবস্থাটাই লক্ষণীয়। তাঁর পিতা হাকাম ইবনে আবিল আ'স হযরত ওসমান (রাঃ)-এর চাচা ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন এবং মদীনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কোন কোন আচরণের কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং তায়েফে বসবাসের নির্দেশ দেন। ইবনে আবদুল বার 'আল এস্তীআব'-এ এর অন্যতম কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বড় বড় সাহাবীদের সাথে একান্তে যেসব পরামর্শ করতেন, তিনি কোন না কোন প্রকারে তা সংগ্রহ করে ফাঁস করে দিতেন। দ্বিতীয় কারণ তিনি এই বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভান ধরতেন ; এমনকি একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে

এমনটি করতে দেখে ফেলেন।[৫] যাই হোক, কোন মারাত্মক অপরাধের কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে মদীনা ত্যাগের নির্দেশ দেন। মারওয়ানের বয়স তখন ৭–৮ বছর। তিনিও পিতার সঙ্গে তায়েফে বসবাস করতে থাকেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা হলে তাঁর কাছে তাঁকে ফিরিয়ে আনার অনুমতি চাওয়া হলে তিনি অস্বীকার করেন। হযরত ওমর (রাঃ)–এর সময়েও তাঁকে মদীনা আসার অনুমতি দেয়া হয়নি। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে তাঁকে ডেকে আনেন এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এর কারণ এই বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট তার জন্য সুপারিশ করেছিলাম, তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেবেন। এমনি করে পিতা–পুত্র উভয়ে তায়েফ থেকে মদীনা চলে আসেন।[৬] মারওয়ানের এ পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, তাঁর সেক্রেটারী পদে নিয়োগকে লোকেরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। হুযুর (সঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)–এর সুপারিশ গ্রহণ করে তাঁকে ফিরিয়ে আনার ওয়াদা করেছিলেন—জনগণ হযরত ওসমান (রাঃ)–এর কথায় আস্থা স্থাপন করে এটা মেনে নিয়েছিল। তাই তাঁকে মদীনায় ডেকে আনাকে তারা আপত্তিকর মনে করেনি। কিন্তু বড় বড় সাহাবীকে বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর এ বিরাগভাজন ব্যক্তির পুত্রটিকেই সেক্রেটারী করার ব্যাপারটি মেনে নেয়া তাদের জন্য বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে তার বিরাগভাজন পিতা যখন জীবিত এবং পুত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যে তার প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনাও ছিল।[৭]

তৃতীয়ত, তাদের কারো কারো চরিত্র এমন ছিল যে, সে সময়ের পবিত্রতর ইসলামী সমাজে তাদের মতো লোকদেরকে উচ্চপদে নিয়োগ করা কোন শুভ প্রভাব প্রতিফলিত করতে পারতো না। উদাহরণস্বরূপ ওয়ালীদ ইবনে ওকবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনিও ছিলেন মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বনীল মুস্তালিকের সদকা উসুল করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তাদের এলাকায় পৌঁছে কোন কারণে ভীত হয়ে ফিরে আসেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ না করেই তিনি মদীনায় ফিরে এসে উল্টো রিপোর্ট দেন যে, বনীল মুস্তালিক যাকাত দানে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের বিরুদ্ধে এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। এক বিরাট অঘটন ঘটার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কবীলার সর্দাররা এ সম্পর্কে যথাসময় অবহিত হন। তাঁরা মদীনায় হাযির হয়ে আরয করেন ঃ ইনি তো আমাদের নিকটই আসেননি। আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম, কেউ আমাদের নিকট এসে যাকাত উসুল করে নিয়ে যাবে। এ উপলক্ষে কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يا يها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا

৫. আল—এস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১১৮—১১৯, ২৬৩

৬. ইবনে হাজার ; আল—এসাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৪৪, ৩৪৫ ; আর রিয়াযুন নাযেরাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৪৩।

৭. প্রকাশ থাকে যে, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ) –এর শেষ সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হিজরী ৩২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

—ঈমানদাররা। কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসে কোন খবর দিলে তোমরা অনুসন্ধান করো। তোমরা অজানা অবস্থায় কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পরে নিজেদের কর্মকান্ডের জন্য অনুতাপ করবে—এমন যেন না হয়। (আল-হুজুরাত—৬)।[৮]

এ ঘটনার কয়েক বছর পর হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) তাঁকে পুনরায় খেদমতের সুযোগ দান করেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর শেষ সময়ে তাকে আল-জাযীরার আরব এলাকায় — যেখনে বনী তগলব বাস করতো—আমেল (কালেক্টর) নিযুক্ত করা হয়।[৯] ২৫ হিজরীতে এ ক্ষুদ্র পদ থেকে তুলে নিয়ে হযরত ওসমান (রাঃ) তাকে হযরত সা'দ ইবনে আবিওক্কাসের স্থলে কূফার মতো বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গবর্ণর করেন। সেখানে এ রহস্য ফাঁস হয়ে যায় যে, তিনি শরাব পানে অভ্যস্ত। এমন কি একদিন তিনি ফজরের সালাত ৪ রাকআত আদায় করান অতঃপর মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন ঃ আরো আদায় করবো ?[১০] এ ঘটনা সম্পর্কিত অভিযোগ মদীনায়

---

৮. তাফসীরকাররা সাধারণত এ ঘটনাকেই আয়াতের শানে নুযুল হিসাবে বর্ণনা করেন। তাফসীরে ইবনে কাসীর দ্রষ্টব্য। ইবনে আবদুল বার্ বলেন ঃ

ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما

علمت أن قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في

الوليد بن عقبة (الاستيعاب ج ٢ ص ٦٣)

—আয়াতটি ওয়ালীদ ইবনে ওকবা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে—এ ব্যাপারে জ্ঞানীদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। ইবনে তাইমিয়াও স্বীকার করেন যে, এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (মিনহাজুস সুন্নাতিন নববীয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭৬ আমীরিয়্যা প্রেস, মিসর ১৩২২ হিজরী)।

৯. তাহযিবুত তাহযীব, ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৪৪ ; ওমদাতুল কারী, ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০৩ ; ইদারাতুত তিবাআতিল মুনীরিয়্যাহ, মিসর।

১০. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা—১৫৫ ; আল-ইস্তীআব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬০৪ ; ইবনে আবদুল বার বলেন যে, নেসাগ্রস্ত অবস্থায় ওয়ালীদের সালাত আদায় করানো অতঃপর আরও আদায় করবো কি ? জিজ্ঞেস করা প্রসিদ্ধ। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা হাদীসবেত্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

পৌঁছে এবং জনগণের মধ্যে এর ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। অবশেষে হযরত মেস্ওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ হযরত ওসমান (রাঃ)– এর ভাগ্নে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খেয়ারকে বলেন ঃ তুমি গিয়ে তোমার মামার সাথে কথা বলো, তাঁকে বলো যে, তাঁর ভাই ওয়ালীদ ইবনে ওকবার ব্যাপারে লোকেরা তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক আপত্তি তুলেছে। তিনি এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরয করেন যে, ওয়ালীদের ওপর 'হদ' (শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী দণ্ড দান) জারী করা আপনার জন্য যরুরী—এ আবেদন জানালে হযরত ওসমান (রাঃ) ওয়াদা করেন যে, এ ব্যাপারে আমরা হক অনুযায়ী ফায়সালা করবো, ইনশাআল্লাহ। তদনুযায়ী সাহাবায়েকেরামের প্রকাশ্য সমাবেশে ওয়ালীদের বিরুদ্ধে মামালা দায়ের করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)–এর নিজের আযাদকৃত দাস হুরমান সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়ালীদ মদ্য পান করেছিলেন। অপর এক সাক্ষী সা'ব ইবনে জুসামা (বা জুসমা ইবনে সা'ব) সাক্ষ্য দেন যে, ওয়ালীদ তাঁর সামনে মদ–বমি করেছিল। (ইবনে হাজারের বর্ণনা অনুযায়ী এ ছাড়াও আরও ৪ জন সাক্ষী—আবু যয়নাব, আবু মুআররা, জুন্দুব ইবনে যোহাইর আল–আযদী এবং সা'দ ইবনে মালেক আল–আশআরীকে পেশ করা হয়। তারাও অপরাধের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন)। তখন তার ওপর 'হদ' জারী করার জন্য হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)–কে নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে একাজে নিযুক্ত করেন এবং তিনি ওয়ালীদকে ৪০টি বেত্রাঘাত করেন।[১১]

এসব কারণে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর এ নীতি লোকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। খলীফার আপন বংশের লোকদেরকে একের পর এক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা এমনিতেই ছিল যথেষ্ট আপত্তির কারণ। এর পরও তারা যখন দেখতে পেলো যে, এদেরকেই সামনে টেনে আনা হচ্ছে, তখন তাদের অস্থিরতা–অসন্তুষ্টি আরও বেড়ে গেল। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় এমন ছিল, যা সুদূরপ্রসারী এবং মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

---

১১. বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, বাবো মানাকেবে ওসমান ইবনে আফফান, ও বাবো হিজরাতিল হাবশা ; মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ বাবো হাদ্দিল খাম্‌র ; আবুদাউদ, কিতাবুল হুদুদ, বাবো হাদ্দিল খাম্‌র। এ সব হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফকীহ ও মুহাদ্দেসগণ যা কিছু লিখেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ
হাফেয ইবনে হাজার ফতহুলবারী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ লোকেরা যে কারণে ওয়লীদের ব্যাপারে ব্যাপক আপত্তি করছিল, তা ছিল এই যে, হযরত ওসমান (রাঃ) তার ওপর 'হদ' কায়েম করছিলেন না। দ্বিতীয় কারণ এ ছিল যে, হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে ওয়ালীদকে নিয়োগ করা লোকেরা পছন্দ করতো না। কারণ, হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ছিলেন আশারা–ই–মোবাশশারা এবং শূরার অন্যতম সদস্য। জ্ঞান–মাহাত্ম, দ্বীনদারী এবং প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের এমন সব গুণাবলীর সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল, যার কোন একটি গুণও ওয়ালীদ ইবনে ওকবার মধ্যে ছিল না........ হযরত ওসমান (রাঃ) ওয়ালীদকে এ জন্য কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন যে, তাঁর নিকট তার যোগ্যতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং তিনি আত্মীয়তার হকও আদায় করতে চেয়েছিলেন। অতঃপর তার

প্রথমটি হচ্ছে, হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–কে ক্রমাগত দীর্ঘদিন ধরে একই প্রদেশের গবর্ণর পদে বহাল রাখেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)–এর সময়ে ৪ বছর ধরে দামেশকের শাসনকর্তার পদে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) আইলা থেকে রোম সীমান্ত পর্যন্ত এবং আল–জাযিরা থেকে উত্তর মহাসাগর পর্যন্ত গোটা এলাকা তার আওতাধীন করে গোটা শাসনকালে

চরিত্রের ত্রুটি তাঁর কাছে প্রকাশ পেলে তিনি তাকে পদচ্যুত করেন। তার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষী দিচ্ছিল, তাদের অবস্থা ভালভাবে জানার জন্য তিনি তার শাস্তি বিধানে বিলম্ব করেন। অতঃপর প্রকৃত পরিস্থিতি জানার পর তিনি তার ওপর 'হদ' জারী করার নির্দেশ দান করেন। (ফতহুল বারী, কিতাবুল মানাকেব বাবো মানাকেবে ওসমান)।

অন্যত্র ইবনে হাজার লিখেন ঃ মুসলিমের রেওয়াতের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ আদ–দানাজ যইফ ছিলেন—এ কারণে তাহাবী মুসলিমের বর্ণনাকে দুর্বল প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু বায়হাকী তাঁর এ মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে লিখেন যে, হাদীসটি সহীহ্-বিশুদ্ধ ; মাসানীদ এবং সুনান গ্রন্থে হাদীসটি গৃহীত হয়েছে। এ বর্ণনা সম্পর্কে তিরমিযী ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লখ করেন। মুসলিমও তাকে সহীহ বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেন। ইবনে আবদুল বার বলেন এ হাদীস এ অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য.......আবুযুরআ এবং নাসায়ী আবদুল্লাহ আদ–দানাজকে বিশ্বস্ত–নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেন। (ফতহুল বারী, কিতাবুল হুদুদ, বাবুয যারবি বিল জারীদ ওয়ান নেয়াল)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেন ঃ লোকেরা ওয়ালীদের ব্যাপারে তার একটি আচরণের জন্য অধিক আপত্তি করছিল, অর্থাৎ নেসাগ্রস্থ অবস্থায় ফজরের সালাত ৪ রাকআত আদায় করে পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করে, আরো আদায় করবো? এ কারণে আপত্তি উঠেছিল যে, হযরত ওসমান (রাঃ)–এর নিকট এ সংবাদ পৌছা সত্ত্বেও তিনি তার ওপর 'হদ' জারী করেননি। উপরন্তু হযরত সাআ'দ ইবনে আবি ওক্কাসকে পদচ্যুত করে ওয়ালীদকে নিযুক্ত করাও তারা অপসন্দ করতো।—(ওমদাতুল কারী, কিতাবু মানাকেবে ওসমান)।

ইমাম নববী লিখেন ঃ মুসলিমের এ হাদীস ইমাম মালেক এবং তাঁর সমমনা ফকীহদের এ মতের প্রমাণ যে, যে ব্যক্তি মদ–বমি করে, তার ওপর মদ পানের 'হদ' জারী করা হবে।....এ ব্যাপারে ইমাম মালেকের দলীল অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ সাহাবাগণ সর্ব সম্মতিক্রমে ওয়ালীদ ইবনে ওকবাকে বেত্রাঘাতের ফায়সালা করেছিলেন। (মুসলিমের ভাষ্য,কিতাবুল হুদুদ বাবো হদ্দিল খাম্‌র)।

ইবনে কোদামা বলেন ঃ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী , একজন সাক্ষী যখন এ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ওয়ালীদকে মদ–বমি করতে দেখেছেন, তখন হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, মদ পান না করে সে কি করে মদ–বমি করতে পারে। এ কারণে তিনি হযরত আলী (রাঃ)–কে তার ওপর হদ জারী করার নির্দেশ দেন। আর যেহেতু এ ফায়সালা হয়েছিল নেতৃস্থানীয়, জ্ঞানী ও আলেম সাহাবীদের উপস্থিতিতে, তাই এর ওপর 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। (আল–মুগনী ওয়াশ শরহুল কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৩২, মানার প্রেস, মিসর, ১৩৪৮ হিজরী)।

(১২ বছর) তাঁকে সে প্রদেশেই বহাল রাখেন।[১২] শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রাঃ)-কে এর পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। এ শাম প্রদেশটি তৎকালীন ইসলামী সাম্রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এলাকা ছিল। এর এক দিকে ছিল সকল প্রাচ্য প্রদেশ, আর অপর দিকে ছিল সকল পাশ্চাত্য প্রদেশ। মধ্যখানে এ দেশটি এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে, এর শাসনকর্তা কেন্দ্র থেকে বিমুখ হলে প্রাচ্য প্রদেশসমূহকে পাশ্চাত্য প্রদেশগুলি থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারতেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এ প্রদেশের শাসনকার্যে দীর্ঘকাল নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সেখানে ভালভাবে আসন গেড়ে বসেছিলেন। তিনি কেন্দ্রের আওতায় ছিলেন না, বরং কেন্দ্র ছিল তাঁর দয়া-অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এর চেয়েও মারাত্মক গোলযোগপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল, তা ছিল খলিফার সেক্রেটারীর গুরুত্বপূর্ণ পদে মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিযুক্তি। ইনি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কোমল প্রকৃতি এবং আস্থার সুযোগে এমন অনেক কাজ করে বসেন, যার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ওপর বর্তায়। অথচ এ সব কাজের জন্য তাঁর অনুমতি-অবগতির কোন তোয়াক্কাই করা হতো না । উপরন্তু ইনি হযরত ওসমান (রাঃ) এবং বড় বড় সাহাবীদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরাবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালাতে থাকেন,যাতে খলিফা তাঁর পুরাতন বন্ধুদের স্থলে তাঁকে বেশী শুভাকাংখী এবং সমর্থক জ্ঞান করেন।[১৩] কেবল তাই নয়, তিনি একাধিকবার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সমাবেশে এমন সব হুমকিপূর্ণ ভাষণ দান করেন, তোলাকাদের মুখ থেকে যা শুনে সহ্য করে যাওয়া প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের পক্ষে ছিল নিতান্ত কষ্টকর। এ কারণে অন্যরা তো দূরের কথা, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত নায়লাও এ মত পোষণ করতেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জন্য সংকট সৃষ্টির বিরাট দায়িত্ব মারওয়ানের ওপর বর্তায়, এমনকি একদা তিনি

অতঃপর কেউ যদি বলে যে, যেসব ব্যক্তি ওয়ালীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করেছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহলে সে ব্যক্তি কেবল হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে নয়, বরং সাহাবাদের বিরাট দলের বিরুদ্ধেই এই দোষারোপ করে যে, তাঁরা বিশ্বাসের অযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে একজন মুসলমানকে শাস্তি দান করেন। জনৈক ব্যক্তি দাবী করে বসেছেন যে, হযরত হাসান (রাঃ) এ ফায়সালা সম্পর্কে নারায ছিলেন। কিন্তু ইমাম নববী মুসলিম-এর ভাষ্যে এ হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে এ মিথ্যার জারীজুরী ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, হযরত হাসান(রাঃ)-এর ক্রোধ ওয়ালীদের ওপর ছিল, তার বিরুদ্ধে ফায়সালাকারীদের প্রতি নয়।

১২. তাবাকাতে ইবনে সাআ'দ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪০৬; আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৩। বর্তমানে এ এলাকায় সিরিয়া, লেবানন, জর্দান এবং ইসরাইল ৪টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। এ ৪টি রাষ্ট্রের মোট আয়তন আজও প্রায় তাই, যা আমীর মুআবিয়ার গবর্ণর কালে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে এ এলাকায় ৪ জন গবর্ণর নিয়োজিত ছিলেন। হযরত মুআবিয়া ছিলেন তাদের অন্যতম। (করাচীর ইবনে তাইমিয়া একাডেমি প্রকাশিত ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রণীত ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া, পৃষ্ঠা— ৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য)।

১৩. তাবাকাতে ইবনে সাআ'দ, ৫ম খণ্ড, ৩৬পৃষ্ঠা ; আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

স্বামীকে স্পষ্ট বলে দেন—আপনি মারওয়ানের কথা মতো চললে সে আপনাকে হত্যা করিয়ে ছাড়বে। এ ব্যক্তিটির মনে আল্লার কোন মর্যাদা নেই, নেই কোন ভয়-ভীতি ও ভালবাসা।[১৪]

দ্বিতীয় পর্যায়

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নীতির এ দিকটি নিঃসন্দেহে ভুল ছিল। আর ভুল কাজ ভুলই—তা যে কেউ করুক না কেন। ভাষার মারপ্যাচে তাকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ইনসাফের দাবী নয় এবং কোন সাহাবীর ভুলকে ভুল বলে স্বীকার না করা দ্বীনেরও দাবী হতে পারে না।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, এ একটি দিক বাদে অন্য সব দিক থেকে তাঁর চরিত্র খলীফা হিসাবে একটা আদর্শ চরিত্র ছিল, যার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার কোন অবকাশই নেই। উপরন্তু তাঁর খেলাফত কালে সামগ্রীকভাবে সুকৃতি এত প্রবল ছিল এবং তাঁর শাসনামলে ইসলামের বিজয়ের এত বড় কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল যে, এ বিশেষ দিকটির ব্যাপারে জনগণ আশ্বস্ত না হওয়া সত্ত্বেও গোটা সাম্রাজ্যের কোথাও সাধারণ মুসলমানরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধারণাও মনের কোণে স্থান দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। একবার বসরায় তাঁর গবর্ণর সাঈদ ইবনুল আস-এর কর্মধারায় অসন্তুষ্ট হয়ে কিছু লোক বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও জনগণ তাতে সাড়া দেয়নি। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) জনগণকে বায়আত নবায়নের জন্য আহ্বান জানালে বিদ্রোহের পতাকাবাহীরা ছাড়া সকলেই ছুটে আসে।[১৫] এ কারণে যে ক্ষুদ্র দলটি তাঁর বিরুদ্ধে গোলযোগের জন্য এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, তারা ব্যাপক বিদ্রোহের আহ্বান জানাবার পরিবর্তে ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করে।

এ আন্দোলনের পতাকাবাহীদের সম্পর্ক ছিল মিসর, কুফা এবং বসরার সাথে। তারা পারস্পরিক পত্র বিনিময় করে অকস্মাৎ মদীনা আক্রমণের জন্য গোপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের এক বিরাট ফিরিস্তি প্রণয়ন করে, যার অধিকাংশই ছিল ভিত্তিহীন বা এমন দুর্বল অভিযোগ সম্বলিত,যার যুক্তিপূর্ণ জবাব দেয়া যায় এবং পরে তা দেয়াও হয়েছে। এদের সংখ্যা দু'হাজারের বেশী ছিল না। পাস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী তারা মিসর, কূফা এবং বসরা থেকে একযোগে মদীনা পৌছে। তারা কোন অঞ্চলেরই প্রতিনিধি ছিল না, বরং চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের একটা দল গঠন করেছিল। মদীনার নিকটে পৌছে তারা হযরত আলী (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ)-কে নিজেদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু বুযুর্গত্রয় তাদেরকে হাঁকিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) তাদের প্রত্যেকটি অভিযোগের জবাব দিয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ভূমিকা সুস্পষ্ট করেন। মদীনার মোহাজের ও আনসারগণ—যারা তদানীন্তন ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় মৌল প্রাণশক্তি রূপে চিহ্নিত ছিল—তাদের সহায়ক হতে প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু তারা নিজেদের হটকারিতায় অটল থাকে এবং অবশেষে তারা মদীনায় প্রবেশ করে

---

১৪. তাবারী, ৩য় খণ্ড, ২৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা ; আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খণ্ড, ১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা।

১৫. তাবাকাতে ইবনে সাআ'দ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩২-৩৩ ; তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৭২।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর গৃহ অবরোধ করে। তাদের দাবী ছিল, হযরত ওসমান (রাঃ)-কে খেলাফত ত্যাগ করতে হবে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জবাব ছিল, আমি তোমাদের যে কোন সঠিক এবং বৈধ অভিযোগ শুনতে প্রস্তুত, কিন্তু তোমাদের কথা মতো পদত্যাগে প্রস্তুত নই।[১৬] এরপর তারা ৪০ দিন ধরে গোলযোগ চালাতে থাকে। এ গোলযোগ চলাকালে তাদের দ্বারা এমনসব কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, যা মদীনাতুর রাসূল-এ ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। এমনকি, তারা উম্মুলমু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে অপমান করে। এ অনাচারের সয়লাব ধারায় আমিও কি নিজের ইয্যাত বিকিয়ে দেবো ?—এই বলে হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনা থেকে মক্কা চলে যান। শেষ পর্যন্ত তারা মারাত্মক হাঙ্গামা সৃষ্টি করে একান্ত নির্মমভাবে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে ফেলে। তিনদিন যাবৎ তার দেহ মোবারক দাফন থেকে বঞ্চিত থাকে। তাঁকে হত্যা করার পর যালেমরা তাঁর গৃহও লুট করে।[১৭]

কেবল হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ওপরই নয়, বরং স্বয়ং ইসলাম এবং খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থার ওপর এটা ছিল তাদের বিরাট যুলুম। তাদের অভিযোগের মধ্য থেকে যদি কোনটির একটুও গুরুত্ব থেকে থাকে তাহলে তা ছিল কেবলমাত্র একটির, যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। সে অভিযোগ দূর করার জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, তারা মদীনা শরীফের মোহাজের ও আনসার এবং বিশেষ করে বড় বড় সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের মাধ্যমে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে সংশোধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতো। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) চেষ্টাও শুরু করেছিলেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ) ভুলগুলো শুধরে নেবার ওয়াদাও করেছিলেন।[১৮] উপরন্তু এসব অভিযোগ দূর না হলেও সে জন্য খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এবং তাঁর পদচ্যুতি দাবী করার শরীয়াত সম্মত কোন বৈধতা আদৌ ছিল না। কিন্তু তারা খলীফার পদচ্যুতির জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অথচ বসরা, কূফা এবং মিসরের মাত্র দুই হাযার লোক—তাও তারা নিজ নিজ এলাকার প্রতিনিধিও নয়—গোটা মুসলিম জাহানের খলীফাকে পদচ্যুতি করার অথবা তাঁর পদচ্যুতি দাবী করার কোন অধিকারই পেতে পারে না। খলীফার প্রশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার তাদের অবশ্যই ছিল। অধিকার ছিল তাদের অভিযোগ উত্থাপন করার। নিজেদের অভিযোগ দূর করার দাবী জানাবার অধিকারও তাদের ছিল। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের মূল শক্তি তৎকালীন ইসলামী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যাকে খলীফা বানিয়েছে, আর বিশ্বের সকল মুসলমান যাকে খলীফা বলে স্বীকার করে নিয়েছে, কতিপয় লোক তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রাহের ঝান্ডা উড়িয়ে কোন প্রতিনিধিত্বশীল মর্যাদা ছাড়াই নিছক নিজেদের অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁর পদচ্যুতি দাবী করবে—তাদের অভিযোগের প্রকৃতই কোন মূল্য আছে কিনা, সে প্রশ্ন বাদ দিলেও—এ অধিকার তাদের আদৌ ছিল না।[১৯]

---

১৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৬৬।

১৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য আত-তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৭৬ থেকে ৪১৮ এবং আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৮ থেকে ১৯৭ দ্রষ্টব্য।

১৮. আত-তাবারী, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা—৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮৪, ৩৮৫; আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭১, ১৭২।

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-কে এ কথাই বলেছিলেন।

কিন্তু তারা এতটুকু বাড়াবাড়ি করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং শরীয়াতের সকল সীমা লংঘন করে খলীফাকে হত্যা করে, তাঁর বাসভবন লুট করে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যে সকল কাজকে তারা অপরাধ মনে করতো, তা অপরাধ হলেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে তাকে এমন কোন অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করা যবে না, যে জন্য কোন মুসলমানের রক্ত হালাল হতে পারে। এ কথাই বলেছিলেন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে । তিনি বলেছিলেন, শরীয়াত মতে একজন লোক তো কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধের কারণে হত্যার যোগ্য হয়। আমি তো সে সব অপরাধের কোনটিই করিনি। তাহলে কি কারণে তোমরা নিজেদের জন্য আমার রক্ত হালাল করছ?[২০] কিন্তু যারা শরীয়াতের নাম নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছিল, তারা নিজেরা শরীয়াতের কোন পরওয়াই করেনি। কেবল তাঁর রক্তই নয় বরং সম্পদও নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছিল তারা।

এখানে কারো মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, মদীনাবাসীরা তাদের এ কাজে সন্তুষ্ট ছিল। আসল ঘটনা এই যে, এরা অকস্মাৎ মদীনায় প্রবেশ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিগুলো অধিকার করে শহরবাসীদেরকে নিরুপায় করে দেয়।[২১] উপরন্তু তারা হত্যার মতো মারাত্মক অপরাধ সত্যি সত্যিই করেই বসবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। মদীনাবাসীদের জন্য এটা ছিল একান্ত অপ্রত্যাসিত ঘটনা, যা আকাশ থেকে অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল। পরে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের শৈথিল্যের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল।[২২] সবচেয়ে বড় কথা এই যে, স্বয়ং হযরত ওসমান (রাঃ) এ পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিলেন। তিনি নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মদীনাতুর রাসূল-এ মুসলমানদেরকে পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি সমস্ত প্রদেশ থেকে সৈন্য বাহিনী তলব করে অবরোধ কারীদের উচিৎ শিক্ষা দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, আপনার সমর্থনে সকল আনসার লড়তে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জবাব দেন, না, যুদ্ধ করা যাবে না। তিনি হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-কে বলেন

সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ থেকে পদচ্যুতির দাবী তীব্র হয়ে উঠলে হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন—এখন আমাকে কি করতে হবে? তিনি বলেন ঃ কিছু লোক তাদের আমীরের ওপর অসন্তুষ্ট হলে তাকে পদচ্যুত করবেন—মুসলমানদের জন্য আপনি এ পথ খুলবেন না (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৩য় খন্ড,পৃষ্ঠা—৬৬) । আবার এ কথাই তিনি বলেছিলেন পদচ্যুতির দাবীদারদের জবাবদানকালে অবরোধকারীদের উদ্দেশ্য আমি কি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করেই তরবারীর জোরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছি যে, তোমরা আমাকে তরবারীর জোরে পদচ্যুত করতে চাও? ঐ পৃষ্ঠা—৬৮।

২০. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—১৭৯।

২১. ঐ, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৯৮।

২২. তাবকাতে ইবনে সায়াদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা —৭১।

যে, আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। প্রাণপনে যুদ্ধ করার জন্য ৭ শত ব্যক্তি তাঁর মহলেই উপস্থিত ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাদেরকেও নিবৃত্ত রাখেন।[২৩]

সত্য বলতে কি, অত্যন্ত নাযুক এ পরিস্থিতিতে হযরত ওসমান (রাঃ) এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, যা একজন খলীফা এবং বাদশার পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। তাঁর পরিবর্তে কোন বাদশাহ্ হলে নিজের গদি রক্ষার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনেই তিনি কুন্ঠিত হতো না। তার হাতে মদীনা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে, আনসার ও মোহাজেরদের পাইকারী ভাবে হত্যা করা হলে, রাসূলের পবিত্র স্ত্রীগণকে অপমান করা হলে এবং মসজিদে নববী ভেঙ্গে মাটির সাথে মিসিয়ে দেওয়া হলেও তিনি তার পরওয়া করতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন খলীফায়ে রাশেদ—সত্য ও ন্যায়ের পথে অভিসারী খলীফা। একজন আল্লাভীরু শাসনকর্তা—আপন গদি রক্ষার জন্য কতটুকু পাওয়া যায়, কোথায় গিয়ে তাকে থেমে যেতে হয়—একান্ত কঠিন মুহূর্তেও তিনি তৎপ্রতি লক্ষ রেখেছেন। মুসলমানের ইয্যাত-আবরু বিকিয়ে দেয়ার চেয়ে নিজের প্রাণ দানকে তিনি অতি ক্ষুদ্র কাজ বিবেচনা করেছেন। কারণ,মুসলমানের ইয্যাত-আবরু একজন মুসলমানের নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিকতর প্রিয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় পর্যায়

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহদাতের পর মদীনায় নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করে। কারণ, উম্মতের তখন কোন নেতা নেই, রাষ্ট্রের নেই কোন কর্ণধার বহিরাগত সন্ত্রাসীদের জন্যে মদীনার মোহাজের-আনসার এবং বড় বড় তাবেয়ীরা সকলেই অস্থির। রোম সীমান্ত থেকে ইয়ামান পর্যন্ত এবং আফগানিস্তান থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এ উম্মাত এবং বিশাল সম্রাজ্য নেতা শূন্য অবস্থায় কয়েক দিনও কি করে চলতে পারে। যতোশীঘ্র সম্ভব একজন খলীফা নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল আর এ নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে মদীনায়। কারণ মদীনাই হচ্ছে ইসলামের কেন্দ্র ভূমি। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও ইসলামী ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ইসলামের মূল প্রাণশক্তি যে জনতা, যাদের বায়আতে এ যাবৎ খেলাফত সংঘটিত হয়ে আসছে, তারাও মদীনায় উপস্থিত। কাজেই এ ব্যপারে কোন বিলম্ব করার অবকাশ ছিল না। মদীনার বাইরের দূর-দরায শহর বন্দরের দিকে দৃষ্টি দেবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। এক মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। উম্মাতকে সংগঠিত করার জন্য, রাষ্ট্রকে বিশৃংখলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তৎক্ষণাৎ কোন যোগ্যতর ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত করা অপরিহার্য ছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর ওফাতকালে যে ছজন সাহাবীকে উম্মাতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলে অভিহিত করে গিয়েছিলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে ৪ জন হযরত আলী (রাঃ),হযরত তালহা (রাঃ),হযরত যোবায়ের (রাঃ),হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) জীবিত ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) সকল দিক থেকে প্রথম সারিতে ছিলেন। শূরা উপলক্ষে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) উম্মাতের জনমত যাচাই করে এ ফায়সালা দেন যে, হযরত ওসমান

---

২৩. ঐ. ৭০—৭১ পৃঃ।

(রাঃ)-এর পরে যিনি উম্মাতের সবচেয়ে বেশী আস্থাভাজন ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ)।[২৪] সুতরাং জনগণ খেলাফতের জন্য তাঁর প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, এটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক। কেবল মদীনায়ই নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানে তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিই ছিলেন না, যিনি এ উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। এমনকি বর্তমান কালের প্রচলিত পন্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তিনি অবশ্যই বিপুল ভোটে জয় লাভ করতেন।[২৫] তাই তো সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবী এবং মদীনার অন্যান্য লোকেরা তাঁর নিকট গিয়ে বলেন ঃ কোন আমীর ছাড়া এ ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। জনগণের জন্য একজন ইমাম অপরিহার্য। আজ এ পদের জন্য আপনার চেয়ে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি আমরা দেখছি না। অতীতের খেদমত এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নৈকট্য কোন বিচারেই না। তিনি অস্বীকৃতি জানান। লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অবশেষে তিনি বলেন, গৃহে বসে গোপনে আমার বায়াত হতে পারে না। সাধারণ মুসলমানের সন্তুষ্টি ব্যতিত এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর মসজিদে নববীতে সাধারণ অধিবেশন বসে এবং সকল মোহাজের-আনসার তাঁর হাতে বায়াত করে। সাহাবীদের মধ্যে ১৭ জন বা ২০ জন এমনও ছিলেন, যাঁরা তাঁর হাতে বায়াত করেন নি।[২৬]

যেসব নীতির ভিত্তিতে খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব—হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফাত নিশ্চিতরূপে সে সব মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল—ওপরের বিবরণী থেকে এ কথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়। তিনি জোর করে ক্ষমতা দখল করেননি। খেলাফত লাভের জন্য তিনি সামান্যতম কোন চেষ্টা তদবীরও করেননি। জনগণ নিজেরা স্বাধীন পরামর্শক্রমে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করে। সাহাবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁর হাতে বায়াত করেন। পরে কেবলমাত্র শাম প্রদেশ ব্যতীত গোটা মুসলিম জাহান তাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করে। হযরত সাআদ ইবনে ওবাদার বায়াত না করায় যদি হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত সন্দিগ্ধ না হয়, তাহলে ১৭ জন বা ২০ জন সাহাবীর বায়আত না করায় হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত কি করে সন্দিগ্ধ সাব্যস্ত হতে পারে? উপরন্তু সে ক'জন সাহাবীর বায়আত না করা ছিল নিছক একটি নেতিবাচক কাজ ; যার ফলে খেলাফতের আইনগত পজিসনের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। তাঁর মুকাবিলায় কি এমন কোন খলীফা ছিল, যার হাতে তাঁরা প্রতি-বায়াত করেছিলেন? অথবা তাঁরা কি বলেছিলেন যে, এখন উম্মাত বা রাষ্ট্রের কোন খলীফার প্রয়োজন নেই? অথবা তাঁরা কি বলেছিলেন যে, কিছু সময়ের জন্য খেলাফতের পদ শূন্য থাকা উচিত? এর কোন একটিও যদি না থাকে, তাহলে তাঁদের নিছক বায়াত না করার এ অর্থ কেমন করে হতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ-এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যার হাতে বায়আত করেছে, মূলত তিনি বৈধ খলীফা ছিলেন না?

---

২৪. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা— ১৪৬।

২৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন, তখন হযরত আলী (রাঃ)-এর চেয়ে খেলাফতের যোগ্যতর অন্য কোন ব্যক্তি ছিল না— ঐ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা—১৩০।

২৬. আত তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৫০, ৪৫২; আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা — ২২৫,২২৬। ইবনে আবদুল বার-এর বর্ণনা মতে সিফফিন যুদ্ধে এমন ৮ শত সাহাবী হযরত

এভাবে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাহাদাতের কালে খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থায় যে মারাত্মক ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানরা তা পূরণ করার সুযোগ লাভ করেছিল এবং সুযোগ লাভ করেছিলেন হযরত আলী (রাঃ) তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করায়। কিন্তু তিনটি বিষয় এমন ছিল, যা সে ফাটল পূরণের সুযোগ দেয়নি । বরং তা ফাটলকে আরও বৃদ্ধি করে উম্মাতকে মুলুকিয়্যাতের (রাজতন্ত্র) মুখে ঠেলে দেয়ার ব্যাপারে এক ধাপ অগ্রসর হয়।

এক ঃ হযরত ওসমান (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, যারা কার্যত হত্যাকান্ডে অংশ নিয়েছিল, হত্যায় প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং তাতে সহায়তা করেছিল, এমনি করে সামগ্রিকভাবে এ মহা বিপর্যয়ের দায়িত্ব যাদের ওপর পড়ে তারা সবাই হযরত আলী (রাঃ)–কে খলীফা করার ব্যাপারে অংশ নেয়। খেলাফত কার্যে তাদের অংশ গ্রহণ এক বিরাট বিপর্যের কারণ হয়ে পড়ে। কিন্তু মদীনার সে সময়ের পরিস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য যে ব্যক্তিই চেষ্টা করবেন, তিনি এ কথা উপলব্ধি না করে পারবেন না যে, তখন খলীফা নির্বাচনের কাজ থেকে তাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যেত না। তাদের অংশ গ্রহণ সত্ত্বেও যে ফায়সালা গৃহীত হয়েছিল, তা ছিল অবশ্যি একটি সঠিক ফায়সালা। উম্মাতের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত আলী (রাঃ)–এর হস্ত সুদৃঢ় করলে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যাকারীদেরকে নিশ্চিত দমন করা সম্ভব হত এবং দুর্ভাগ্য বশত বিপর্যয়ের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল, তা সহজেই নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হত।

দুই ঃ হযরত আলী (রাঃ)–এর বায়আত থেকে কোন কোন বড় বড় সাহাবীর বিরত থাকা । কোন কোন বুযর্গ একান্ত সদুদ্দেশ্যে ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য এ কর্মপন্থা অবলম্বন করলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, যে ফেতনা থেকে তাঁরা দূরে থাকতে চেয়েছিলেন, তাদের এ কাজ তার চেয়েও বড় ফেতনার সহায়ক হয়েছে। তাঁরা ছিলেন উম্মাতের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাদের প্রত্যেকের উপর হাযার হাযার মুসলমানের আস্থা ছিল। তাঁদের বিরত থাকার ফলে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থা নব পর্যায়ে বহাল করার জন্য যে একাগ্রতার সাথে হযরত আলী (রাঃ)–এর সহযোগিতা করা উম্মতের উচিত ছিল—যা ছাড়া তিনি এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারতেন না—দুর্ভাগ্যবশত তা অর্জিত হতে পারেনি।

তিন ঃ হযরত ওসমান (রাঃ)–এর রক্তের দাবী। দু'পক্ষ থেকে দুটি দল এ দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে। এক দিকে হযরত আয়েশা এবং হযরত তালহা ও যোবায়ের এবং অপর পক্ষে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)। উভয় পক্ষের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও এ কথা না বলে উপায় নেই যে, আইনের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের পজিশনকে কিছুতেই সঠিক বলে স্বীকার করা যায় না। বলাবাহুল্য এটা জাহেলী যুগের কোন গোত্রবাদী ব্যবস্থা ছিল না। যে কোন ব্যক্তি যেভাবে খুশী নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধের দাবী নিয়ে দাঁড়াবে, আর সে দাবী পূরণ করার জন্য ইচ্ছা মতো যে কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করবে, এ ধরনের কোন ব্যবস্থা তখন ছিল না। সেখানে একটা বিধিবদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠিত

আলীর সঙ্গে ছিলেন, যারা বায়আতুর রেযওয়ানের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সঙ্গে ছিলেন—আল–এস্তীআব, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা—৪২৩।

ছিল। প্রতিটি দাবী উত্থাপন করার জন্য একটা নিয়ম এবং একটা বিধান বর্তমান ছিল। হত্যার প্রতিশোধ দাবী করার অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের ছিল, তাঁরা বেঁচে ছিলেন এবং সেখানে উপস্থিতও ছিলেন। অপরাধীদের গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ব্যাপারে সরকার সত্যিই জেনে শুনে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে অন্যরা নিশ্চয়ই সরকারের নিকট ইনসাফের দাবী জানাতে পারতেন। কিন্তু সরকার কোন ব্যক্তির দাবী অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ না করলে তিনি যে সরকারকে আদৌ কোন বৈধ সরকার বলে স্বীকারই করবেন না—কোন সরকারের কাছে ইনছাফ দাবী করার এটা কোন ধরনের পন্থা হতে পারে? শরীয়াতের কোথাও কি এর কোন নযীর আছে? হযরত আলী (রাঃ) যদি বৈধ খলীফাই না হবেন, তবে তাঁর কাছে অপরাধীদের গ্রেফতার এবং শাস্তি বিধান দাবী করার অর্থই বা কি? তিনি কি কোন গোত্রীয় সর্দার ছিলেন যিনি কোন আইনগত অধিকার ছাড়াই যাকে খুশী পাকড়াও করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দেবেন ?

এর চেয়েও বেশী বিরোধী পন্থা ছিল প্রথম পক্ষের। তারা মদীনায় গিয়ে—যেখানে খলীফা, অপরাধী এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সকলেই উপস্থিত ছিল এবং অপরাধীর বিচার ও দণ্ড বিধান সম্ভবপর ছিল—নিজেদের দাবী পেশ করার পরিবর্তে বসরার পথে গমন করেন এবং সৈন্য সমাবেশ করে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেন। তাদের এ দাবীর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এক খুনের পরিবর্তে আরো দশ হাযার খুন হওয়া এবং রাষ্ট্রের শৃংখলা বিপন্ন হওয়াই ছিল অবধারিত। শরীয়াত তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোন আইনের দৃষ্টিতেই এটাকে বৈধ কার্যক্রম হিসাবে স্বীকার করা চলে না।

দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর কর্মপন্থা ছিল এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশী আইন বিরোধী। আবু সুফিয়ান তনয় মুআবিয়া হিসাবে নয়, বরং শাম প্রদেশের গবর্ণর হিসাবে তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)–এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী উত্থাপন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেন। নিজের উদ্দেশ্যের জন্য গবর্ণরীর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তিনি। হযরত আলী (রাঃ)–এর নিকট তিনি এ দাবী উত্থাপন করেননি যে, হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাদেরকে শাস্তি দান করতে হবে। বরং তার দাবী ছিল হন্তাদেরকে তাঁর হাতে সোপর্দ করতে হবে, যাতে তিনি নিজে তাদেরকে হত্যা করতে পারেন।[২৭] এসব কিছু ইসলামী যুগের সুশৃংখল সরকারের পরিবর্তে ইসলাম পূর্ব যুগের গোত্রীয় বিশৃংখলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। প্রথমত হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীর অধিকার ছিল হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর পরিবর্তে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শরীয়াত সম্মত উত্তরাধিকারীদের। আত্মীয়তার ভিত্তিতে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর এ দাবী করার অধিকার থাকলেও তা ছিল ব্যক্তিগতভাবে, শাম–এর গবর্ণর হিসাবে নয়। হযরত ওসমান (রাঃ)–এর আত্মীয়তা ছিল আবু সুফিয়ানের পুত্র মুআবিয়ার সাথে। শাম–এর গবর্ণরী তাঁর আত্মীয়তার ভিত্তি ছিল না। ব্যক্তিগত মর্যাদায় তিনি খলীফার নিকট ফরিয়াদী হিসাবে যেতে পারতেন, দাবী করতে পারতেন অপরাধীদের গ্রেফতার করার এবং

২৭. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩, ৪ ; ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৪৮ ; আল–বেদায়া, ওয়ান নেহায়া, পৃষ্ঠা—২৫৭–২৫৮।

তাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার। যে খলীফার হাতে যথারীতি আইনানুগ উপায়ে বায়আত সম্পন্ন হয়েছে, একমাত্র তাঁর প্রশাসনাধীন প্রদেশ ছাড়া অবশিষ্ট গোটাদেশ যাঁর খেলাফত মেনে নিয়েছে,[২৮] তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করার গবর্ণর হিসাবে তাঁর কোন অধিকার ছিল না। অধিকার ছিল না নিজের প্রশাসনাধীন অঞ্চলের সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার। নিরেট প্রাচীন জাহেলিয়াতের পন্থায় এ দাবী করার অধিকারও তাঁর ছিল না যে, হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে আদালতের কার্যক্রম ছাড়াই কেসাসের দাবীদারদের হাতে সোপর্দ করা হোক, যাতে তিনি নিজেই তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন।

কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন-এ নিম্নোক্তভাবে এ বিষয়ের সঠিক শরীয়াত সম্মত মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

[হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর] জনগণকে নেতাশূন্য ছেড়ে দেয়া সম্ভব ছিল না তাই হযরত ওমর (রাঃ) শূরায় যাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁদের সামনে ইমামাত (নেতৃত্ব) পেশ করা হয়। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আলী (রাঃ) যিনি এর সবচেয়ে বেশী হকদার ও যোগ্য ছিলেন তা গ্রহণ করেন, যাতে উম্মাতকে রক্তপাত এবং নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য থেকে রক্ষা করা যায়। সে রক্তপাত এবং অনৈক্যের ফলে দ্বীন এবং মিল্লাতের অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা ছিল। তাঁর হাতে বায়আত করার পর শাম প্রদেশের জনগণ তাঁর বায়আত কবুল করার জন্য শর্ত আরোপ করে যে, প্রথমে হযরত ওসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করে তাদের নিকট থেকে কেসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করা হোক। হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে বলেন যে, আগে বায়আতে শামিল হয়ে যাও পরে অধিকার দাবী করো, তোমরা অবশ্যি তা পাবে। কিন্তু তারা বলে, 'আপনি বায়আতের অধিকারীই নন। কারণ আমরা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদেরকে সকাল-বিকাল আপনার সঙ্গে দেখছি।' এ ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)-এর মত অধিক সত্য ছিল। তাঁর উক্তি ছিল একান্ত সঠিক। কারণ তিনি তখন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করলে বিভিন্ন গোত্র তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো। ফলে যুদ্ধের একটি তৃতীয় ফ্রন্ট খুলে যেতো। তাই তিনি অপেক্ষা করছিলেন, সরকার সুদৃঢ় হোক, গোটা দেশে তাঁর বায়আত প্রতিষ্ঠিত হোক, এরপর আদালতে যথারীতি নিহত ব্যক্তির

২৮. ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণিত যে, সিপফীন যুদ্ধের পর পর্যন্ত গোটা জাযিরাতুল আরব এবং শাম-এর পূর্ব পশ্চিম উভয় দিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশ হযরত আলী (রাঃ)-এর বায়আতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত মুআবিয়ার প্রভাবাধীন হওয়ার কারণে কেবল শাম প্রদেশ তাঁর আনুগত্য বহির্ভূত ছিল। এ জন্য এ অবস্থার সত্যিকার আইনগত মর্যাদা এই ছিল না যে, মুসলিম জাহানে নৈরাজ বিরাজ করছিল, সেখানে কেউ কারো আনুগত্য করতে বাধ্য ছিল না। বরং সঠিক আইনগত অবস্থা এই ছিল যে, রাষ্ট্রে একটি বৈধ, আইনানুগ কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যমান ছিল; অন্যান্য প্রদেশসমূহ তার আনুগত্য করছিল, কেবল একটি মাত্র প্রদেশ ছিল বিদ্রোহী-(আত-তাবারী,৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬২-৪৬৩; ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৭-১৪১; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯, ২৫১)।

উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হবে, সত্য ও ন্যায়ানুযায়ী ফায়সালা করা হবে। যে অবস্থায় ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার এবং বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, সে অবস্থায় ইমামের জন্য কেসাসকে বিলম্বিত করা বৈধ এ ব্যাপারে ওলামায়ে উম্মাতের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।'

'হযরত তালহা ও যোবায়ের (রাঃ)-এর ব্যাপারও ছিল অনুরূপ। তাঁরা উভয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফত থেকে বেদখল করেননি, তাঁরা তাঁর দ্বীনের ব্যাপারেও আপত্তি জানাননি। অবশ্য তাঁদের মত ছিল, সর্বপ্রথম হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদেরকে দিয়েই সূচনা করা হোক। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তাঁর মতে অটল ছিলেন এবং তাঁর মতই সঠিক ছিল।'

সামনে অগ্রসর হয়ে কাযী সাহেব

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ج (الحجرات - ٩)

—এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'এ পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রাঃ) উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী কাজ করেছেন। যেসব বিদ্রোহী ইমামের উপর নিজেদের মত জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এমন দাবী করার অধিকার এ বিদ্রোহীদের ছিল না। যারা কেসাসের দাবী করছিল তাদের জন্য সঠিক পন্থা ছিল, হযরত আলী (রাঃ)-এর কথা মেনে নিয়ে কেসাসের দাবী আদালতে পেশ করে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা। তারা এ পন্থা অবলম্বন করলে হযরত আলী (রাঃ) যদি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করতেন, তখন তাদের দ্বিধা-সংকোচেরও কোন প্রয়োজন হতো না। সাধারণ মুসলমানরা নিজেরাই হযরত আলী (রাঃ)-কে পদচ্যুত করতো।'[২৯]

চতুর্থ পর্যায়

খেলাফতে রাশেদার মধ্যে এ তিনটি ফাটল সৃষ্টি হবার পর হযরত আলী (রাঃ) এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে কাজ শুরু করে দেন। তিনি সবেমাত্র কাজ শুরু করেছেন, দু'হাযার সন্ত্রাসবাদী তখনও মদীনায় উপস্থিত, এমন সময় হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ) অন্যান্য কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন ঃ 'হদ' (শরীয়াতের দন্ড বিধি) কায়েম করার শর্তে আমরা আপনার হাতে বায়আত করেছি। যারা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যায় শরীক ছিল, এবার আপনি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। হযরত আলী (রাঃ) জবাবে বলেন ঃ ভাইয়েরা আমার! আপনারা যতটুকু জানেন, আমিও তা অনবগত নই। কিন্তু আমি তাদেরকে কি করে পাকড়াও করবো, যারা এখন আমাদের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করে আছে, যাদের ওপর এখন আমাদের কোন প্রভাব ও প্রতিপত্তি নেই। আপনারা এখন যা করতে চান, তার কি কোথাও কোন

২৯. আহকামুল কুরআন, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭০৬-১৭০৭, মিসরীয় সংস্করণ, ১৯৫৮।

অবকাশ আছে? তাঁরা সকলেই জবাব দেয়, 'না।' অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আল্লার কসম! আপনারা যা চিন্তা করেন আমিও তাই চিন্তা করি। পরিস্থিতি একটু শান্ত হতে দিন, গণমনে স্বস্তি ফিরে আসুক। চিন্তার বিভ্রান্তি দূরিভূত হোক, অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হোক।[৩০]

অতঃপর এ বুযুর্গদ্বয় হযরত আলী (রাঃ)–এর অনুমতি নিয়ে মক্কা শরীফ চলে যান। সেখানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর সাথে সাক্ষাৎ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ)–এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কূফা ও বসরা থেকে —যেখানে হযরত তালহা ও হযরত যোবায়েরের বিপুল সংখ্যক সমর্থক ছিল—সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করা হবে। সুতরাং এ কাফেলা মক্কা থেকে বসরা রওয়ানা হয়ে যায়। বনী-উমাইয়ার সাঈদ ইবনুল আ'স এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামও কাফেলার সাথে গমন করেন। মাররুয যাহ্রান (বর্তমান ফাতেমা উপত্যকা) পৌঁছে সাঈদ ইবনুল আ'স তাঁর দলের লোকদের বললেন ঃ তোমরা যদি হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও, তাহলে এদেরকে হত্যা করো, যারা এ বাহিনীতে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে [হযরত তালহা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) ইত্যাকার বুযুর্গদের প্রতি তাদের ইঙ্গিত ছিল। কারণ, বনী–উমাইয়াদের সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, যারা হযরত ওসমান (রাঃ)–কে হত্যা করেছে, কেবল তাঁরাই তাঁর হন্তা নয়, বরং সময়ে সময়ে যারা তাঁর পলিসীর সমালোচনা করেছে, বা সন্ত্রাসকালে যারা মদীনায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু হত্যা প্রতিরোধের জন্য লড়াই করেনি, তারাও তার হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত]। মারওয়ান বললেন ঃ না, আমরা তাদেরকে [অর্থাৎ হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)–কে] পরস্পরের বিরূদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করাবো। এদের মধ্যে যে পরাজিত হবে, সে এমনিতেই খতম হয়ে যাবে। আর যে বিজয়ী হবে, সে এতটা দুর্বল হয়ে যাবে যে, আমরা অতি সহজে তাকে কাবু করে ফেলবো।[৩১] এমনি করে এসব ব্যক্তিকে নিয়ে কাফেলা বসরায় পৌঁছে এবং তারা ইরাক থেকে তাদের সমর্থকদের এক বিশাল বাহিনী একত্র করে।

অপর দিকে হযরত আলী (রাঃ)–যিনি মুআ'বিয়া (রাঃ)–কে খেলাফতের অনুগত করার জন্য শাম যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—বসরায় সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পেরে আগে এ পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে বাধ্য হন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী এবং তাঁদের প্রভাবাধিন ব্যক্তিবর্গ, যারা মুসলমানদের গৃহযুদ্ধকে স্বাভাবিকভাবেই একটা বিপর্যয় বলে মনে করতেন, এ অভিযানে তাঁর সহযোগী হতে প্রস্তুত ছিলেন না।[৩২] ফলে যে হত্যাকারীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হযরত আলী (রাঃ) সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তারা হযরত আলী (রাঃ)–এর সংগৃহীত ক্ষুদ্র বাহিনীতে ঢুকে পড়ে। এটা তাঁর জন্য দুর্নাম এবং বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

---

৩০. আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৫৮। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১০০। আল–বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃঃ ২২৭–২২৮।

৩১. তাবাকাতে ইবনে সাআ'দ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট পৃষ্ঠা—১৫৫।

৩২. আল–বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৩৩।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ)–এর সৈন্যবাহিনী বসরার অদূরে পরস্পর মুখোমুখী হলে দ্বীনের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণকামী ব্যক্তিদের এক বিরাট গ্রুপ ঈমানদারদের দু'টি দলকে সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে সমঝোতার কথাবার্তা প্রায় সম্পন্নই হয়ে এসেছিল। কিন্তু একদিকে হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যাকারীরা তারা মনে করতো, এদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেলে আমাদের রেহাই নেই ; অপর দিকে উম্মুল মুমিনীন–এর সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও ছিল, যারা উভয়কে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দুর্বল করে ফেলার আকাংখা পোষণ করছিল। তাই তারা নিয়ম বহির্ভূত পদ্ধতিতে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। অবশেষে উভয় পক্ষের কল্যাণকামীদের যুদ্ধ ঠেকাবার শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জামাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [৩৩]

জামাল যুদ্ধের সূচনাকালে হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যোবায়ের (রাঃ)–এর সাথে কথা বলার আকাংখা পোষণ করে এ মর্মে তাদের নিকট পয়গাম পাঠান তাঁরা উভয়ে হাযীর হলে হযরত আলী (রাঃ) তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকার উপদেশ দেন। ফলে হযরত যোবায়ের (রাঃ) যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে চলে যান আর হযরত তালহা (রাঃ) প্রথম সারি থেকে পেছনের সারিতে সরে যান। [৩৪] কিন্তু আমর ইবনে জারমুয নামক জনৈক যালেম হযরত যোবায়ের (রাঃ)-কে হত্যা করে এবং প্রসিদ্ধ ও একান্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে মারওয়ান ইবনুল হাকাম হযরত তালহা (রাঃ)-কে হত্যা করে। [৩৫]

যাই হোক, সিফ্‌ফীন যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে উভয় পক্ষের ১০ হাযার লোক শহীদ হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাহাদাতের পরে এটা ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম দুর্ঘটনা। এ ঘটনা উম্মাতকে স্বৈরাচারের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয়। হযরত আলী (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে যে সেনাবাহিনী যুদ্ধ করেছিল, তার বেশীর ভাগ সংগৃহীত হয়েছিল বসরা এবং কূফা থেকেই। হযরত আলী (রাঃ)–এর হাতে এ এলাকার ৫ হাযার লোক শহীদ এবং হাযার হাযার লোক আহত হওয়ার পর কি করে এ আশা করা যেতে পারে যে, শাম–এর জনগণ যে একাত্মতার সাথে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর সহযোগিতা করছিল, ঠিক একই পর্যায়ের একাত্মতার সাথে ইরাকের জনগণও হযরত

---

৩৩. আল-বেদায়া—৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৩৭-২৩৯।

৩৪. আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪১৫। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১২২-১২৩। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৪০, ২৪১, ২৪৭। আল-ইস্তীআব, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২০৭। ইবনে খালদুন, ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট পৃষ্ঠা—১৬২।

৩৫. তাবাকাতে ইবনে সাআ'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা —২২৩ ; ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা —৩৮। ইবনে হাযার, তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২০। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১২৪। ইবনে আবদুল বার, আল-ইস্তীআব পৃষ্ঠা—২০৭-২০৮। ইবনে আবদুল বার বলেন ঃ মারওয়ান হযরত তালহা (রাঃ)–এর সেনাবাহিনীতে শামিল ছিলেন, আর তিনিই হযরত তালহা (রাঃ)–কে হত্যা করেছেন—নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আল্লামা ইবনে কাসীর আল-বেদায়ায় এ বর্ণনাকেই প্রসিদ্ধ বর্ণনা বলে স্বীকার করেছেন—৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৪৭।

আলী (রাঃ)–এর সহযোগিতা করবে? সিফ্‌ফীন যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর শিবিরের ঐক্য এবং হযরত আলী (রাঃ)–এর শিবিরের অনৈক্য মৌলিকভাবে এ জামাল যুদ্ধের পরিণতি ছিল। এ যুদ্ধ সংঘটিত না হলে পরবর্তীকালের সকল বিকৃতি সত্ত্বেও স্বৈরাচারের আগমন ঠেকানো সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। বস্তুত এটাই ছিল হযরত আলী (রাঃ) এবং তালহা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ)–এর সংঘাতের পরিণতি। এ পরিণতির অপেক্ষায় ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। সে জন্যেই তিনি হযরত তালহা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ)–এর সাথী হয়ে বসরায় যান। দুঃখের বিষয়, তাঁর এ অভিপ্রায় শতকরা একশ' ভাগ পূর্ণ হয়।

হযরত আলী (রাঃ) এ যুদ্ধের ব্যাপারে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তা একজন খলীফায়ে রাশেদ এবং একজন বাদশার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তিনি প্রথমে আপন সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করেছেন, কোন পলায়নকারীর পেছনে ধাওয়া করবে না, কোন আহত ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করবে না এবং বিজয়ী হয়ে বিরোধীদের গৃহে প্রবেশ করবে না। বিজয় শেষে তিনি উভয় পক্ষের শহীদদের জানাযার সালাত আদায় করান এবং সমান মর্যাদার সাথে তাদেরকে দাফন করান। বিরোধী বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া অর্থ–সম্পদকে গণীমাতের মাল সাব্যস্ত করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বসরার জামে মসজিদে সংগৃহীত সম্পদ জড়ো করে তিনি ঘোষণা করেন ঃ যে ব্যক্তি তার নিজের মাল চিনতে পারে সে যেন তা নিয়ে যায়। লোকেরা খবর রটায় আলী (রাঃ) বসরার পুরুষদের হত্যা করতে চায়, আর চায় স্ত্রীদের দাসীতে পরিণত করতে। হযরত আলী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ এ অপপ্রচারের প্রতিবাদ করে বলেন ঃ "আমার মতো লোক থেকে এ ধরনের আশংকা করা উচিত নয় এ আচরণ তো কাফেরদের সাথে করার মতো। মুসলমানদের সাথে এহেন আচরণ করা যায় না।" বসরায় প্রবেশ করলে স্ত্রীরা গৃহের অভ্যন্তর থেকে গালমন্দ এবং নিন্দাবাদে জর্জরিত করে। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করে দেন ঃ "সাবধান । কারোর সম্ভ্রম নষ্ট করবে না, কারো গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না, কোন নারীকে উত্যক্ত করবে না, —তারা তোমাদের আমীর এবং সৎ ব্যক্তিদেরকে গালমন্দ করলেও না। এরা যখন মুশরিক ছিল, তখনও তো এদের ওপর হস্তক্ষেপ করা থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছিল। এখন তো এরা মুসলমান ; তবে কি করে এখন এদের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারি?"[৩৬] পরাজিত পক্ষের আসল পরিচালক হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন এবং পরিপূর্ণ মর্যাদার সাথে তাঁকে মদীনা প্রেরণ করেন।[৩৭] হযরত যোবায়ের (রাঃ)–এর হন্তা এনাম লাভের আশায় উপস্থিত হলে তিনি তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দান করেন, তার হাতে হযরত যোবায়ের (রাঃ)–এর তরবারী দেখে বলেন ঃ কতোবার এ তরবারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)–কে হেফাযত করেছিল।[৩৮] হযরত তালহা (রাঃ)–এর পুত্র

৩৬. আত–তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৫০৬, ৫১০, ৫৪২, ৫৪৪। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১২২, ১৩১, ১৩২। আল বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৪৪, ২৪৫। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৬৪, ১৬৫।

৩৭. আল বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৪৫, ২৪৬। আত–তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৫৪৭।

৩৮. আল বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৪৯। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১২৫। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৬২।

সাক্ষাৎ করতে এলে অত্যন্ত আদরের সাথে তাকে নিকটে বসতে দেন, তাঁকে তার সম্পত্তি ফেরত দিয়ে বলেন ঃ আমি আশা করি, আখেরাতে তোমার পিতা এবং আমার মধ্যে যে ঘটনা ঘটবে, তাকে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

—আমি তাদের অন্তরের কলুষ–কালিমা বিদূরীত করবো, আর তারা ভাইয়ের মতো একে অন্যের সম্মুখে উচ্চাসনে উপবিষ্ট হবে।[৩৯]

পঞ্চম পর্যায়

হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাহাদাতের (৩৫ হিজরীর ১৮ই জিলহজ্জ) পর হযরত নোমান ইবনে বশীর তাঁর রক্তমাখা জামা, তাঁর স্ত্রী হযরত নায়েলার কাটা আঙ্গুল দামেশকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর নিকট নিয়ে যান এবং শামবাসীদের ভাবাবেগকে নাড়া দেয়ার জন্য তিনি এগুলো প্রকাশ্য রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখেন।[৪০] হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ওসমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধ আইনানুগ পন্থায় নয়, বরং বেআইনী পন্থায় গ্রহণ করতে চান—এটা ছিল তারই প্রমাণ। অন্যথায় এটা স্পষ্ট যে, হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাহাদাতের খবরই মানুষের মনে ক্ষোভ ও দুঃখ সঞ্চারের জন্য যথেষ্ট ছিল, জামা এবং আঙ্গুলের প্রদর্শনী করে মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

এদিকে হযরত আলী (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বপ্রথম যে সমস্ত কাজ করেন, তার মধ্যে একটি ছিল ৩৬ হিজরীর মহররম মাসে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–কে শাম থেকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থানে হযরত সাহল ইবনে হানীফের নিযুক্তি। কিন্তু নবনিযুক্ত গবর্ণর সবেমাত্র 'তাবুক' পৌছেছেন, এমন সময় শাম–এর একটি পদাতিক বাহিনী তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বলে ঃ আপনি হযরত ওসমান (রাঃ)–এর পক্ষ থেকে এসে থাকলে আপনাকে খোশআমদেদ জানাই। কিন্তু অন্য কারো পক্ষ থেকে এসে থাকলে ফেরত চলে যান।[৪১] শাম প্রদেশ নতুন খলীফার আনুগত্য গ্রহণে প্রস্তুত নয় এটা ছিল তারই স্পষ্ট নোটিশ। হযরত আলী (রাঃ) অপর এক ব্যক্তিকে পত্র দিয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি সে পত্রের কোন জবাবই দেননি। বরং ৩৬ হিজরীর সফর মাসে জনৈক দূতের মারফত তাঁর নিকট একখানা খাম পাঠান। হযরত আলী (রাঃ) খাম খুলে দেখেন, ভেতরে কোন চিঠি নেই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, একি ব্যাপার? দূত জানায়, "ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমার পেছনে ৬০ হাযার লোক উন্মুখ হয়ে আছে।" হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, কার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চায়? সে জবাব দেয়, আপনার ঘাড়ের

---

৩৯. তাবাকাতে ইবনে সাআ'দ, পৃষ্ঠা—২২৪, ২২৫

৪০. ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৯৮। আল–বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২২৭। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৫২।

৪১. ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১০৩। আল বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২২৮। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৫২।

রগ থেকে।[৪২] এর স্পষ্ট অর্থ ছিল যে, শাম এর গবর্ণর কেবল আনুগত্য স্বীকার করতে চান না, তা-ই নয়, বরং আপন প্রদেশের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত করতে চান, ওসমান (রাঃ)-এর হন্তাদের কাছ থেকে নয় ; বরং তদানীন্তন খলীফার নিকট থেকে ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য।

এসব কিছুই ছিল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একাধারে ১৬/১৭ বছর ধরে এমন একটি প্রদেশের গবর্ণরের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার ফল। যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রদেশের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে শাম ইসলামী খেলাফতের একটি প্রদেশের তুলনায় অনেকাংশে তাঁর রাজত্বে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে পদচ্যুত করার ঘটনা অনেকটা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যার ফলে পাঠক মনে করে বসে যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতার লেশমাত্রই ছিল না। মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) তাঁকে বিজ্ঞতার সাথে এ কথা বুঝিয়েছিলেন যে, মুআবিয়া (রাঃ)-কে উত্যক্ত করবেন না। কিন্তু তিনি অজ্ঞতা বশত এ মত গ্রহণ করেননি, বরং মুআবিয়া (রাঃ)-কে শুধু শুধু ক্ষেপিয়ে দিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। অথচ সেসব ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস থেকে ঘটনার যে চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, তা দেখে কোন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা অনুভব না করে পারেন না যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পদচ্যুতির নির্দেশ দানে বিলম্ব করলে তা হতো বিরাট ভুল। তাঁর এহেন পদক্ষেপ থেকে শুরুতেই এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘদিন তাঁর ভূমিকা প্রচ্ছন্ন থাকলে আসলে তা প্রতারণার আচ্ছাদন বৈ আর কিছুই হতো না। তা হতো আরও মারাত্মক।

হযরত আলী (রাঃ) অতঃপর শাম আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। তখন শামকে আনুগত্যে বাধ্য করা তাঁর জন্য তেমন কষ্টকর ছিল না। কারণ জাযিরাতুল আরব, ইরাক এবং মিসর তাঁর আদর্শানুগত। শাম প্রদেশ একা তাঁর মুকাবিলায় বেশীক্ষণ টিকতে পারতো না। উপরন্তু একটি প্রদেশের গবর্ণর খলীফার বিরুদ্ধে তরবারী উন্মুখ করে দাঁড়াবে—মুসলিম জাহানের সাধারণ জনমতও কিছুতেই তা পসন্দ করতো না। বরং এ পরিস্থিতিতে শামের জনগণের পক্ষেও এক জোট হয়ে খলীফার বিরুদ্ধে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে সাহায্য করা সম্ভব হতো না। কিন্তু একই সময়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর পদক্ষেপ—যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি-পরিস্থিতির চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে দেয় এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে শাম অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে ৩৬ হিজরীর রবিউস সানী মাসে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হতে হয়।[৪৩]

হিজরী ৩৬ সালের জমাদিউস সানী মাসে জামাল যুদ্ধ শেষ করে হযরত আলী (রাঃ) পুনরায় শাম-এর দিকে মনোনিবেশ করেন এবং হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালীকে একখানা

৪২. আত-তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৬৪। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১০৪। আল বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২২৯। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৫২-১৫৩।
৪৩. ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১১৩।

পত্র দিয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর নিকট পাঠান। এর মাধ্যমে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয় যে, উম্মাত যে খেলাফতের ব্যাপারে একমত হয়েছে, তাঁর উচিত তার আনুগত্য করা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভেদ সৃষ্টি না করা । কিন্তু তিনি দীর্ঘ সময় হযরত জারীরকে হাঁ বা না, কোন উত্তরই দেননি। বরং দিচ্ছি দিচ্ছি করে সময় কাটাতে থাকেন। হযরত আমর ইবনুল আস–এর পরামর্শক্রমে তিনি ফায়সালা করেন যে,হযরত আলী (রাঃ)–কে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। তাঁদের উভয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে; যুদ্ধের পরে হযরত আলী (রাঃ)–এর বাহিনী পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর পতাকা তলে লড়তে সক্ষম হবে না ; শামবাসীদের মধ্যে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর পতাকাতলে যুদ্ধ করার জন্য যে মনোবল দেখা যায়, ইরাক সে মনোবল নিয়ে হযরত আলী (রাঃ)–এর সাহায্য করতে সক্ষম হবে না।[৪৪] হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন টাল–বাহানা করছিলেন সে সময় হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ দামেস্কে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়ে তাদেরকে এ কথা বলতে থাকেন যে, ওসমান (রাঃ) হত্যার সাথে হযরত আলী (রাঃ)–এর কোন সম্পর্ক নেই এবং এ ব্যাপারে তিনি দায়ীও নন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এতে শংকিত হন, হযরত আলী (রাঃ)–ই হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যার জন্য দায়ী–এ মর্মে শামবাসীদের সামনে সাক্ষ্য দেয়ার নিমিত্ত কতিপয় সাক্ষী তৈরী করার জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেন। কাজেই ঐ ব্যক্তি পাঁচ জন সাক্ষী সংগ্রহ করে আনে। তারা জনগণের সামনে সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত আলী (রাঃ)–ই হযরত ওসমান (রাঃ)–কে হত্যা করেছেন।[৪৫]

এরপর হযরত আলী (রাঃ) ইরাক থেকে এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) শাম থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হন এবং ফোরাতের পশ্চিম প্রান্তে 'আর-রাক্কা'র নিকটে অবস্থিত 'সিফ্‌ফীন' নামক স্থানে উভয়পক্ষ মুখোমুখী হয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর বাহিনী পূর্বেই ফোরাতের পানীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসে। তিনি প্রতিপক্ষ বাহিনীকে পানি ব্যবহারের অনুমতি দেননি। হযরত আলী (রাঃ)–এর সৈন্যরা যুদ্ধ করে তাদেরকে সেখান থেকে বেদখল করে। হযরত আলী (রাঃ) নিজের লোকদেরকে নির্দেশ দেন নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি নিতে থাকো এবং অবশিষ্ট পানি থেকে প্রতিপক্ষ সৈন্যদলকে উপকৃত হতে দাও।[৪৬]

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দিকে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করার আগে হযরত আলী (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি জবাব দেন ঃ আমার নিকট থেকে চলে যাও, আমার এবং তোমাদের মধ্যে তরবারী ব্যতীত কিছুই নেই।[৪৭]

---

৪৪. আত-তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৫৬১। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১৪১,১৪২। আল বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৫৩।

৪৫. আল-ইস্তীয়াব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৫৮৯।

৪৬. আত-তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৫৬৮,৫৬৯। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১৪৫, ১৪৬। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭০।

৪৭. ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪৬। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭০

কিছুকাল যুদ্ধ অব্যাহত রাখার পর হিজরী ৩৭ সালের মহররম মাসের শেষ পর্যন্ত তা মুলতবী রাখার চুক্তি সম্পাদিত হলে হযরত আলী (রাঃ) হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ)-এর নেতৃত্বে পুনরায় একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দলটি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে বলেন যে, সকলেই হযরত আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারে একমত ; কেবল আপনি এবং আপনার সঙ্গীরাই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জবাব দেন ঃ হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদেরকে যদি তিনি আমাদের হাতে সোপর্দ করেন, যাতে আমরা তাদেরকে হত্যা করতে পারি, তাহলে এর পরই আমরা তোমাদের কথা শুনবো এবং আনুগত্য গ্রহণ করে জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হবো। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। এ দলের নেতা ছিলেন হাবীব ইবনে মাসলামা আল-ফিহ্‌রী। তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেন ঃ আপনি হযরত ওসমান (রাঃ)-কে হত্যা করেননি—এ যদি আপনার দাবী হয়ে থাকে, তবে যারা হত্যা করেছে তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। আমরা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রক্তের বদলে তাদেরকে হত্যা করবো। অতঃপর আপনি খেলাফতের পদে ইস্তফা দিন, যাতে মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে যার ব্যাপারে একমত হয়, তাকে খলীফা বানাতে পারে।[৪৮]

মহররম মাস শেষ হওয়ার পর হিজরী ৩৭ সালের সফর মাস থেকে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের সূচনাতেই হযরত আলী (রাঃ) নিজের বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করেন ঃ সাবধান! তারা আক্রমণ চালাবার আগে নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করবে না। অতঃপর তোমরা তাদেরকে পরাজিত করলে কোন পলায়নকারীকে হত্যা করবে না, কোন আহত ব্যক্তির ওপর হাত তুলবে না, কাউকে নগ্ন করবে না, কোন নিহিত ব্যক্তির লাশ বিকৃত করবে না, কারো গৃহে প্রবেশ করবে না, তাদের অর্থ সম্পদ লুন্ঠন করবে না, নারীরা তোমাদেরকে গালি দিলেও তাদের গায়ে হাত লাগাবে না।[৪৯]

এ যুদ্ধের সময় এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, যা স্পষ্টত প্রমাণ করে দেয় যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কে সত্যের ওপর আছে, আর কে মিথ্যার ওপর। ঘটনাটি ছিল এই যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের—যিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাবাহিনীতে ছিলেন—হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর বাহিনীর সাথে যুদ্ধে শহীদ হন। تقتلك الفئة الباغية একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে—হযরত আম্মার সম্পর্কে নবী করীম (সঃ)-এর এ উক্তি সাহাবীদের মধ্যে বহুল পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ ছিল। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, তাবারানী, বায়হাকী, মুসনাদে আবুদাউদ তায়ালেসী ইত্যাকার হাদীসগ্রন্থে হযরত আবুসাঈদ খুদরী, আবুকাতাদা আনসারী, উম্মে সালমা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লা ইবনে আমর ইবনুল আ'স, আবু হুরায়রা ওসমান ইবনে আফ্‌ফান, হুযায়ফা, আবু আইয়ুব আনসারী, আবুরাফে, খোযায়মা ইবনে সাবেত, আমর ইবনুল আ'স, আবুল ইউসর, আম্মার ইবনে ইয়াসের রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং

---

৪৮. তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা—৩, ৪। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা— ১৪৭,১৪৮। আল বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৫৭, ২৫৮। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭১।

৪৯. তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা—৬। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা— ১৪৯।

আরও অনেক সাহাবী থেকে এ ধরনের রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে সাআ'দ 'তাঁর তাবাকাত'-এর কয়েক সনদে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।[৫০]

বিভিন্ন সাহাবা এবং তাবেয়ী—হযরত আলী (রাঃ) এবং মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর যুদ্ধে যারা সন্ধিহান ছিলেন—এ যুদ্ধে কে 'হক'-এর ওপর রয়েছেন আর কে 'বাতিল'-এর ওপর এ কথা জানার জন্য তাঁরা হযরত অম্মার (রাঃ)-এর শাহাদাতকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৫১]

আবুবকর আল- জাস্‌সাস তার 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"আলী ইবনে আবুতালেব (রাঃ) বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন এমন সব বড় বড় সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণ যাঁদের মর্যাদা সবার জানা আছে। এ যুদ্ধে তিনি 'হক'-এর ওপর ছিলেন। যে বিদ্রোহী দল তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে তারা ব্যতীত এ ব্যাপারে আর কেউ দ্বিমত পোষণ করে না। উপরন্তু নবী (সঃ) নিজে হযরত আম্মার (রাঃ)-কে বলে ছিলেন যে, একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে। এটা এমন এক হাদীস, যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং সাধারণ্যে সর্বসম্মতভাবে বিশুদ্ধ বলে গৃহীত হয়েছে। এমনকি, আবদুল্লা ইবনে আমর ইবনুল আস হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনিও অস্বীকার করতে পারেননি। অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, আম্মারকে তারা হত্যা করেছে, যারা তাকে আমাদের বর্শার সামনে ঠেলে দিয়েছে। কুফা, বসরা, হেজায এবং শাম-এর বাসিন্দাগণ সবাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।"[৫২]

ইবনে আবদুল বার্‌ 'আল-ইস্তীআব এ লিখেন ঃ "বিদ্রোহী দল আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে হত্যা করবে— নবী (সঃ) থেকে অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের অন্যতম।"[৫৩]

হাফেয ইবনে হাজার 'আল-এসাবায়' এ কথাই লিখেছেন।[৫৪] অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ "আম্মার হত্যার পর এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'হক' হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে। আহলে সুন্নাত এ ব্যাপারে একমত। অথচ ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে মতবিরোধ ছিল।"[৫৫]

---

৫০. ইবনে সাআ'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫১, ২৫৩, ২৫৯।

৫১. ইবনে সাআ'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫৩, ২৫৯, ২৬১। আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৭। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৭, ১৬৫।

৫২. আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৯২।

৫৩. আল-ইস্তীআব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪২৪।

৫৪. আল-এসাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫০৬।

৫৫. আল-এসাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫০২।

তাহযীবুত তাহযীব-এ ইবনে হাজার লিখেন ঃ

وتواترت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

হাফেয ইবনে কাসীর আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়ায় হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে লিখেন ঃ এ থেকে বিদ্রোহী দল কর্তৃক হযরত আম্মারের নিহত হবার যে খবর রাসূলুল্লাহ (সঃ) দিয়েছিলেন তার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, এ থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) 'হক'-এর ওপর আছেন আর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বিদ্রোহী।[৫৬]

জামাল যুদ্ধ থেকে হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর সরে দাঁড়াবার অন্যতম কারণ এও ছিল যে, নবী করীম (সঃ)-এর এ উক্তি তাঁর স্মরণ ছিল। তিনি দেখতে পান যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাবাহিনীতে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসেরও রয়েছেন।[৫৭]

কিন্তু হযরত আম্মারের শাহাদাতের খবর হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর সেনাবাহিনীতে পৌঁছিলে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) তাঁর পিতা এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) উভয়কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণী স্মরণ করিয়ে দিলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তৎক্ষণাৎ এর ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "আমরা কি আম্মারকে হত্যা করেছি? তাঁকে তো সে-ই হত্যা করেছে, যে তাঁকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে।"[৫৮] অথচ নবী (সঃ) এ কথা বলেননি যে, বিদ্রোহী দল হযরত আম্মারকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে আসবে ; বরং তিনি বলেছিলেন যে, বিদ্রোহী দল তাঁকে হত্যা করবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, তাঁকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর দল হত্যা করেছে, হযরত আলী (রাঃ)-এর দল নয়।

হযরত আম্মার (রাঃ)-এর শাহাদাতের দ্বিতীয় দিন, ১০ই সফর তুমুল যুদ্ধ হয় হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর সেনাবাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এ সময় হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে পরামর্শ দেন ঃ এখন আমাদের সেনাবাহিনীর বর্শার অগ্রভাগে কুরআন বেঁধে ঘোষণা করা উচিত هذ احكم بيننا و بينكم আল-কুরআনই

قال لعمار تقتلک الفئة الباغية (ج ٧ - ص ٣١٠)

নবী (সঃ) হযরত আম্মারকে বলেছিলেন, বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে—এ হাদীস উপর্যুপুরী বর্ণনায় তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৫৬. আল-বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৭০।

৫৭. আল-বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪১। ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৬২।

৫৮. আত-তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা— ১৫৮। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৬৮,২৬৯। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন ঃ 'তিনি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।' মোল্লা আলী কারী 'ফিকহে আকবর'-এর ভাষ্যে এ বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, তাঁর এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত আলী জানতে পেরে বলেন ঃ এ ধরনের ব্যাখ্যা থেকে এ কথাও তো বলা চলে যে, নবী (সঃ) নিজেই হযরত হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ছিলেন। —ফিকহে আকবর-এর ভাষ্য, পৃষ্ঠা—৭৯। দিল্লীর মুজতাবায়ী প্রেস সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে ফায়সালা করবে। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) নিজে এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখান যে,এতে হযরত আলী (রাঃ)-এর বাহিনীর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হবে। এক দল বলবে, তা মেনে নেয়া হোক, আর এক দল বলবে, না, তা মানা যায় না। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো, আর তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। তারা মেনে নিলে আমরা হাতে সময় পেয়ে যাবো।[৫৯] এর স্পষ্ট অর্থ এই ছিল যে, এটা ছিল নিছক একটি সামরিক কৌশল। কুরআনকে ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করা আদৌ এর লক্ষ্য ছিল না।

এ পরামর্শ অনুযায়ী মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর সৈন্যবাহিনী কুরআনকে বর্শার অগ্রভাগে তুলে ধরে। এর ফলে হযরত ইবনুল আ'স (রাঃ) যা আশা করেছিলেন তাই হয়। হযরত আলী (রাঃ) ইরাকের লোকদেরকে হাযারো বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তোমরা এ চক্রান্তে পড়ো না, যুদ্ধকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়ে দাও। কিন্তু তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ করে হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর সাথে 'তাহকীম'-এর চুক্তি করতে হযরত আলী (রাঃ) বাধ্য হন। হাকাম বা সালিস নিযুক্ত করার সময়ও এ অনৈক্য দেখা দেয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)-কে হাকাম নিযুক্ত করেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল, তাঁর পক্ষ থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে হাকাম নিযুক্ত করার। কিন্তু ইরাকের লোকেরা বলে উঠলো যে, তিনি তো আপনার চাচাত ভাই। আমরা নিরপেক্ষ লোক চাই। শেষ পর্যন্ত তাদের পীড়াপীড়িতে পড়ে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)-কে হাকাম নিযুক্ত করতে বাধ্য হন। অথচ তাঁর ব্যাপারে তিনি নিজে নিশ্চিন্ত ছিলেন না।[৬০]

ষষ্ঠ পর্যায়

এখন খেলাফতকে রাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বশেষ সুযোগটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তা ছিল- এই যে, যে চুক্তি অনুযায়ী সালিসদ্বয়কে ফায়সালা করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল তারা যথাযথ ফায়সালা করবেন। চুক্তির যে বিবরণী ঐতিহাসিকরা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে ফায়সালার ভিত্তি ছিল এই ঃ

"উভয় সালিস আল্লার কিতাব অনুসারে কাজ করবেন আর আল্লার কিতাবে যে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না সে ব্যাপারে সত্যাশ্রয়ী এবং ঐক্য সংহতকারী সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করবো।"[৬১]

---

৫৯. তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৪। ইবনে সাআ'দ, ৪র্থ খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা। আল-বেদায়া, ৭ম খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭৪।

৬০. তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৪,৩৫,৩৬। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—১৬১,১৬২। আল-বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৭৫, ২৭৬। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭৫।

৬১. তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৮। আল-বেদায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা—২৭৬। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭৫।

কিন্তু 'দুমাতুল জান্দাল'-এ উভয় সালিস যখন বসেন, তখন কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ বিরোধের মীমাংসা হতে পারে এ বিষয়টি আদতে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কুরআনে সুষ্ঠু নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়লে বিরোধ মীমাংসার সঠিক উপায় হচ্ছে বিদ্রোহী দলকে সত্যপথে আসতে বাধ্য করা। [৬২] হযরত আম্মার-এর শাহাদাতের পর নবী (সঃ)-এর সুস্পষ্ট হাদীস দ্ব্যর্থহীনভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছিল যে, এ বিরোধে বিদ্রোহী দল কোন্‌টি। একজন আমীরের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর আনুগত্য অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধেও স্পষ্ট হাদীস বর্তমান ছিল। রক্তের প্রতিশোধ দাবী করারও স্পষ্ট বিধান বর্তমান ছিল শরীয়াতে। এ বিধানের আলোকে বিচার করা যেতো যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খুন সম্পর্কে তাঁর দাবী সঠিক পন্থায় উত্থাপন করেছেন, না অন্যায় পন্থায়। সালিস চুক্তিতে উভয় সালিসের উপরে আসলে এ দায়িত্ব অর্পণই করা হয়নি যে, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছা মতো খেলাফত সম্পর্কে একটি ফায়সালা করে দেবেন। বরং তাদের সামনে উভয় পক্ষের বিরোধ দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরা হয় এবং প্রথমে আল্লার কিতাব অতঃপর রাসূলের ন্যায়ানুগ সুন্নাতের ভিত্তিতে এর মীমাংসা করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়। কিন্তু উভয় বুযুর্গ যখন আলোচনা শুরু করেন তখন এ সমস্ত বিষয় বেমালুম ভুলে গিয়ে খেলাফতের ব্যাপারে কিভাবে একটা সমাধানে পৌঁছানো যায় এ নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে থাকেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার মতে এ ব্যাপারে কোন পন্থা সমীচীন? জবাবে তিনি বলেন ঃ 'আমার মত এই যে, আমরা এ ব্যক্তিদ্বয়কে (আলী ও মুআবিয়া) বাদ দিয়ে খেলাফতের ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ওপর ছেড়ে দেই, যাতে তারা যাকে খুশী নির্বাচিত করতে পারে।' হযরত আমর (রাঃ) বললেন ঃ আপনি যথার্থ চিন্তা করেছেন।' অতপর উভয়ে এক গণসমাবেশে উপস্থিত হন। এ গণসমাবেশে উভয় পক্ষ থেকে ৪শত করে সমর্থক এবং কয়েকজন নিরপেক্ষ বুযুর্গও উপস্থিত

---

৬২ আল-হুজুরাত ৯ আয়াত। আয়াতের শব্দগুলো এই ঃ

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ج

فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ

تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ج

"মু'মিনদের দু'টি দল যদি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করো। একদল যদি অপর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে বিদ্রোহী দল আল্লার নির্দেশের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

ছিলেন। হযরত আমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)-কে বলেন ঃ "আমাদের উভয়ের ঐক্যমতে পৌঁছার কথাটা আপনি এদেরকে বলে দিন।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)-কে বলেন ঃ "আপনারা উভয়ে ঐক্যমতে উপনীত হয়ে থাকলে হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)-কে তা ঘোষণা করতে দিন। কারণ আমার আশংকা হচ্ছে, আপনি প্রতারিত হয়েছেন। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন ঃ "আমি এ রকম কোন আশংকা করছি না। আমরা একমত হয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।" অতঃপর তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন ঃ "আমি এবং আমার এ বন্ধু (অর্থাৎ আমর ইবনুল আ'স) একটি বিষয়ে একমত হয়েছি। তা এই যে, আমরা আলী (রাঃ) এবং মুআ'বিয়া (রাঃ)-কে বাদ দেবো—অতঃপর জনগণ পরামর্শক্রমে যাকে খুশী আমীর নিযুক্ত করবে। সুতরাং আমি আলী (রাঃ) এবং মুআ'বিয়া (রাঃ)-কে বরখাস্ত করছি। এখন নিজেদের ব্যাপার আপনারা নিজেদের হাতে নিয়ে নিন এবং যাকে যোগ্য মনে করেন, আমীর নিযুক্ত করুন।" অতঃপর হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "ইনি যা বলেছেন, আপনারা শুনলেন। তিনি নিজের লোক (হযরত আলী)-কে বরখাস্ত করেছেন। তাঁর মতে আমিও তাঁকে বরখাস্ত করছি এবং আমার নিজের লোক (হযরত মুআ'বিয়াকে) বহাল রাখছি। কারণ তিনি ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-এর বন্ধু এবং তাঁর রক্তের দাবীদার। উপরন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।" হযরত আবু মূসা (রাঃ) এ কথা শুনেই বলে ওঠেন ঃ

مَالَكَ ، لَا وَفَّقَكَ اللّٰهُ ، غَدَرْتَ وَفَجَرْتَ

"তুমি এ কি করলে? আল্লাহ তোমাকে সুযোগ দেবেন না। তুমি প্রতারণা করেছো এবং চুক্তির বিরোধিতা করেছো।" হযরত সাআ'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন ঃ আবু মূসা! তোমার জন্য আফসোস হয়। আমরের চক্রান্তের মুকাবিলায় তুমি অনেক দুর্বল প্রতিপন্ন হলে।" হযরত আবু মুসা (রাঃ) জবাবে বলেন ঃ "এখন আমি কি করবো? তিনি আমার সাথে একটি বিষয়ে একমত হয়েছিলেন পরে তা থেকে মুক্ত করে নিলেন নিজেকে।" হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রাঃ) বলেন ঃ "এর পূর্বে আবু মুসা মারা গেলে তা তার জন্য অতি উত্তম হতো।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ "দেখো, এ উম্মতের অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। এমন দু'ব্যক্তির ওপর উম্মতের ভবিষ্যত ন্যস্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন কি করেছেন তার কোন পরওয়া করেন না, আর অন্যজন দুর্বল।"[৬৩]

হযরত আবু মূসা (রাঃ) তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন, সে সম্পর্কে যে উভয়ের মধ্যে ঐক্যমত হয়েছিল—এ বিষয়ে সেখানে উপস্থিত কোন ব্যক্তির সন্দেহ ছিল না। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) যা কিছু করেন, তা ছিল স্থিরকৃত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতঃপর হযরত আমর ইবনুল

---

৬৩. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫১। ইবনে সাআ'দ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫৬, ২৫৭। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৮। আল-বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৮২, ২৮৩। ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭৮।

আ'স (রাঃ) হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ)–এর নিকট গিয়ে তাঁকে খেলাফতের সুসংবাদ দেন। হযরত আবু মুসা (রাঃ) লজ্জায় হযরত আলী (রাঃ)–কে মুখ দেখাতে না পেরে সরাসরী মক্কা চলে যান।[৬৪]

হাফেয ইবনে কাসীর হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)–এর এ কার্যের ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন ঃ তিনি জনগণকে সে মুহূর্তে নেতা বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন জনগণের মধ্যে যে মতানৈক্য বিরাজ করছিল, তা দেখে তাঁর আশংকা হয় যে, এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই, তিনি প্রয়োজনের তাকীদে হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ)–কে বহাল রাখেন। ইজতিহাদ নির্ভুলও হয়, ভুলও হয়।[৬৫]

কিন্তু যে কোন ইনসাফপ্রিয় ব্যক্তি বর্শার মাথায় কুরআন বাঁধার প্রস্তাব থেকে শুরু করে এ পর্যন্তকার সমস্ত বিবরণী পাঠ করবেন, এসব কিছুকে 'ইজতিহাদ' বলে মেনে নেয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়বে। সন্দেহ নেই, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সকল সাহাবীই সম্মানার্হ। যে ব্যক্তি তাঁদের কোন ভুলের কারণে তাঁদের সকল খেদমত অস্বীকার করে বসে এবং তাঁদের উচ্চতর মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে গালি দেয়ার পর্যায়ে নেমে আসে, সে সত্যিই শত–সহস্র বার যুলুম করে। কিন্তু তাঁদের কেউ কোন ভুল করলে নিছক সাহাবীদের মর্যাদার কারণে তাকে 'ইজতিহাদ' বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করাটাও কম যুলুম ও অন্যায় নয়। বড় লোকদের ভুল যদি তাদের মহত্বের ফলে ইজতিহাদ হয়ে যায় ; তবে পরবর্তীকালের লোকদেরকে কি বলে এমন সব 'ইজতিহাদ' থেকে আমরা নিবৃত্ত করবো ? ইজতিহাদের অর্থই তো হচ্ছে সত্য বিষয় অবগত হওয়ার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। এ চেষ্টা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল হয়ে গেলেও সত্য জানার চেষ্টা অবশ্যি প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে। কিন্তু জেনে শুনে সুপরিকল্পিত উপায়ে কোন ভুল করার নাম কিছুতেই ইজতিহাদ হতে পারে না। বস্তুত এ সকল ব্যাপারে বাড়াবাড়ি একান্তই বর্জনীয়। কোন ভুল কাজ নিছক সাহাবী হওয়ার ফলে মর্যাদাপূর্ণ হতে পারে না ; বরং সাহাবীর মহান মর্যাদার ফলে সে ভুল আরও উৎকট হয়ে ওঠে। তবে সে ব্যাপারে মন্তব্যকারীকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ভুলকে ভুল মনে করা এবং ভুল বলা পর্যন্তই মন্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আরও অগ্রসর হয়ে সাহাবীদের ব্যক্তিসত্তাকে সামগ্রিকভাবে অভিযুক্ত ও দোষারোপ করা যাবে না। নিঃসন্দেহে হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন বুযুর্গ। তিনি ইসলামের বহু মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এ দু'টি ভুল কাজ করেছেন, যাকে ভুল না বলে গত্যন্তর নেই।

উভয় সালিসের মধ্যে কে কি করেছেন, সে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও এ কথা বলা চলে যে, দুমাতুল জান্দালে যা কিছু ঘটেছে, তার সবটুকুই ছিল সালিসী চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এভাবে নিঃসন্দেহে চুক্তির সীমালংঘন করা হয়েছিল। তাঁরা অন্যায়ভাবে এ কথা ধরে নিয়েছিলেন যে, হযরত আলী (রাঃ)–কে বরখাস্ত করার ইখতিয়ার তাঁদের রয়েছে। অথচ হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাহাদাতের পর তিনি যথারীতি আইনানুগ পন্থায় খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সালিসী চুক্তির কোন

৬৪. আল–বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৮৩। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭৮।
৬৫. আল–বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৮৩ ।

শব্দের এমন অর্থ করা যায় না, যা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁকে বরখাস্ত করার ইখতিয়ার তাদেরকে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু তাঁরা এ কথাও অন্যায়ভাবে ধরে নিয়েছেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে খেলাফতের দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। অথচ এ পর্যন্ত তিনি কেবল মাত্র হযরত ওসমান (রাঃ)–এর রক্তের দাবীদার ছিলেন, খেলাফতের দাবীদার ছিলেন না। সর্বোপরি তাদের এ ধারণাও ভুল ছিল যে, তাদেরকে খেলাফত সমস্যার সমাধানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সালিসী চুক্তিতে এহেন ভ্রান্ত ধারণার কোন ভিত্তি ছিল না। এ কারণে হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"শোন ! তোমরা যে দু'জনকে সালিস নিযুক্ত করেছিলে, তারা কুরআনের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লার নির্দেশ ব্যতিরেকেই তাদের সকলেই স্ব স্ব ধারণার অনুসরণ করেছে। তারা এমন ফায়সালা দিয়েছে, যা সুস্পষ্ট দলীল–প্রমাণ এবং অতীত রীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ ফায়সালায় তাদের কেউই একমত হতে পারেনি। কেউই পারেনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে।" ৬৬

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) কূফায় পৌঁছে পুনরায় শাম আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। এ সময় তিনি যেসব ভাষণ দেন, তা থেকে স্পষ্ট জানা যায়, তিনি মিল্লাতের ওপর স্বৈরতন্ত্র আরোপিত হওয়ার আশংকা কতো তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন এবং খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কিভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এক ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"আল্লার শপথ, এরা যদি তোমাদের শাসক হয়ে বসে, তাহলে তোমাদেরকে কাইজার এবং হেরাক্লিয়াসের ন্যায় শাসন করতে থাকবে।" ৬৭

অপর এক ভাষণে তিনি বলেন ঃ "যারা আল্লার বান্দাদেরকে নিজেদের গোলামে পরিণত করার জন্য এবং স্বৈরাচারী শাসক হবার জন্য তোমাদের সাথে লড়ছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও।" ৬৮

কিন্তু ইরাকের লোকেরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল এবং অন্যদিকে খারেজীদের বিপর্যয় হযরত আলী (রাঃ)–এর জন্য এক নতুন মাথা ব্যথার সৃষ্টি করে। এ ছাড়া হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এমন কৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলও তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলিম জাহান কার্যত দু'টি সংঘর্ষশীল সরকারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ)–এর শাহাদাত (৪০ হিজরী) রমযান মাসের এবং হযরত হাসান (রাঃ)–এর সমঝোতা (৪১ হিজরী) ময়দানকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয়। এরপর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা দেখে যেসব লোক ইতিপূর্বে হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যেকার যুদ্ধকে নিছক ফেতনা বলে উল্লেখ করে নির্লিপ্ত ছিলেন, তাঁরাও ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হন যে, হযরত আলী (রাঃ) কোন্ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত রাখার এবং

---

৬৬. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৭।

৬৭. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৮। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭১।

৬৮. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৯। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭২।

উম্মতকে কোন্ পরিণতি থেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপাত করে আসছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর জীবনের শেষ সময়ে বলেছিলেন ঃ "আমি আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে কেন যোগ দেইনি, এ জন্য যত অনুতাপ হয়েছে, তা আর কিছুর জন্য হয়নি।"[৬৯] ইবরাহীম নাখঈর বর্ণনায় ঃ "মাসরুক ইবনে আজদা' হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে যোগ না দেয়ার জন্য তাওবা ও এস্তেগফার করেন।"[৭০] হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) সারা জীবন ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন।"[৭১]

হযরত আলী (রাঃ) এ বিপর্যয় কালে যেভাবে কাজ করেছেন, তা একজন খলীফায়ে রাশেদের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। কেবল একটি বিষয়ে এমন দেখা যায়, যার সমর্থন করা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। তা হচ্ছে, যুদ্ধের পর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের ব্যাপারে তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করেন। জামাল যুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে সহ্য করতেন, তাদেরকে কাবু করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ)-এর সাথে আলাপ আলোচনার জন্য তিনি যখন হযরত কা'কা' ইবনে আমরকে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে কা'কা' বলেছিলেন ঃ "হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হন্তাদের পাকড়াও করার ক্ষমতালাভের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলী (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন থেকে বিরত রয়েছেন। আপনারা বায়াত গ্রহণ করলে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ সহজ হয়ে যাবে।"[৭২] অতঃপর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে হযরত তালহা (রাঃ) এবং যুবায়ের (রাঃ)-এর সাথে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। তাতে হযরত তালহা (রাঃ) তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, আপনি ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার জন্য দায়ী। জবাবে তিনি বলেন ঃ لعن الله قتلة عثمان ওসমান হন্তাদের ওপর আল্লার অভিসম্পাত।[৭৩] কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অবশেষে তাঁকে হত্যার জন্য যারা দায়ী, অতঃপর তারা ধীরে ধীরে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এমনকি, তিনি মালেক ইবনে হারেস আল-আশতার এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ)-কে গবর্ণর পদে নিয়োগ করেন। অথচ ওসমান (রাঃ)-এর হত্যায় এদের যে ভূমিকা ছিল, তা সকলেরই জানা। হযরত আলী (রাঃ)-এর সমগ্র খেলাফত আমলে এ একটি কাজই আমরা এমন দেখতে পাই, যাকে ভুল না বলে উপায় নেই।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মতো হযরত আলী (রাঃ)-ও তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজনকে বড় বড় পদে নিয়োগ করেছেন। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

---

৬৯. ইবনে সাআদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮৭। ইবনে আবদুল বার, আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩০-৩৭।

৭০. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩০।

৭১. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৭১।

৭২. আল-বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩৭

৭৩. আল-বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪০।

(রাঃ), হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত কোসাম ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইত্যাদি। কিন্তু এ যুক্তি পেশ করার সময় তারা ভুলে যান যে, হযরত আলী (রাঃ) এমন এক পরিস্থিতিতে এ কাজ করেছিলেন, যখন উন্নতমানের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি অংশ তাঁর সাথে সহযোগিতা করছিল না, অন্যদিকে অপর একটি অংশ বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছিল এবং তৃতীয় অংশটি থেকেও প্রতিদিন লোকেরা বের হয়ে ভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে তিনি এমন সব লোককে কাজে লাগাতে বাধ্য হন, যাদের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলের পরিস্থিতির সাথে এ পরিস্থিতির কোন মিল নেই। কারণ তিনি এমন এক সময় এ কাজ করেন, যখন উম্মাতের সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্পূর্ণ সহযোগিতা তিনি লাভ করেন। আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণে তিনি বাধ্য ছিলেন না।

শেষ পর্যায়

ক্ষমতার চাবিকাটি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর হস্তগত হওয়াই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের খেলাফত থেকে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তনের অন্তবর্তীকালীন পর্যায়। দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এ পর্যায়েই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এখন তারা রাজতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্মুখীন। তাই দেখি, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর বায়আতের পর হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে السلام عليك ايها الملك-রাজা! আপনার প্রতি সালাম-বলে সম্বোধন করেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আপনি আমীরুল মু'মিনীন বললে কি অসুবিধা ছিল? জবাবে তিনি বলেন ঃ আল্লার কসম, যে পন্থায় আপনি ক্ষমতা লাভ করেছেন, আমি সে পন্থায় কিছুতেই তা গ্রহণ করতাম না।[৭৪] হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নিজেও একথা জানতেন। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেন ঃ انا اول الملوك - আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম রাজা।[৭৫] বরং হাফেজ ইবনে কাসীর-এর উক্তি অনুযায়ী তাঁকে খলীফা না বলে বাদশাহ বলাই সুন্নত। কারণ, মহানবী (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ "আমার পর খেলাফত ৩০ বৎসর থাকবে, অতঃপর বাদশাহীর আগমন হবে।" হিজরী ৪১ সালের রবিউল আউয়াল মাসে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে হযরত হাসান (রাঃ)-এর খেলাফত ত্যাগের মাধ্যমে এ মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে।[৭৬]

---

৭৪. ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪০৫। এ ব্যাপারে হযরত সাআদ (রাঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল, একটি ঘটনা থেকে তার ওপর আলোকপাত হয়। বিপর্যয় কালে একদা তাঁর ভ্রাতুষপুত্র হাশেম ইবনে ওতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস তাঁকে বলেন ঃ আপনি খেলাফতের জন্য দাঁড়ালে অসংখ্য তরবারী আপনার সমর্থনের জন্য প্রস্তুত। জবাবে তিনি বলেন ঃ এসব লক্ষ তরবারীর মধ্যে আমি কেবল একখানা তরবারী চাই, যা কাফেরের ওপর চলবে, চলবে না কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে (আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭২)।

৭৫. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪৫। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড,পৃষ্ঠা—১৩৫।

৭৬. আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬।

এখন খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত (মহানবী প্রদর্শিত পথে খেলাফত) বহাল করার একটি মাত্র উপায়ই অবশিষ্ট ছিল। তা ছিল হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর অবর্তমানে কাউকে এ পদে নিয়োগ করার ভার মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ওপর ছেড়ে দিতেন ; অথবা বিরোধ নিরসনের উদ্দেশ্যে তাঁর জীবদ্দশায়ই স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করা প্রয়োজনীয় মনে করলে মুসলমানদের সৎ ও ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমবেত করে উম্মতের মধ্য থেকে যোগ্যতম ব্যক্তিকে বাছাই করার স্বাধীন ক্ষমতা দান করতেন। কিন্তু স্বীয় পুত্র ইয়াজীদের স্বপক্ষে ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা দেখিয়ে বায়আত গ্রহণ করে তিনি এ সম্ভাবনারও সমাপ্তি ঘটালেন।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) এ প্রস্তাবের উদ্ভাবক। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁকে কুফার গবর্ণরের পদ থেকে বরখাস্ত করার কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি এ বিষয়ে অবহিত হলেন। তৎক্ষণাৎ কুফা থেকে দামেশক পৌছে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ "শীর্ষ স্থানীয় সাহাবী এবং কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি না আমীরুল মু'মিনীন তোমার পক্ষে বায়আত গ্রহণে কেন বিলম্ব করছেন।" ইয়াজীদ তাঁর পিতার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি হযরত মুগীরা (রাঃ)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ইয়াজিদকে কি বলেছো? হযরত মুগীরা (রাঃ) জবাব দেন ঃ "আমিরুল মু'মিনীন ! হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার পর যতো মতবিরোধ এবং খুন-খারাবী হয়েছে,তা আপনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। কাজেই এখন আপনার জীবদ্দশায়ই ইয়াজীদকে স্থলাভিষিক্ত করে বায়আত গ্রহণ করাই আপনার জন্য উত্তম। ফলে আল্লাহ না করুন যদি আপনার কখনো কিছু হয়ে যায়, তাহলে অন্তত মতবিরোধ দেখা দেবে না।" হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ " এ কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব কে নেবে?" জবাবে তিনি বললেন ঃ "আমি কুফাবাসীদের সামলাবো ; আর যিয়াদ বসরাবাসীদেরকে। এরপর বিরোধিতা করার আর কেউ থাকবে না।" এ কথা বলে হযরত মুগীরা (রাঃ) কুফা গমন করেন এবং দশজন লোককে ৩০ হাযার দেরহাম দিয়ে একটি প্রতিনিধি দলের আকারে হযরত মুআবিয়ার নিকট গমন করে ইয়াজীদের স্থলাভিষিক্তের জন্য তাঁকে বলতে সম্মত করেন। হযরত মুগীরা (রাঃ)-এর পুত্র মূসা ইবনে মুগীরার নেতৃত্বে এ প্রতিনিধি দল দামেস্কে গমন করে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে। পরে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মূসাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমার পিতা এদের নিকট থেকে কত মূল্যে এদের ধর্ম ক্রয় করেছেন? তিনি বললেন, ৩০ হাযার দিরহামের বিনিময়ে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ তাহলে তো এদের ধর্ম এদের দৃষ্টিতে নিতান্ত নগন্য।"[৭৭]

অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বসরার গবর্ণর যিয়াদকে লিখেন, এ ব্যাপারে তোমার মত কি? তিনি ওবায়েদ ইবনে কাআব আন নুমাইরকে ডেকে বলেন, আমিরুল মুমিনীন এ ব্যাপারে আমাকে লিখেছেন। আমার মতে ইয়াজীদের মধ্যে অনেকগুলো দুর্বলতা রয়েছে। তিনি দুর্বলতাগুলো উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন, তুমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে গিয়ে বলো যে, এ ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়ো না করা হয়। ওবায়েদ বলেন, আপনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর মতামত নষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। আমি গিয়ে ইয়াজীদকে বলবো যে, আমীরুল মু'মিনীন এ ব্যাপারে আমীর যিয়াদের

---

৭৭. ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪৯। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭৯ এবং ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫-১৬তে এ ঘটনার অংশ বিশেষের উল্লেখ আছে।

পরামর্শ চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, জনগণ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে। কারণ, তোমার কোন কোন আচার-আচরণ জনগণ পসন্দ করে না। তাই আমীর যিয়াদের পরামর্শ এই যে, তুমি এ সব বিষয় সংশোধন করে নাও, যাতে কাজটি ঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যিয়াদ এ মত পসন্দ করেন। ওবায়েদ দামেস্ক গমন করে এক দিকে ইয়াজীদকে তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণ সংশোধনের পরামর্শ দেন আর অপর দিকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে বলেন, আপনি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না।[৭৮] ঐতিহাসিকরা বলেন, এরপর ইয়াজীদ তাঁর বহু আচরণ সংশোধান করে নেন, যা লোকেরা আপত্তিকর মনে করতো। কিন্তু এ বিবরণ থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। এক ঃ ইয়াজীদের স্থলাভিষিক্তের প্রাথমিক আন্দোলন কোন সুষ্ঠু ভাবধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বরং একজন বুযুর্গব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে অপর বুযুর্গের স্বার্থকে চাঙ্গা করে এ প্রস্তাবের জন্ম দিয়েছিলেন। এভাবে তাঁরা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কোন্ পথে ঠেলে দিচ্ছেন, তা কোন বুযুর্গই চিন্তা করেননি। দুই ঃ ইয়াজীদ নিজে এমন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না যে মুআবিয়া (রাঃ)-এর পুত্র হবার বিষয়টি বাদ দিলে কেউ এ কথা বলতে পারেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পরে উম্মতের নেতৃত্বের জন্য তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

যিয়াদের মৃত্যুর (৫০ হিজরী) পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রভাবশালী লোকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট এক লক্ষ দেরহাম পাঠিয়ে ইয়াজীদের বায়আতের জন্য তাঁকে সম্মত করাবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ঃ "ওহো, এ উদ্দেশ্যে আমার জন্য এ টাকা পাঠান হয়েছে। তা হলে তো আমার দ্বীন আমার জন্য খুবই সস্তা !" এ বলে তিনি টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।[৭৯]

এরপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মদীনার গবর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামকে লিখেন ঃ "আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার জীবদ্দশায়ই কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চাই। ....স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের ব্যাপারে জনগণের মতামত জিজ্ঞেস করো।" মারওয়ান বিষয়টি মদীনাবাসীদের সামনে উত্থাপন করেন। সকলেই বলেন, এটা একান্ত সমীচীন। এরপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) আবার মারওয়ানকে লিখেন, "আমি স্থলাভিষিক্তির জন্য ইয়াজীদকে মনোনীত করেছি।" মারওয়ান পুনরায় বিষয়টি মদীনাবাসীদের সামনে উত্থাপন করে মসজিদে নববীতে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন ঃ "অমীরুল মু'মিনীন তোমাদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি সন্ধান করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেননি। তিনি নিজে পুত্র ইয়াজীদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এটা একটা চমৎকার সিদ্ধান্ত ! আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি নিজ পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন, এটা কোন নুতন কথা নয়। আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-ও স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছিলেন।" এতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ "মারওয়ান। তুমি মিথ্যা বলেছো। আর

৭৮. আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২২৪, ২২৫। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪৯-২৫০। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭৯।

৭৯. ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫০। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৯।

মিথ্যা বলেছে মুআ'বিয়াও। তোমরা কখনো উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার কল্যাণের কথা চিন্তা করোনি। তোমরা একে 'কায়সারতন্ত্রে' রূপান্তরিত করতে চাও। একজন কায়সার মারা গেলে তার পুত্র তার স্থান দখল করে। এটা আবুবকর ও ওমরের নীতি নয়। তাঁরা আপন সন্তানকে স্থলাভিষিক্ত করেননি।' মারওয়ান বলেন ঃ 'ধরো একে'। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই তো কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا...... (الاحقاف - ١٧)

(যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বলেছে ঃ দুঃখ তোমাদের জন্য।) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) পলায়ন করে হযরত আ'য়েশা (রাঃ)-এর হুজরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত আ'য়েশা (রাঃ) চীৎকার করে বলেন ঃ 'মিথ্যা বলেছে মারওয়ান। আমাদের খান্দানের কারো প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বরং যার প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আমি ইচ্ছা করলে তার নাম বলতে পারি। অবশ্য মারওয়ান যখন পিতার ঔরসে, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পিতার ওপর লানৎ বর্ষণ করেন।' মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রাঃ)-এর মতো হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-ও ইয়াজীদের স্থলাভিষিক্ততা মেনে নিতে অস্বীকার করেন।[৮০]

এ সময়ে হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের তলব করে বিষয়টি তাদের সামনে উত্থাপন করেন। জবাবে সকলেই তোষামোদমূলক বক্তব্য পেশ করে। কিন্তু হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস নীরব থাকেন। হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আবু বাহর, তোমার কি মত?' তিনি বলেন ঃ 'সত্য বললে আপনার ভয়, আর মিথ্যা বললে আল্লার ভয়। আমীরুল মু'মিনীন, আপনি ইয়াজীদের দিন-রাত্রির চলাফেরা ওঠা-বসা, তার ভিতর-বাহির সবকিছু সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন। আল্লাহ এবং এ উম্মতের জন্য সত্যিই তাকে পসন্দ করে থাকলে এ ব্যাপারে আর কারো পরামর্শ নেবেন না। আর যদি তাকে এর বিপরীত মনে করে থাকেন, তাহলে আখেরাতের পথে পাড়ি দেবার আগে দুনিয়া তার হাতে দিয়ে যাবেন না। আর বাকী রইলো আমাদের ব্যাপার ; যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়, তা শোনা এবং মেনে নেয়াইতো আমাদের কাজ।'[৮১]

---

৮০. বুখারী শরীফে সুরায়ে আহকাফের তাফসীরে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে নাসায়ী, ইসমাঈলী, ইবনুল মুনযের, আবু ইয়া'লা এবং ইবনে আবী হাতেম হতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। হাফেয ইবনে কাসীরও তাঁর তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম এবং নাসায়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে এর আনুসাঙ্গিক বিবরণ উল্লেখ করেছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আল-ইস্তীআ'ব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৯৩। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৯ এবং ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫০ দেখুন। ইবনুল আসীর লিখেছেন ঃ কোন কোন বর্ণনা মতে হিজরী ৫৩ সালে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর ইন্তেকাল করেন। এটা সত্য হলে তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না।' কিন্তু নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা এর বিপক্ষে। হাফেয ইবনে কাসীর আল-বেদায়ায় লিখেছেন, হিজরী ৫৮ সালে তার ইন্তেকাল হয়েছে।

৮১. ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫০-২৫১। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮০।

ইরাক, শাম এবং অন্যান্য এলাকা থেকে বায়আত গ্রহণ করে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হেজায গমন করেন। কারণ, হেজাযের ব্যাপারটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম জাহানের যে সকল প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল, তাঁরা সকলেই ছিলেন সেখানে। মদীনার বাইরে থেকে হযরত হুসাইন (রাঃ), হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাদের সাথে এমন কঠোর আচরণ করেন যে, তাঁরা শহর ত্যাগ করে মক্কা চলে যান। এভাবে মদীনার ব্যাপারটি সহজ হয়ে যায়। এরপর তিনি মক্কা গমন করে ব্যক্তি চতুষ্টয়কে শহরের বাইরে ডেকে এনে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। মদীনার অদূরে তাঁদের সাথে যে আচরণ করেছিলেন এবারের আচরণ ছিল তা থেকে ভিন্ন। তাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেন, তাঁদেরকে সাথে করে শহরে প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁদেরকে একান্তে ডেকে ইয়াজীদের বায়আতে তাদেরকে রাযী করাবার চেষ্টা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) জবাবে বলেন ঃ "আপনি তিনটি কাজের যে কোন একটি করুন। হয় নবী করীম (সঃ)–এর মতো কাউকে স্থলাভিষিক্ত–ই করবেন না জনগণ নিজেরাই কাউকে খলীফা বানাবে, যেমন বানিয়েছিল হযরত আবুবকর (রাঃ)–কে। অথবা আবুবকর (রাঃ) যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে পন্থা অবলম্বন করুন। তিনি স্থলাভিষিক্তের জন্য হযরত ওমর (রাঃ)–এর মতো ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন, যাঁর সাথে তাঁর দূরতম কোন আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল না। অথবা হযরত ওমর (রাঃ)–এর পন্থা অবলম্বন করুন। তিনি ৬ ব্যক্তির পরামর্শ সভার প্রস্তাব দেন। এ পরামর্শ সভায় তাঁর সন্তানদের কেউ ছিলেন না।" হযরত মুআবিয়া (রাঃ) অবশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "আপনারা কি বলেন?" তাঁরা বলেন ঃ "ইবনে যুবায়ের (রাঃ) যা বলেছেন, আমাদের বক্তব্যও তাই।" এরপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে এসেছি। এবার আমি আল্লার কসম করে বলছি, "আমার কথার জবাবে তোমাদের কেউ যদি একটি কথাও বলে, তবে তার মুখ থেকে পরবর্তী শব্দটি প্রকাশ করার অবকাশ দেয়া হবে না। সবার আগে তার মাথায় তরবারী পড়বে।" অতঃপর তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাকে ডেকে নির্দেশ দেন ঃ "এদের প্রত্যেকের জন্য এক একজন লোক নিয়োগ করে তাকে বলে দাও যে, এদের কেউ আমার মতের পক্ষে বা বিপক্ষে মুখ খুললে তার মস্তক যেন উড়িয়ে দেয়া হয়।" তারপর তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মসজিদে গমন করে ঘোষণা করেন ঃ "এরা মুসলমানদের সরদার এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি। এঁদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করা হয় না। এঁরা ইয়াজীদের স্থলাভিষিক্তে সন্তুষ্ট এবং এঁরা বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করেছেন। সুতরাং তোমরাও বায়আত করো।" এক্ষেত্রে লোকদের পক্ষে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ছিল না। কাজেই মক্কাবাসীরাও সবাই বায়আত করে।[৮২]

এমনি করে খেলাফতে রাশেদার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। খেলাফতের স্থান দখল করে রাজকীয় বংশধারা (daynasties)। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম জনতার ভাগ্যে তাদের ইপ্সিত খেলাফত আর কোন দিন জোটেনি। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যথার্থই বিপুল গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাহাবী হওয়ার মর্যাদাও অতীব সম্মানার্হ তিনি মুসলিম জাহানকে পুনরায় এক পতাকাতলে সমবেত করেন এবং বিশ্বে ইসলামের বিজয়ের গতি পূর্বের চাইতেও দ্রুত করেন। তাঁর এসব খেদমতও অনস্বীকার্য। যে ব্যক্তি তাঁকে গালাগালি করে, সে নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু তাঁর অন্যায় কাজকে অন্যায়ই বলতে হবে। তাঁর অন্যায় কাজকে ন্যায় বলার অর্থ হবে, আমরা আমাদের ন্যায়–অন্যায়ের মানদণ্ডকেই আশংকার মুখে ঠেলে দিচ্ছি।

---

৮২. ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা—২৫২।

পঞ্চম অধ্যায়

খেলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য

খেলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য

কিভাবে কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করে খেলাফত শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে, ইতিপূর্বে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। খেলাফতে রাশেদার মতো অতুলনীয় আদর্শ শাসন ব্যবস্থা থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত হওয়া কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না। অকস্মাৎ বিনা কারণেও তা সংঘটিত হয়নি—এ বিবরণী পাঠে এ কথাও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। বরং এ ব্যবস্থার পরিবর্তনের পিছনে বেশ কিছু কারণও ছিল ; যেগুলো ধীরে ধীরে উম্মাতকে খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ মর্মবিদারী পরিবর্তনকালে যেসব পর্যায় সামনে এসেছে, তার প্রতিটি পর্যায়েই তাকে রোধ করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু উম্মাতের তথা সমস্ত মানব জাতিরই দুর্ভাগ্য যে, পরিবর্তনের কার্যকারণ অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে। যার ফলে সে সকল সম্ভাবনার কোন একটিও কাজে লাগান সম্ভব হয়নি।

এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো যে, খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে মৌল পার্থক্য কি ছিল, একটির স্থান অপরটি দখল করায় মূলত কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এবং মুসলমানদের সামাজিক জীবনে এর কি প্রভাব পড়েছিল।

এক ঃ খলীফা নিয়োগের রীতিতে পরিবর্তন

প্রথম মৌলিক পরিবর্তন হয়েছিল শাসনতান্ত্রিক বিধানে, যে বিধানের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে উম্মাতের নেতা নির্বাচিত করা হতো।

খেলাফতে রাশেদায় নেতা নির্বাচনের পন্থা ছিল এই যে, কেউ নিজে খেলাফত লাভের চেষ্টা করেননি, নিজের চেষ্টা-তদবীর দ্বারা ক্ষমতা গ্রহণ করেননি, বরং জনগণ উম্মাতের নেতৃত্বের জন্য যাকে যোগ্য মনে করতো, পরামর্শক্রমে তাঁর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতো। বায়আত (আনুগত্যের শপথ) ক্ষমতার ফল ছিল না, বরং তা ছিল ক্ষমতার কারণ। বায়আত লাভে মানুষের চেষ্টা বা ষড়যন্ত্রের আদৌ কোন ভূমিকা ছিল না বায়আত করা না-করার ব্যাপারে জনগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে বায়আত করত। বায়আত লাভের আগে কেউ ক্ষমতা গ্রহণ করতেন না।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলেই এ বিধান অনুযায়ী ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কেউই খেলাফত লাভের জন্য নাম মাত্র চেষ্টাও করেননি। বরং তাঁদেরকে খেলাফত দেয়ার পরই তাঁরা তা গ্রহণ করেছেন। সাইয়্যেদেনা হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে কেউ বড়জোর এটুকু বলতে পারেন যে, তিনি নিজেকে খেলাফতের জন্য যোগ্যতর বলে মনে করতেন। কিন্তু খেলাফত লাভের জন্য তিনি কখনো কোনভাবে সামান্যতম চেষ্টাও করেছেন—নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং তাঁর নিজেকে যোগ্যতর মনে করাকে এ নিয়মের বিরোধী বলা চলে না। বস্তুতঃ খেলাফত লাভের ব্যাপারে চারজন খলীফাই সমান মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা আপন চেষ্টা দ্বারা খেলাফত লাভ করেননি বরং তাঁদেরকে খেলাফত দেয়া হয়েছিল।

এ নিয়মের ব্যতিক্রম থেকেই রাজতন্ত্রের সূচনা। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত এ ধরনের ছিল না যে, জনগণ খলীফা করেছে বলে তিনি খলীফা হয়েছিলেন—জনগণ খলীফা না করলে

তিনি খলীফা হতেন না। যেভাবেই হোক তিনি খলীফা হতে চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ করে তিনি খেলাফত হাসিল করেছেন। মুসলমানদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করেননি তিনি। জনগণ তাঁকে খলীফা করেনি, তিনি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খলীফা হয়েছেন। যখন তিনি খলীফা হয়ে বসলেন, তখন বায়আত করা ছাড়া জনগণের গত্যন্তর ছিল না। তখন তাঁর বায়আত না করা হলে তিনি নিজের অর্জিত পদ ত্যাগ করতেন না ; বরং এর অর্থ হতো রক্তপাত ও বিশৃংখলা, যাকে শান্তি-শৃংখলার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া যায় না। এ জন্যই ইমাম হাসান (রাঃ) খেলাফত ত্যাগের (রবিউল আউয়াল--৪১ হিঃ) পর সমস্ত সাহাবী তাবেয়ী এবং উম্মাতের সদাচারী ব্যক্তিবর্গ তাঁর বায়আতের ওপর একমত হয়েছিলেন। তাঁরা একে 'আমুল জামাআত' বা দলের বছর বলে অভিহিত করেন। কারণ এর ফলে অন্তত গৃহযুদ্ধের তো অবসান ঘটেছে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নিজেও তাঁর এ অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। খেলাফতের সূচনাকালে একবার মদীনায় ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছিলেন ঃ

أما بعد ، فإني والله ما وليت أمركم حين وليته وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونها وإني لعالم بما في نفوسكم من ذلك ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالسة .... وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا مني ببعضه -

—আল্লার কসম করে বলছি, তোমাদের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকালে আমি এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম না যে, আমার ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় তোমরা সন্তুষ্ট নও, তোমরা তো পসন্দ করো না। এ বিষয় তোমাদের মনে যা কিছু আছে, আমি তা ভালো করেই জানি। কিন্তু আমার এ তরবারী দ্বারা তোমাদেরকে পরাভূত করেই আমি তা অধিকার করেছি। ....এখন তোমরা যদি দেখ, আমি তোমাদের হক পুরোপুরী আদায় করছি না, তাহলে সামান্য নিয়েই আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে।[১]

এভাবে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তের পর তা এমন সুদৃঢ় হয়েছিল যে, বর্তমান শতকে মোস্তফা কামাল কর্তৃক খেলাফতের অবসান ঘটান পর্যন্ত একদিনের জন্যও যা নড়বড়ে হয়নি। এ থেকে বাধ্যতামূলক বায়আত এবং বংশধরদের উত্তরাধিকার সূত্রে বাদশাহী লাভের

১. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ইবনে কাসীর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩২।

এক স্বতন্ত্র ধারা শুরু হয়। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত নির্বাচনভিত্তিক খেলাফতের দিকে প্রত্যাবর্তন মুসলমানদের ভাগ্যে জুটেনি। মুসলমানদের স্বাধীন এবং অবাধ পরামর্শক্রমে নয়, বরং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লোকেরা ক্ষমতাসীন হয়েছে। বায়আতের সাহায্যে ক্ষমতা লাভের পরিবর্তে ক্ষমতার সাহায্যে বায়আত হাসিল শরু হয়। বায়আত করা না করার ব্যাপারে মুসলমানরা স্বাধীন থাকেনি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং অধিষ্ঠিত থাকার জন্য বায়আত লাভ আর শর্ত হিসেবে গণ্য হয়নি। প্রথমত ক্ষমতা যার হাতে ন্যস্ত, তার হাতে বায়আত না করার ক্ষমতাই জনগণের থাকেনি। কিন্তু জনগণের বায়আত না করার অর্থ এ নয় যে, এর ফলে ক্ষমতাসীনের হাত থেকে ক্ষমতা অন্যত্র চলে যাবে।

মুসলমানদের স্বাধীন পরামর্শ ব্যতীত বাহুবলে যে খেলাফত বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আইনের দৃষ্টিতে তা সিদ্ধ কিনা—এখানে সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থা কি? যে পন্থায় খোলাফায়ে রাশেদীন খলীফা হয়েছেন, না যে পন্থায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং তৎপরবর্তীগণ খলীফা হয়েছেন? কোন কাজ করার জন্য ইসলাম আমাদেরকে একটি পন্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। দ্বিতীয় কোন পন্থায় কোন কাজ করা হলে কেবল এ জন্যই ইসলাম আমাদেরকে তা বরদাস্ত করার শিক্ষা দিয়েছে যে, তা পরিবর্তন এবং মূলোৎপাটনের চেষ্টা তার চেয়েও মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এ দুটো বিষয়কে একই সমতলে রেখে যদি দাবী করা হয় যে, দুটো পন্থাই ইসলামে সমান বৈধ, তাহলে বিরাট অবিচার করা হবে। প্রথম পন্থাটি কেবল বৈধই নয়, বরং ঈপ্সিতও বটে, দ্বিতীয়টি বৈধ হলেও সহ্যের সীমা পর্যন্ত পসন্দনীয়, ঈপ্সিত হিসেবে নয়।

দুই : খলীফাদের জীবনধারায় পরিবর্তন

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল এই যে, রাজতন্ত্রের সূচনালগ্ন থেকেই বাদশাবেশধারী খলীফারা কায়সার ও কেসরার অনুরূপ জীবনধারা অবলম্বন করে। মহানবী (সঃ) এবং চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন যে জীবনধারা অবলম্বন করেছিলেন, তারা তা পরিহার করে। তারা শাহী মহলে বসবাস শুরু করে। রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী (Royal Body guard) তাদের রাজপ্রাসাদের হেফাযতে নিয়োজিত হয় এবং সর্বদা তাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকে। তাদের এবং জনগণের মধ্যে দেহরক্ষী ও প্রহরী অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সরাসরি তাদের কাছে প্রজাদের পৌঁছা এবং প্রজাদের মধ্যে তাদের নিজেদের বসবাস ও চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য তারা অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কর্মচারীদের মাধ্যমে কোন সরকার কখনো সঠিক অবস্থা জানতে পারে না। আর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি নিজেদের প্রয়োজন এবং অভিযোগ পেশ করা প্রজাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। খোলাফায়ে রাশেদীন যে ধারায় শাসন কার্য পরিচালনা করতেন, এটা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত—একেবারেই তার পরিপন্থী। তাঁরা জনগণের মধ্যে বাস করতেন। সেখানে যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতো। তাঁরা হাট-বাজারে গমন করতেন এবং যে কোন ব্যক্তি তাঁদের সাথে কথা বলতে পারতো। তাঁরা জনগণের সাথে সারিবদ্ধ হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন এবং জুমার খোতবায় (অভিভাষণে) আল্লার যিকর এবং দ্বীনের শিক্ষার পাশাপাশি সরকারের নীতি সম্পর্কেও জনগণকে অবহিত করতেন। তাঁদের নিজেদের এবং সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের যেকোন অভিযোগের জবাব দিতেন তাঁরা। হযরত আলী (রাঃ) প্রাণের আশংকা

সত্ত্বেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কূফায় এ নিয়ম বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের সূচনা পর্ব থেকেই এ পন্থা ত্যাগ করে রোম-ইরানের মডেল গ্রহণ করা হয়। এ পরিবর্তনের সূচনা হয় হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর শাসনকাল থেকেই। পরে এ ধারা রীতিমতো এগিয়ে চলতে থাকে।

তিন ঃ বায়তুল মালের অবস্থার পরিবর্তন

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচীত হয় বায়তুল মালের ব্যাপারে খলীফাদের কর্মধারায়।

বায়তুল মাল সম্পর্কিত ইসলামী নীতি এই ছিল যে, তা খলীফা এবং তাঁর সরকারের নিকট আল্লাহ এবং জনগণের আমানত। একে কারো মর্জীমতো ব্যবহারের অধিকার নেই। খলীফা বেআইনীভাবে তাতে কিছু জমা করতে পারেন না, পারেন না তা থেকে বে-আইনীভাবে কিছু ব্যয়ও করতে। এক একটি পাই পয়সার আয়-ব্যয়ের জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়। মাঝারী ধরনের জীবন যাপনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকু গ্রহণ করার অধিকার আছে তার।

রাজতন্ত্রে বায়তুল মালের এ নীতি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বায়তুল মাল বাদশা ও শাহী বংশের মালিকানাধীন হয়ে পড়ে। প্রজারা পরিণত হয় বাদশার নিছক করদাতায়। সরকারের নিকট হিসেব চাওয়ার কারো অধিকারই থাকে না। এ সময় বাদশাহ এবং শাহযাদাদের এমনকি তাদের গবর্ণর এবং সিপাহসালারদের (সেনাপতিদের) জীবন যে শান-শওকতের সাথে নির্বাহ হয়ে থাকে, তা বায়তুল মালকে অন্যায়ভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) তাঁর শাসনামলে শাহযাদা এবং আমীর-ওমরাদের অবৈধ সম্পত্তির হিসেব নিতে থাকেন। এ সময় তিনি পিতা আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ানের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজের বাৎসরিক ৪০ হাযার দিনার আয়ের সম্পত্তিও বায়তুল মালে ফেরত দেন। এ সম্পত্তির মধ্যে 'ফাদাক' বাগানও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মহানবী (সঃ)–এর পরে সকল খলীফার শাসনামলে বায়তুল মালের অধিকারে ছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ) তা রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর মীরাস হিসেবে তাঁর কন্যাকে দিতেও অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর শাসনামলে এ সম্পত্তি নিজের মালিকানায় এবং তদীয় বংশধরদের মীরাসে পরিণত করেন।[২]

এ হচ্ছে বায়তুল মাল থেকে ব্যয়ের ব্যাপারে তাদের নীতি। এবার বায়তুল মালের আয়ের বিষয়টি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ ব্যাপারেও তাঁদের কাছে হালাল-হারামের কোন তারতম্য ছিল না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের পূর্বসূরী উমাইয়া শাসকরা প্রজাদের নিকট থেকে যে সকল অবৈধ ট্যাক্স আদায় করেছিল, তিনি এক ফরমানে সে সবের একটি ফিরিস্তি দিয়েছিলেন।[৩] বায়তুল মালের আয়ের ক্ষেত্রে তারা শরীয়াতের বিধান কিভাবে লংঘন করে চলছিল, উক্ত তালিকা পাঠে তা অনুমান করা যায়।

এ ব্যাপারে যে বৃহত্তম যুলুমটির সন্ধান পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে এই যে, যেসব অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতো, তারা নিছক জিযিয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছে—এ

---

২. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৪ ; আল-বেদায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০০-২০৮।
৩. আত-তাবারী, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা—৩২১, ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা—১৬৩।

অজুহাতে তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা হতো। অথচ এ জিযিয়া আরোপের আসল কারণটি ছিল এই যে, ইসলাম বিস্তারের ফলে তারা বায়তুল মালের আয় হ্রাস পাওয়ার আশংকা করতো। ইবনুল আসীর বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (ইরাকের ভাইসরয়)-কে তাঁর গবর্ণররা লিখলেন ঃ "জিম্মীরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করে বসরা এবং কূফায় বসতি স্থাপন করছে। এর ফলে জিযিয়া এবং খারাজের আমদানী হ্রাস পাচ্ছে।" জবাবে হাজ্জাজ ফরমান জারী করলেন ঃ "তাদেরকে শহর থেকে বহিষ্কার করা হোক এবং পূর্ববৎ তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা হোক। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে বসরা ও কূফা থেকে বহিষ্কার করার সময় যখন তারা "হে মুহাম্মাদ !" "হে মুহাম্মাদ !" বলে চিৎকার করে কাঁদছিল তখন সমগ্র এলাকায় যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, তা বর্ণনা করা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তারা বুঝতে পারছিল না কোথায় গিয়ে তারা এ যুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাবে। কূফা ও বসরার আলেম ও ফকীহগণ এ অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলেন এবং নওমুসলিমরা যখন কাঁদতে কাঁদতে শহর ত্যাগ করছিল, তখন আলেম-ফকীহরাও তাদের ক্রন্দনে শরীক হচ্ছিলেন।[৪] হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয খলীফা হলে খোরাসানের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে যে, ইসলাম গ্রহণকারী হাযার হাযার লোকের ওপর জিযিয়া আরোপ করা হয়েছে। ওদিকে গবর্ণরের গোত্র ও জাতি বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তিনি প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন ; "আমার স্বজাতির একজন লোক অন্য একশ ব্যক্তির চেয়েও আমার নিকট প্রিয়।" এ অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি আল-জাররাহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাকামীকে খোরাসানের গবর্ণরের পদ থেকে বরখাস্ত করেন। তিনি তাঁর ফরমানে লিখেন ঃ "আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আহ্বানকারী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন—তহশীলদার হিসেবে নয়।"[৫]

চার ঃ মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতার অবসান

এ যুগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল, মুসলমানদের আমর বিল মারুফ ও নাহই আনিল মুনকার—ভাল কাজের নির্দেশ দান এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ—করার স্বাধীনতা হরণ। অথচ ইসলাম এটাকে কেবল মুসলমানদের অধিকারই নয়, বরং ফরয বা কর্তব্য বলে স্থির করে দিয়েছিল। জাতির সচেতন বিবেক জনগণের বাক-স্বাধীনতা, যে কোন অন্যায় কাজে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রকাশ্যে সত্য কথা বলার স্বাধীনতার ওপরই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল ছিল। খেলাফতে রাশেদার আমলে জনগণের এ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন এ জন্য শুধু অনুমতিই দিতেন না, বরং এ জন্য জনগণকে উৎসাহিতও করতেন। তাঁদের শাসনামলে সত্যভাষীর কণ্ঠরোধ করা হতো না ; বরং এ জন্য তাঁরা প্রশংসা এবং অভিনন্দন লাভ করতেন। সমালোচকদেরকে দাবিয়ে রাখা হতো না, তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগে বিবেকের ওপর তালা লাগান হয়, মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রশংসার জন্য মুখ খোল অন্যথায় চুপ থাকো—এটাই তখন রীতিতে পরিণত হয়। যদি তোমার বিবেক এতই শক্তিশালী হয় যে, সত্য ভাষণ থেকে

৪. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা—৭৯।

৫. আত-তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩১৪। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৮। আল বেদায়া, ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা—১৮৮।

তুমি নিবৃত্ত থাকতে না পারো তাহলে কারাবরণ, প্রাণদণ্ড ও চাবুকের আঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। তাই সে সময়ে যারা সত্য ভাষণ এবং অন্যায় কাজে বাধা দান থেকে নিবৃত্ত হননি, তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি দেয়া হয়েছে। সমগ্র জাতিকে আতংকিত করাই ছিল এর লক্ষ্য।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর শাসনামলে আল্লার রাসূলের সাহাবী একজন সাধক ও ইবাদাতগুযার, এবং উম্মাতের সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হযরত হুজর ইবনে আদীর হত্যার (৫১ হিজরী) মাধ্যমে এ নতুন পলিসীর সূচনা হয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর শাসনামলে খোতবায় প্রকাশ্য মিম্বারে হযরত আলী (রাঃ)–এর লানত (অভিসম্পাত) এবং গালিগালাযের সিলসিলা শুরু হলে সকল সাধারণ মুসলমানের হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অতি কষ্টে সবরের পেয়ালা পান করে তারা চুপ করে থাকতেন। কূফায় হুজর ইবনে আদী তা সহ্য করতে পারেননি। তিনি হযরত আলী (রাঃ)–এর প্রশংসা এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর নিন্দা শুরু করেন। হযরত মুগীরা (রাঃ) যতদিন কূফার গবর্ণর ছিলেন, ততদিন তিনি ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু পরে বসরার সাথে কূফাকেও যিয়াদের গবর্ণরীর অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যিয়াদ খোতবায় হযরত আলী (রাঃ)–কে গালি দিতেন, আর হুজর (রাঃ) দাঁড়িয়ে তার জবাব দিতেন। এ সময় তিনি একবার জুমার সালাতে বিলম্বের জন্যও যিয়াদের সমালোচনা করেন। অবশেষে যিয়াদ ১২ জন সঙ্গী সহ তাঁকে গ্রেফতার করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন ঃ তিনি একটি গুপ্তবাহিনী গঠন করেছেন, খলীফাকে প্রকাশ্যে গালী দেন, আমিরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে লড়াই–এর আহ্বান জানাচ্ছেন এবং আলী (রাঃ)–এর বংশধর ব্যতীত অন্য কারো জন্য খেলাফত জায়েয নয় বলে দাবী করেছেন। তিনি শহরে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন এবং আমিরুল মুমিনীনের গবর্ণরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আবু তোরাব [হযরত আলী (রাঃ)]–কে সমর্থন করেন, তাঁর জন্য রহমত কামনা করেন এবং তাঁর বিরোধীদের থেকে দূরে থাকেন। এ অভিযোগের স্বপক্ষে কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়। কাযী শুরাইহ্‌কেও অন্যতম সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু তিনি এক পৃথক পত্রে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–কে লিখে পাঠান ঃ "আমি শুনতে পেলাম, আপনার নিকট হুজর ইবনে আদীর বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে, আমার নামও তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে আমার সত্যিকার সাক্ষ্য এই যে, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, নিয়মিত হজ্জ ও ওমরাহ করে, ভাল কাজের নির্দেশ দান করে. অন্যায় কার্য থেকে বারণ করে, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রক্ত ও সম্পদ সম্মানার্হ—হারাম। আপনি ইচ্ছা করলে তাঁকে হত্যা করতে পারেন অথবা ক্ষমা করে দিতে পারেন।"

এমনিভাবে এ অভিযুক্তকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। হত্যার পূর্বে জল্লাদরা তাঁর সামনে যে কথাটি পেশ করে তা হচ্ছে, তুমি আলীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করলে তোমাকে মুক্তি দান, অন্যথায় হত্যা করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি তা করতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন— "আমি মুখে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারি না, যা আমার রবকে অসন্তুষ্ট করে।" অবশেষে ৭ জন সঙ্গী সহ তাঁকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে হাস্‌সানকে হযরত মুআবিয়া

(রাঃ) যিয়াদের নিকট ফেরত পাঠান। তিনি যিয়াদকে লিখেন, একে নৃশংসভাবে হত্যা কর। যিয়াদ তাঁকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেন।[৬]

এ ঘটনা উম্মাতের সকল সাধু সজ্জনের হৃদয়ে নাড়া দেয়। হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমর এবং আয়েশা (রাঃ) এ খবর শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে এ কাজ থেকে বিরত করার জন্য আগেই চিঠি লিখেছিলেন। পরে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি বলেন ঃ 'মুআবিয়া! হুজরকে হত্যা করতে গিয়ে তুমি আল্লাকে এতটুকুও ভয় করলে না?' হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে খোরাসানে নিযুক্ত গভর্ণর রবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী এ খবর শুনে চিৎকার করে ওঠেন ঃ 'হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞান অনুযায়ী আমার মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ সৎকর্মশীলতাও অবশিষ্ট থাকে, তা হলে আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নাও।'[৭] হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন ঃ হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর চারটি কাজ এমন যে, কেউ তন্মধ্যে একটি কাজ করলেও তা হবে তার জন্য ক্ষতিকর। এক ঃ মুসলিম উম্মাতের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ এবং পরামর্শ ব্যতীত শাসন ক্ষমতা অধিকার করা। অথচ উম্মাতের মধ্যে অবশিষ্ট সাহাবীরা বর্তমান ছিলেন। দুই ঃ আপন পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করা। অথচ সে ছিল মদ্যপ এবং নেশাখোর ; সে রেশমী বস্ত্র পরিধান করতো এবং তাম্বুরা বাজাত। তিন ঃ যিয়াদকে আপন পরিবারভুক্ত করা ; অথচ আল্লার রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, শিশু তার, যার শয্যায় সে জন্মগ্রহণ করবে, আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর-কংকর।[৮] চার ঃ হুজর এবং তাঁর সাথীদের হত্যা করা।[৯]

এরপর থেকে যুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠ স্তব্ধ করার ধারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মারওয়ান ইবনুল হাকাম মদীনার গভর্ণর থাকাকালে হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) তার এক কথার জবাবে 'আপনি অন্যায় কথা বলেছেন'—এ বাক্য উচ্চারণ করায় তাকে লাথি মারেন।[১০] হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে খোতবা দীর্ঘ করা এবং জুমার সালাতে অস্বাভাবিক বিলম্ব করার জন্য সমালোচনা করলে তিনি বলেন ঃ 'আমার মন চায়, যে মাথায় তোমার চক্ষুদ্বয় রয়েছে তাতে আঘাত করি।'[১১] আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হিজরী ৭৫ সালে মদীনা গমন করলে আল্লার রাসূলের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন ঃ

---

৬. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য তবারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯০—২০৭ পৃষ্ঠা, আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, ২৩৪—২৪২ পৃষ্ঠা। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, ৫০—৫৫ পৃষ্ঠা এবং ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৭. আল-ইস্তিআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৫। তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০৮।
৮. পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
৯. ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪২। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩০।
১০. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫৩।
১১. আল-ইস্তীআব পৃষ্ঠা—৩৬৯। তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮৪।

"তরবারী ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে আমি এ উম্মাতের ব্যাধির চিকিৎসা করবো না।........এখন কেউ যদি আমাকে বলে, আল্লাকে ভয় করো, তাহলে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করবো।"[১২]

ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক একবার জুমার খোতবা এতটা দীর্ঘ করেন, যার ফলে সালাতের সময়ই শেষ হওয়ার উপক্রম হয়। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ " আমিরুল মুমিনীন। সময় আপনার জন্য অপেক্ষা করবে না, আর সালাত এত বিলম্ব করার জন্য আপনি আল্লার সামনে কৈফিয়ত পেশ করতে পারবেন না।" ওয়ালিদ জবাবে বলেন ঃ "বটে, তুমি ঠিকই বলেছো ; কিন্তু তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেটা এহেন স্পষ্টভাষীর স্থান নয়।" রাজকীয় দেহরক্ষী তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে জান্নাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে।[১৩]

এ নীতি মুসলমানদেরকে ধীরে ধীরে ভীরু এবং সুবিধাবাদী করে তোলে। বিপদ মাথায় পেতে নিয়ে সত্য কথা বলার লোক হ্রাস পেতে থাকে। তোষামোদ এবং বিবেক বিক্রয়ের মূল্য বাজারে বৃদ্ধি পায় এবং সত্যপ্রীতি ও ন্যায়নীতির মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন, ঈমানদার এবং বিবেকবান ব্যক্তিরা সরকার থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। জনগণের জন্য দেশ এবং দেশের কাজ কারবারে কোন প্রকার আকর্ষণই আর থাকে না। এক সরকার আসে, আর এক সরকার যায়, কিন্তু জনগণ কেবল এ গমনাগমনের রঙ্গমঞ্চে দর্শকে পরিণত হয়। এ নীতি জনগণের মধ্যে যে চরিত্র সৃষ্টি করতে থাকে, হযরত আলী ইবনে হুসাইনের (ইমাম যয়নুল আবেদীন) সাথে সংঘটিত একটি ঘটনাই তার প্রমাণ। তিনি বলেন ঃ কারবালার শোকাবহ ঘটনার পর কোন এক ব্যক্তি গোপনে আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান, তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর আপ্যায়ন করেন। তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, তিনি আমাকে দেখে সর্বদা কাঁদতেন আর আমি মনে করতাম আমার জন্য একমাত্র এ ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বস্ততা আছে। ইতিমধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ঘোষণা শোনা যায় ঃ "আলী ইবনে হুসাইনকে যে কেউ আমাদের কাছে পাকড়াও করে আনবে, তাকে তিনশ দিরহাম 'এনাম' দেয়া হবে।" এ ঘোষণা শুনেই সে ব্যক্তি আমার কাছে আসে। সে আমার হাত বাঁধছিল আর দরবিগলিত ধারায় কেঁদে চলছিল। এ অবস্থায় সে আমাকে ইবনে যিয়াদের হাতে সোপর্দ করে 'এনাম' গ্রহণ করে।[১৪]

পাঁচ ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অবসান

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ছিল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। খেলাফতে রাশেদায় খলীফারাই বিচারপতিদের (কাযী) নিয়োগ করলেও আল্লার ভয় এবং নিজের জ্ঞান ও বিবেক ব্যতীত অন্য কিছুরই চাপ এবং প্রভাব খাটাতো না তাঁর ওপর। কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই আদালতের কাজে হস্তক্ষেপের সাহস করতে পারতো না। এমনকি, কাযী স্বয়ং খলীফার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারতেন

১২. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪১-১০৪। আল-জাস্সাস ঃ আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮২। ফওয়াতুল ওয়াফাইয়াত, মুহাম্মাদ ইবনে শাকের আল-কুতাবী, ২য় খণ্ড, পষ্ঠা—৩৩, সাআদাত প্রেস, মিসর।

১৩. ইবনু আবদে রাব্বিহী আল-ইকদুল ফরীদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬২, কায়রো—১৯৪০।

১৪. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১২।

এবং দিতেনও। কিন্তু রাজতন্ত্রের আগমনে অবশেষে এ নীতিরও অবসান ঘটতে থাকে। যেসব ব্যাপারে এ বাদশাহ্ প্যাটার্ণের খলীফাদের রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল, সেসব ব্যাপারে সুবিচার করার ক্ষেত্রে আদালতের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। এমনকি শাহ্যাদা, গবর্ণর, নেতা–কর্তা ব্যক্তি এবং রাজমহলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলায় সুবিচার করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে সময়ের সত্যাশ্রয়ী আলেমদের সাধারণত বিচারকের আসন গ্রহণে রাযী না হওয়ার এটাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ আর যেসব আলেম এ শাসকদের পক্ষ থেকে বিচারকের আসন গ্রহণ করতে রাযী হতেন, জনগণ তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। বিচার বিভাগের ওপর শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, বিচারপতিদের নিয়োগ এবং বরখাস্তের ইখতিয়ার দেয়া হয় গবর্ণরদেরকে।[১৫] অথচ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলীফা ছাড়া কারোর এ অধিকার ছিল না।

ছয় : শূরাভিত্তিক সরকারের অবসান

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ছিল, রাষ্ট্র শাসিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে আর পরামর্শ নেয়া হবে এমন সব লোকের, যাদের তত্ত্ব জ্ঞান, তাকওয়া, বিশ্বস্ততা এবং নির্ভুল ও ন্যায়নিষ্ঠ মতামতের ওপর জনগণের আস্থা রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরা তাঁদের পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন পরিপূর্ণ দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী। নিজেদের জ্ঞান এবং বিবেক অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তাঁরা নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করতেন। তাঁরা কখনো সরকারকে ভুল পথে পরিচালিত হতে দেবেন না—গোটা জাতির এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ছিল। এদেরকেই স্বীকার করা হতো সমগ্র মুসলিম উম্মাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু রাজতন্ত্রের আগমনে এ নীতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যক্তি একনায়কত্ব শূরার স্থান অধিকার করে। বাদশাহরা সত্যসন্ধ ও নির্ভীক–কণ্ঠ জ্ঞানীদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়। আর জ্ঞানীরাও তাদের কাছ থেকে সরে আসে। এভাবে যেসব স্বাধীন ও ন্যায়–নিষ্ঠ মতামতের অধিকারীদের যোগ্যতা, সততা এবং ন্যায়–নিষ্ঠার ওপর জনগণের আস্থা ছিল, তাদের পরিবর্তে গবর্ণর, সেনাপতি, রাজবংশীয় আমীর–ওমরাহ ও দরবারের সভাসদগণই ছিল বাদশাহের পরামর্শদাতা।

এর ফলে যে বৃহত্তম ক্ষতি সাধিত হয় তা হচ্ছে এই যে, একটি ক্রমবর্ধমান তামাদ্দুনে যে সকল শাসনতান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয়, সে সবের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার মতো কোন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানই আর অবশিষ্ট থাকলো না। থাকলো না এমন কোন সংস্থা, যার সম্মিলিত বা সর্বসম্মত ফায়সালা ইসলামী আইনের অংশ হতে পারে এবং দেশের সমস্ত ফায়সালা অনুযায়ী সমস্যার নিষ্পত্তি করতে পারে। রাষ্ট্রের নিয়ম–শৃংখলা, গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সমস্যা ও সাধারণ নিয়ম–নীতির ব্যাপারে সকল রাজকীয় কাউন্সিল ভাল–মন্দ ফায়সালা করলেও শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলির সমাধান করা তাদের সাধ্যায়ত্ব ছিল না। তারা এ সকল সমস্যা সমাধানের সাহস করলেও উম্মাতের সম্মিলিত বিবেক তা আত্মস্থ ছিল না। নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে তারা নিজেরাও অবহিত ছিল, আর উম্মাতও তাদেরকে ফাসেক ফাজের মনে করতো। তাদের এমন কোন ধর্মীয়

১৫. আস–সূয়ুতী : হুসনুল মুহাযারা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৮। আল–মাতবায়াতুশ শারকিয়া, মিসর,১৩২৭ হিজরী।

এবং নৈতিক মর্যাদা ছিল না, যাতে তাদের ফায়সালা ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আলেম ও ফকীহ্গণ এ শূন্যতা পূরণের চেষ্টায় ত্রুটি করেননি, কিন্তু তাঁদের এ চেষ্টা ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ের। আলেমগণ তাঁদের দরস ও ফতোয়ার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক বিধান ব্যক্ত করতেন, আর বিচারকগণ তাঁদের জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইজতিহাদ অনুযায়ী অথবা অন্য কোন আলেমের যেসব ফতোয়াকে আইন মনে করতেন, সেগুলো অনুযায়ী ফায়সালা করতেন। এর ফলে আইনের ধারাবাহিকতা এবং ক্রমবিকাশে শূন্যতা দেখা দেয়নি, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে আইনগত অরাজকতা দেখা দেয়। গোটা এক শতাব্দী কাল উম্মাতের নিকট এমন কোন নীতিমালা ছিল না, যাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে দেশের সকল আদালত সেই অনুযায়ী খুঁটি–নাটি ব্যাপারে একই ধরনের ফায়সালা করতে পারে।

সাত ঃ বংশীয় এবং জাতীয় ভাবধারার উদ্ভব

রাজতন্ত্রের যুগে অপর যে বিরাট পরিবর্তন সূচীত হয়, তা ছিল এই যে, ইসলাম জাহেলী যুগের যেসব জাতি, বংশ–গোত্র ইত্যাদির ভাবধারা নিশ্চিহ্ন করে আল্লার দ্বীন গ্রহণকারী সকল মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে এক উম্মাতে পরিণত করেছিল, রাজতন্ত্রের যুগে তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বনী উমাইয়্যা সরকার শুরু থেকেই আরব সরকারের রূপ ধারণ করেছিল, আরব মুসলমানদের সাথে অনারব মুসলমানদের সমান অধিকারের ধারণা এ সময় প্রায় অনুপস্থিত ছিল। ইসলামী বিধানের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে নওমুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করার কথা আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি। এর ফলে কেবল ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রেই মারাত্মক অন্তরায় দেখা দেয়নি ; বরং অনারবদের মনে এ ধারণাও দেখা দিয়েছে যে, ইসলামের বিজয় মূলত তাদেরকে আরবদের গোলামে পরিণত করেছে। ইসলাম গ্রহণ করেও তারা এখন আর আরবদের সমান হতে পারে না। কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না এ আচরণ। শাসনকর্তা, বিচারপতি—এমনকি সালাতের ইমাম নিযুক্ত করার বেলায়ও দেখা হতো, সে আরব, না অনারব। কূফায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্দেশ ছিল, কোন অনারবকে যেন সালতে ইমাম না করা হয়।[১৬] হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের গ্রেফতার হয়ে এলে হাজ্জাজ তাঁকে খোঁটা দিয়ে বলেন, আমি তোমাকে সালাতে ইমাম নিযুক্ত করেছি অথচ এখানে আরব ছাড়া কেউ ইমামতী করতে পারে না।[১৭] ইরাকে নিবতীদের হাতে মোহর লাগান হয়। বসরা থেকে বিপুল সংখ্যক অমুসলিমদের বহিষ্কার করা হয়।[১৮] হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের–এর মতো বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন আলেমকে যাঁর পর্যায়ের আলেম তদানিন্তন মুসলিম জাহানে দু'চারজনের বেশী ছিল না, কূফায় বিচারপতি নিযুক্ত করা হলে শহরে গুঞ্জন শুরু হয় যে, আরব ছাড়া কেউ বিচারপতির যোগ্য হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হযরত আবু মূসা আশআরীর পুত্র আবু বোর্দাকে কাযী নিযুক্ত করা হয়। ইবনে যুবায়েরের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কোন ফায়সালা না করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়।[১৯] এমনকি কোন অনারবকে জানাযার সালাত আদায় করবার জন্যও অগ্রবর্তী করা হতো না, যতক্ষণ একজন আরব শিশুও উপস্থিত থাকতো।[২০] কোন ব্যক্তি অনারব

---

১৬. আল–ইকদুল ফরীদ, ২য় খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ।
১৭. ইবনে খাল্লেকান ওয়াফাইয়াতুল আইয়াম, ২য় খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, কায়রো, ১৯৪৮।
১৮. আল–ইকদুল ফরীদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪১৬–৪১৭।
১৯. ইবনে খাল্লেকান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১১৫।
২০. আল–ইকদুল ফরীদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪১৩।

নওমুসলিম কন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলে কন্যার পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের নিকট পয়গাম না পাঠিয়ে পয়গাম পাঠাতে হতো তাদের পৃষ্ঠাপোষক আরব খান্দানের নিকট।[২১] দাসীর ঔরসে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য আরবদের মধ্যে হাজীন (ত্রুটিপূর্ণ) বলে একটা পরিভাষার প্রচলন ছিল। উত্তরাধিকারে তার হিসসা আরব স্ত্রীর সন্তানদের সমান হতে পারে না—এ ধারণা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল।[২২] অথচ শরীয়াতের দৃষ্টিতে উভয় ধরনের সন্তানদের অধিকার সমান। আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানীর বর্ণনা মতে বনু সুলাইমের এক ব্যক্তি জনৈক নওমুসলিম অনারবের নিকট তার কন্যা বিবাহ দিলে মুহাম্মাদ ইবনে বশীর আল-খারেজী মদীনা গমন করে গবর্ণরের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান, নওমুসলিমকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন এবং চুল-দাঁড়ি কামিয়ে তাকে অপদস্থ করেন।[২৩]

এ সকল কার্যকলাপের ফলে অনারবদের মধ্যে শুউবী (অনারবী জাতীয়তাবাদ) আন্দোলনের জন্ম হয়। আর এরই বদৌলতে খোরাসানে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। অনারবদের মনে আরবদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা-বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়, আব্বাসীয় প্রচারকরা তাকে আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আর এ আশায় তারা আন্দোলনে আব্বাসীয়দের সাথে যোগ দিয়েছিল যে, তাদের মাধ্যমে বিপ্লব সাধিত হলে তারা আরবদের দাপট খর্ব করতে সক্ষম হবে।

বনী উমাইয়াদের এ নীতি কেবল আরব-আজমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং আরবদের মধ্যেও তা কঠোর গোত্রবাদ সৃষ্টি করে। আদনানী ও কাহতানী, ইয়ামানী ও মুযারী, আয্দ ও তামীম, কালব ও কায়েসের মধ্যেকার সকল পুরাতন ঝগড়া নতুন করে সৃষ্টি হয় এ যুগে। সরকার নিজেই এক গোত্রকে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। আরব গবর্ণররা স্ব-স্ব এলাকায় নিজের গোত্রের লোকদেরকে অনুগৃহীত করতো, আর অন্যদের সাথে করতো বে-ইনসাফী। এ নীতির ফলে খোরাসানে ইয়ামানী এবং মুযারী গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এতটা চরমে পৌছে যে, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের আহ্বায়ক আবু মুসলিম খোরাসানী এ গোত্রদ্বয়কে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। হাফেজ ইবনে কাসীর আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে ইবনে আসাকের-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন ঃ যে সময় আব্বাসীয় বাহিনী দামেশক শহরে প্রবেশ করছিল, উমাইয়াদের রাজধানী তখন ইয়ামানী আর মুযারীদের গোত্রবাদ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এমনকি শহরের প্রতিটি মসজিদে দুটি পৃথক পৃথক মেহরাব ছিল। জামে মসজিদে দুজন ইমাম দুটি মিম্বারে খোৎবা দিতেন এবং দুটি জামাতের পৃথক পৃথক ইমামতি করতেন। এ দুটি দলের কেউ অন্য দলের সাথে সালাত আদায় করতেও প্রস্তুত ছিল না।[২৪]

আট ঃ আইনের সার্বভৌমত্বের অবসান

রাজতান্ত্রিক শাসনামলে মুসলমানদের ওপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ নিপতিত হয়, তা হচ্ছে

---

২১. আল-ইকদুল ফরীদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা—৪১৩।

২২. ইবনে কোতায়বা উয়ুনুল আখবার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬১, মিসর, ১৯২৮।

২৩. কিতাবুল আগানী, ১৪শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫০। আল-মাতবায়াতুল মিসরিয়্যা, বোলাক, মিসর, ১২৮৫ হিজরী।

২৪. আল-বেদায়া, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৫।

এই যে, সে সময় আইনের প্রাধান্যের নীতি ভঙ্গ করা হয়। অথচ তা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

ইসলাম যে ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, তা হচ্ছে এই যে, শরীয়াত সব কিছুর উর্ধে, সকলের ওপরে । রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক এবং শাসিত ছোট-বড়, সাধারণ এবং অসাধারণ সকলেই শরীয়াতের অধীন। কেউই শরীয়াতের উর্ধে নয়, নয় কেউ ব্যতিক্রম। শরীয়াত থেকে দূরে সরে কাজ করার অধিকার নেই কারো। শত্রু হোক কি মিত্র, যুদ্ধে লিপ্ত কাফের হোক বা চুক্তিবদ্ধ কাফের, মুসলিম প্রজা হোক বা যিম্মী প্রজা, রাষ্ট্রের অনুগত মুসলিম হোক বা যুদ্ধে লিপ্ত বিদ্রোহী— এক কথায় যেই হোক না কেন—তার সাথে আচরণ করার একটা রীতি শরীয়াতে নির্ধারিত রয়েছে। সে রীতি কোন অবস্থায়ই লংঘন করা যায় না।

খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের গোটা শাসনামলে এ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলেছিলেন। এমনকি, হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) অত্যন্ত নাজুক এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও শরীয়াতের সীমা লংঘন করেননি। এসব সত্যাশ্রয়ী খলীফাদের শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা শরীয়াত নির্ধারিত সীমা মেনে চলতো, যথেচ্ছাচারী ও বল্গাহীন ছিল না।

কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগে রাজা-বাদশাহরা ব্যক্তিস্বার্থ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং বিশেষ করে নিজেদের শাসন পাকা-পোক্ত করার ব্যাপারে শরীয়াত নির্ধারিত বিধি-বিধান লংঘন এবং তার সীমারেখা অতিক্রমে কুণ্ঠাবোধ করেনি। যদিও তাদের সময়েও দেশের আইন ইসলামী-ই ছিল, তাদের কেউই আল্লার কিতাব এবং রাসূলের সুন্নার আইনগত মর্যাদা অস্বীকার করেনি। এ আইন অনুযায়ী আদালত ফায়সালা করতো, সাধারণ পরিস্থিতিতে শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী সকল বিষয়ের মীমাংসা হতো। কিন্তু এ সকল বাদশাহের রাজনীতি দ্বীনের অনুবর্তী ছিল না। বৈধ অবৈধ সকল উপায়ে তারা রাষ্ট্রের দাবী মিটাতেন। এ ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পার্থক্য করতেন না। বনী উমাইয়ার বিভিন্ন খলীফাদের শাসনামলে আইনের বাধ্যবাধকতা কোন্ পর্যায়ে ছিল, এখানে আমরা তার উল্লেখ করবো।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামল থেকেই এই নীতির সূচনা হয়। ইমাম যুহরীর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং চারজন খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় মুসলমানদের মধ্যে এ নীতি চলে আসছিল যে, কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারতো না, আর মুসলমান হতে পারতো না কাফেরের ওয়ারিস। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর শাসনামলে মুসলমানকে কাফেরের ওয়ারিস করেছেন, কাফেরকে মুসলমানের ওয়ারিস করেননি। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এ বেদআতকে রহিত করেন। কিন্তু হিসাম ইবনে আবদুল মালেক তাঁর খান্দানের ঐতিহ্য পুনর্বহাল করেন।[২৫]

---

২৫. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড পৃষ্ঠা—১৩৯ ; ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩২।

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, রক্তপণের ব্যাপারেও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে বদলিয়ে দেন। সুন্নাত ছিল এই যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের মুক্তিপণ মুসলিমের সমান হবে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাকে অর্ধেক করে অবশিষ্ট অর্ধেক নিজে গ্রহণ করা শুরু করেন।[২৬]

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর শাসনামলে আর একটি নিকৃষ্টতম বেদআত চালু হয়। তিনি নিজে এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর গবর্ণররা মিম্বারে দাঁড়িয়ে খোতবায় হযরত আলী (রাঃ)–এর ওপর প্রকাশ্যে গাল–মন্দ শুরু করেন। এমনকি মসজিদে নববীতে রাসূলের মিম্বরে দাঁড়িয়ে একেবারে নবীজীর রওযার সামনে হুযুর (সঃ)–এর প্রিয়তম সাথী ও আত্মীয়কে গালি দেয়া হতো। আর হযরত আলী (রাঃ)–এর সন্তানরা এবং তাঁর নিকটতম আত্মীয়রা নিজেদের কানে এসব শুনতেন।[২৭] কারো মৃত্যুর পর তাকে গালি দেয়া শরীয়াত তো দূরের কথা, মানব সুলভ চরিত্রেরও পরিপন্থী। বিশেষ করে খোতবাকে এভাবে কলংকিত করা দ্বীন এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে আরও জঘন্য কাজ। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁর খান্দানের অন্যান্য খারাপ ঐতিহ্যের মতো এ ঐতিহ্যও পরিবর্তন করেন এবং জুমার খোতবায় হযরত আলী (রাঃ)–কে গাল–মন্দ দেয়ার পরিবর্তে এ আয়াত পাঠ শুরু করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ — النحل : ٩٠

---

২৬. আল–বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৯। ইবনে কাসীরের ভাষায় ঃ

وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَوَّلَ مَنْ قَصَرَهَا إِلَى النِّصْفِ وَأَخَذَ النِّصْفَ لِنَفْسِهِ -

মুআবিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি রক্তপণকে হ্রাস করে অর্ধেক করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক নিজে গ্রহণ করেছেন।

২৭. আত–তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮৮। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩৪ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৪। আল–বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫৯ ; ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা—৮০।

—নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুবিচার এবং সৌজন্যের নির্দেশ দেন, আর নির্দেশ দেন নিকটাত্মীয়দের দান করার আর বারণ করেন অশ্লীল ঘৃন্য কাজ এবং সীমা লঙ্ঘন করতে। তিনি তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।—আন-নাহল ঃ ৯০

গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারেও হযরত মুআবিয়া কিতাবুল্লাহ্ এবং সুন্নাতে রাসূলের স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিতাব এবং সুন্নার দৃষ্টিতে গণীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা করতে হবে এবং অবশিষ্ট চার অংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাঃ) গণীমাতের মাল থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য তাঁর জন্য পৃথক করে রাখার এবং অন্যান্য মাল শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী বন্টন করার নির্দেশ দান করেন।[২৮]

যিয়াদ ইবনে সুমাইয়্যার ব্যাপারটিও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর এমন সব কার্যাবলীর অন্যতম, যাতে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থে শরীয়াতের একটি সর্বসম্মত রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তায়েফে সুমাইয়্যা নাম্নী একজন দাসীর উদরে যিয়াদের জন্ম। লোকে বলে, জাহেলী যমানায় হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পিতা জনাব আবু সুফিয়ান সুমাইয়্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তার ফলে সে অন্তঃসত্বা হয়। হযরত আবু সুফিয়ানও একবার এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে, তাঁর বীর্যে যিয়াদের জন্ম। যৌবন-প্রাপ্ত হয়ে তিনি উন্নত মানের ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, সেনাধ্যক্ষ এবং অনন্য সাধারণ যোগ্যতার অধিকারী প্রমাণিত হন। ইনি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরাট সমর্থক ছিলেন এবং অনেক খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তাঁর পরে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাকে নিজের সমর্থক এবং সহায়ক করার জন্য তাঁর পিতার ব্যভিচারের সাক্ষ্য গ্রহণ করে প্রমাণ করেন যে, সে তাঁর পিতার অবৈধ সন্তান। আর এরই ভিত্তিতে তিনি তাকে নিজের ভাই এবং আপন পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর এ কার্য নৈতিক দিক থেকে কত ঘৃণ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । কিন্তু আইনের দৃষ্টিতেও এটা ছিল স্পষ্ট অবৈধ কাজ। কারণ শরীয়াতে ব্যভিচারের মাধ্যমে কোন নসব (বংশধারা) প্রমাণিত হয় না। আল্লার রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ঃ "শিশু যার বিছানায় ভূমিষ্ঠ হয় তার ; আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে প্রস্তরখণ্ড।" উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা এ জন্য তাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তার সাথে পর্দা করে চলেন।[২৯]

হযরত মুআবিয়া তাঁর গবর্ণরদেরকে আইনের উর্ধে স্থান দেন এবং তাদের বাড়াবাড়ির জন্য শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্পষ্টত অস্বীকৃতি জানান। তাঁর গবর্ণর আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে গাইলান একবার বসরার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খোতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর দিকে কংকর নিক্ষেপ করে। এতে তিনি তাকে গ্রেফতার করে তার হাত কেটে ফেলেন। অথচ শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী এটা এমন কোন অপরাধ ছিল না, যার জন্য কারো হাত কাটা যায়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর কাছে ফরিয়াদ করা হলে তিনি বলেন, আমি বায়তুল মাল থেকে হাতের

---

২৮. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৮-২৯। আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮৭। আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১১৮ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩৩। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৯।

২৯. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯৬ ; ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২২০-২২১ ; আল- বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৮। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭-৮।

দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) আদায় করবো।কিন্তু গবর্ণর থেকে প্রতিশোধ (কিসাস) গ্রহণের কোন উপায় নেই।[৩০] হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যিয়াদকে যখন বসরার সাথে কূফারও গবর্ণর নিযুক্ত করেন, তখন তিনি প্রথম বার খোতবা দেয়ার জন্য কূফার জামে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়ালে কিছু লোক তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ মসজিদের দরজা বন্ধ করে কংকর নিক্ষেপকারীদেরকে (যাদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৮০ পর্যন্ত বলা হয়) গ্রেফতার করিয়ে তাদের হাত কেটে ফেলেন।[৩১] তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। কোন আদালতেও হাযির করা হয়নি তাদেরকে। গবর্ণর নিছক প্রশাসনিক নির্দেশক্রমে এতগুলো লোককে হাত কাটার শাস্তি দেন, শরীয়াতে এ জন্য আদৌ কোন বিধান নেই । কিন্তু খলীফার দরবার থেকে বিষয়টির প্রতি কোন লক্ষ্যই দেয়া হয়নি। বুস্‌র ইবনে আরতাতও এর চেয়ে মারাত্মক নির্যাতনমূলক কাজ চালায়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এ ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম হেজায এবং ইয়ামানে পাঠান,হযরত আলী (রাঃ)-এর অধিকার থেকে এলাকা দু'টি মুক্ত করার জন্য, পরে হামাদান অধিকারের জন্য তাকে নির্দেশ দেন। সে ইয়ামানে হযরত আলী (রাঃ)-এর গবর্ণর ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ২টি ছোট শিশুকে হত্যা করে। পুত্রশোকে শিশুদের মাতা পাগল হয়ে যায়। এ যুলুম দেখে বনী কেনানার জনৈক মহিলা চিৎকার করে ওঠে—'তুমি পুরুষদেরকে হত্যা করেছো। এখন শিশুদের কি অপরাধে হত্যা করছো? জাহেলীযুগেও তো শিশুদের হত্যা করা হতো না। ইবনে আরতাত শোন, শিশু-বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা, নিষ্ঠুরতা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া যে সরকার টিকে থাকতে পারে না, তার চেয়ে নিকৃষ্ট কোন সরকার নেই।'[৩২] এরপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এ অত্যাচারী ব্যক্তিকে হামাদানে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। তখন হামাদান হযরত আলী (রাঃ)-এর অধিকারে ছিল। সেখানে সে অন্যান্য বাড়াবাড়ীর সাথে আরও একটি বিরাট অন্যায় করে বসে। যুদ্ধে যে সকল মুসলিম মহিলাকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে, তাদেরকে দাসীতে পরিণত করে।[৩৩] অথচ শরীয়াতে আদৌ এ রকম কোন বিধান নেই। গবর্ণর এবং সিপাহসালারদেরকে এখন যুলুম-নির্যাতনের অবাধ অধিকার দেয়া হয়েছে, আর শরীয়াতের ব্যাপারে তারা এখন আর কোন সীমারেখা মেনে চলতে রাযী নয়—এসব কার্যকলাপ ছিল এ কথারই বাস্তব ঘোষণা।

মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে স্থানান্তরে প্রেরণ এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় লাশের অবমাননা করার পাশবিক ধারা—জাহেলী যুগে যা চালু ছিল এবং ইসলাম যাকে নির্মূল করেছিল—তা এ যুগে আবার শুরু হয়।

ইসলামের আবির্ভাবের পর সর্ব প্রথম হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)-এর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) তাঁর মুসনাদে নির্ভুল সনদসহ বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে সাআদ (রাঃ) তাবাকাতেও তা উদ্ধৃত করেছেনঃ 'সিফ্‌ফীন যুদ্ধে হযরত আম্মার (রাঃ)-

---

৩০. ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪৮। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭১।

৩১. আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭৫। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২২৮।

৩২. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৫, আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৭। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯৩। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৯০।

৩৩. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৫। ইবনে আবদুল বার বলেনঃ এই প্রথম বার মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত মহিলাদেরকে দাসীতে পরিণত করা হয়।

এর মস্তক খণ্ডিত করে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর কাছে হাযির করা হয়। এ সময় দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। উভয়েরই দাবী ছিল—আমি আম্মারকে হত্যা করেছি।[৩৪]

এরপর আল্লার রাসূলের অন্যতম সাহাবী আমর ইবনুল হামেক (রাঃ)-এর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হয়। আল্লার রাসূলের সাহাবী হলেও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যায় তিনিও অংশ গ্রহণ করেন। যিয়াদ ইরাকের গবর্ণর থাকা কালে তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হয়। তিনি পলায়ন করে একটি গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানে সাপের দংশনে তিনি মারা যান। পিছু ধাওয়াকারীরা মৃতদেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে যিয়াদের নিকট উপস্থিত করে। তিনি এ খণ্ডিত মস্তক দামেশকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে তা রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শনীর পর তার স্ত্রীর কোলে নিক্ষেপ করা হয়।[৩৫]

এমনি বর্বরোচিত আচরণ করা হয় মিসরে নিযুক্ত হযরত আলী (রাঃ)-এর গবর্ণর মুহাম্মাদ ইবনে আবুবকর (রাঃ)-এর সাথে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মিসর অধিকার করার পর তাঁকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন এবং মৃত গাধার চামড়ায় জড়িয়ে তাঁর লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়।[৩৬]

এরপর থেকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ হিসেবে যাদেরকে হত্যা করা হয়, তাদের লাশকেও ক্ষমা না করা একটি স্বতন্ত্র রীতিতে পরিণত হয়। হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কারবালা থেকে কূফা এবং কূফা থেকে দামেশকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তাঁর লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দেয়া হয়।[৩৭]

ইয়াযিদের শাসনকাল পর্যন্ত হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বনী উমাইয়্যাদের সমর্থক ছিলেন। মারওয়ানের শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে সমর্থন করার অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর মস্তক কর্তন করে তাঁর স্ত্রীর কোলে ছুঁড়ে দেয়া হয়।[৩৮]

হযরত মুসআব ইবনে যুবায়ের-এর মস্তক কূফা এবং মিসরে প্রদক্ষিণ করানো হয়। তারপর দামেশক নিয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর সিরিয়ার নগরে নগরে তা প্রদক্ষিণ

---

৩৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং—৬৫৩৮; ৬৯২৯। দারুল মাআরেফ, মিসর, ১৯৫২। তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫৩।

৩৫. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫। আল-ইস্তীআব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৪০। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৮। তাহযীবুত-তাহযীব, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪।

৩৬. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩৫। আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭৯। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮০। ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৮২।

৩৭. আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১,৩৫৬। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা—২৯৬-২৯৮। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭৯-১৯২।

৩৮. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৩। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪৫।

করাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্বয়ং আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের স্ত্রী আতেকা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া নিজে এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করে বলেন ঃ "এ যাবৎ যা কিছু করেছ, তাতেও কি তোমাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়নি? এখন আবার তার প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছ কেন?" অতঃপর মস্তক নামিয়ে গোসল দিয়ে দাফন করা হয়।[৩৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের এবং তাঁর সাথী আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান এবং ওমারা ইবনে হাযম-এর সাথে এর চেয়েও কঠোর, বর্বরোচিত এবং জাহেলী যুগের আচরণ করা হয়। দেহ থেকে তাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে মক্কা থেকে মদীনা, মদীনা থেকে দামেস্ক নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানে স্থানে প্রদর্শনী করা হয়। তাদের দেহ মক্কায় কয়েকদিন যাবত শূলিতে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। পচে-গলে যাওয়া পর্যন্ত তা এ অবস্থায় ছিল।[৪০]

যাদের লাশের সাথে এহেন আচরণ করা হয়, তারা কোন স্তরের লোক ছিলেন, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম কি কোন অমুসলিমের সাথেও এহেন আচরণের অনুমতি দিয়েছে?

ইয়াযীদের শাসনকালে

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে রাজনীতিকে দ্বীনের উর্ধে স্থান দান এবং রাজনৈতিক স্বার্থে শরীয়াতের সীমা লংঘনের যে ধারা শুরু হয়েছিল, তাঁর নিজের নিয়োজিত উত্তরাধিকারী ইয়াযীদের শাসনকালে তা আরও নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌছে। তাঁর শাসনামলে এমন তিনটি ঘটনা ঘটে, যা গোটা মুসলিম জাহানকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছে।

প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে সাইয়্যেদেনা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনা। সন্দেহ নেই, ইরাকের জনগণের আহবানে ইয়াযীদের সিংহাসন ভেঙ্গে খান খান করার উদ্দেশ্যে তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন আর ইয়াযীদের সরকারও তাঁকে বিদ্রোহী বলেই মনে করতো। ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁর এ বিদ্রোহ বৈধ কিনা?[৪১] ক্ষণিকের জন্য আমরা এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাবো। অবশ্য তাঁর এ বিদ্রোহ অবৈধ ছিল, তিনি একটি হারাম কার্য করতে যাচ্ছিলেন—তাঁর জীবদ্দশায় এবং জীবনাবসানে একজন সাহাবী বা তাবেয়ী এমন কথা বলেছেন, তা আমাদের জানা নেই। সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে বারণ করেছিলেন, তাঁরা করেছিলেন এ জন্য যে, দূরদর্শীতার বিচারে তা সমীচীন নয়। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, এ ব্যাপারে ইয়াযীদ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিই নির্ভুল। তাহলেও তিনি সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন না। তাঁর সাথে ছিল, তাঁর ছেলে-মেয়ে, পরিবার পরিজন ; আর ছিল ৩২ জন আরোহী এবং ৪২ জন পদাতিক । কোন ব্যক্তি একে সামরিক অভিযান বলতে পারে না। তাঁর মুকাবিলায় ওমর ইবনে সাআ'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে কুফা থেকে যে বাহিনী

---

৩৯. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৪। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫।

৪০. আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫৩, ৩৫৪। আত-তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৩, ৩৪। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৩২। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৯।

৪১. এ ব্যাপারে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ব্যক্ত করেছি 'মহররমের শিক্ষা' পুস্তিকায়। তা ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রেরণ করা হয়, তার সংখ্যা ছিল ৪ হাযার। একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে এত বিরাট বাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না তাকে হত্যা করার। ঘেরাও করে সহজেই তারা ক্ষুদ্র দলটিকে গ্রেফতার করতে পারতো। এ ছাড়া হযরত হুসাইন (রাঃ) শেষ সময় যা কিছু বলেছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, আমাকে ফিরে যেতে দাও, অথবা কোন সীমান্তের দিকে চলে যেতে দাও অথবা ইয়াযীদের নিকট নিয়ে যাও। কিন্তু এর কোন একটিও স্বীকার করা হয়নি বরং পীড়াপীড়ি করা হয় যে, আপনাকে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রাঃ)-এর (কূফার গবর্ণর) নিকট যেতে হবে। হযরত হুসাইন (রাঃ) নিজেকে ইবনে যিয়াদের নিকট সোপর্দ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে তিনি যে আচরণ করেছেন, তা তাঁর জানা ছিল। অবশেষে তাঁর সাথে যুদ্ধ করা হয়। তাঁর সঙ্গীরা সকলেই শহীদ হয়েছেন, যুদ্ধের ময়দানে একা কেবল তিনিই রয়েছেন— এমন সময়ও তাঁর ওপর আক্রমণ করাকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয় । তিনি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাঁকে জবাই করা হয়। তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, সবই খুলে ফেলা হয়, এমনকি তাঁর লাশ থেকে কাপড়ও খুলে ফেলা হয়। এবং পরে তাঁকে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করা হয়। এরপর তাঁর অবস্থান-স্থল লুট করা হয় এবং মহিলাদের গায়ের চাদরও ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর তাঁর এবং কারবালার অন্য সকল শহীদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কূফায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইবনে যিয়াদ কেবল প্রকাশ্যে তার প্রদর্শনীই করেনি, বরং জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে ঃ

الحمد لله الذى اظهر الحق واهله ونصر امير المؤمنين يزيد وحزبه وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن على وشيعته -

— সকল প্রশংসা আল্লার জন্য, যিনি সত্য এবং সত্যের অনুসারীকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ এবং তাঁর দলকে বিজয়ী করেছেন, আর মিথ্যাবাদীর পুত্র মিথ্যাবাদী—হুসাইন ইবনে আলী এবং তার সমর্থকদেরকে হত্যা করেছেন।

এরপর এ সকল বিচ্ছিন্ন মস্তক দামেস্কে ইয়াযীদের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং ইয়াযীদ জমজমাট দরবারে তার প্রদর্শনী করে।[৪২]

ধরে নিন, ইয়াযীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হযরত হুসাইন বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদি তাই হয়েও থাকে, তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর জন্য ইসলামে কি কোন আইন নেই? ফিকাহ্র সকল বড় বড় গ্রন্থেই এ আইন লিপিবদ্ধ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কেবল

৪২. বিস্তারিত কাহিনী জানার জন্য তাবারী ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩০৯–৩৫৬। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৮২–২৯৯ এবং আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, ১৭০–২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হেদায়া এবং তার ভাষ্য 'ফাতহুল কাদীর'এর বিদ্রোহী অধ্যায় দেখা যেতে পারে। এ আইনের দৃষ্টিতে বিচার করলে কারবালা প্রান্তর থেকে শুরু করে কুফা এবং দামেস্কের দরবার পর্যন্ত যা কিছু, করা হয়েছে, তা সবই একেবারে হারাম এবং মারাত্মক যুলুম ছিল। দামেস্কের দরবারে ইয়াযীদ যা কিছু করেছে বা বলেছে, সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা দেখা যায়। এ সকল বর্ণনা বাদ দিয়ে আমরা কেবল এ বর্ণনাকেই নির্ভুল বলে স্বীকার করে নিচ্ছি যে, হযরত হুসাইন (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের খণ্ডিত মস্তক দেখে তাঁর চোখে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন ঃ "হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যা না করলেও আমি তোমাদের আনুগত্যে সন্তুষ্ট ছিলাম। ইবনে যিয়াদের ওপর আল্লার লানত। আল্লার শপথ, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে হুসাইন (রাঃ)-কে ক্ষমা করে দিতাম।" তিনি আরও বলেন ঃ "হুসাইন। আল্লার কসম, আমি তোমার প্রতিপক্ষে থাকলে তোমাকে হত্যা করতাম না।"[৪৩] এরপরও কার্যত প্রশ্ন থেকে যায়, এ বিরাট যুলুমের জন্য তিনি তার কীর্তিমান গবর্ণরকে কি শাস্তি দিয়েছেন? হাফেয ইবনে কাসীর লিখেছেন যে, তিনি ইবনে যিয়াদকে কোন শাস্তি দেননি, তাকে বরখাস্তও করেননি, নিন্দা করে কোন চিঠিও লিখেননি।[৪৪] ইসলামী ভদ্রতা তো অনেক দূরের কথা, ইয়াযীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মানবিক ভদ্রতাও যদি থাকতো, তাহলে সে চিন্তা করে দেখতো যে, মক্কা বিজয়ের পর আল্লার রাসূল (সাঃ) তার গোটা খান্দানের সাথে কি ধরনের সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন, আর তার সরকার তাঁর দৌহিত্রের সাথে কি আচরণ করেছে।

এরপর দ্বিতীয় মর্মান্তিক ঘটনা ছিল হাররা যুদ্ধ। হিযরী ৬৩ সালের শেষের দিকে এবং স্বয়ং ইয়াযীদের জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মদীনাবাসীরা ইয়াযীদকে ফাসেক-ফাজের ও যালেম আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা মদীনার গবর্ণরকে শহর থেকে বিতাড়িত করে আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাকে তাদের নেতা নিযুক্ত করে। ইয়াযীদ এ সম্পর্কে জানতে পেরে মুসলিম ইবনে ওকবা আল-মুররী (সালফে সালেহীন তাকে মুশরেক ইবনে ওকবা বলে অভিহিত করেছেন)-কে ১২ হাযার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন যে, শহরবাসীদেরকে ৩দিন যাবৎ আনুগত্য গ্রহণের আহ্বান জানাবে। এরপরও তারা আনুগত্য স্বীকার না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর বিজয় লাভ করলে ৩দিন যাবত মদীনাকে সৈন্যদের জন্য মোবাহ করে দেবে। নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্যরা মদীনা প্রবেশ করে যুদ্ধে মদীনা জয় করে। অতঃপর ইয়াযীদের নির্দেশে তিন দিন যাবত মদীনায় যা ইচ্ছা তা করার জন্য সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। এ তিন দিনে শহরের সর্বত্র লুট-তরাজ চলে। অধিবাসীদের পাইকারী হারে হত্যা করা হয়। ইমাম যুহরীর বর্ণনা মতে ৭শ সম্মানিত এবং প্রায় ১০ হাযার সাধারণ লোক নিহত হয়েছেন। বর্বর সেনা বাহিনী ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে নির্বিচারে স্ত্রীদের শ্লীলতা হানি করে। হাফেয ইবনে কাসীর বলেন ঃ

حتى قيل انه حبلت الف امرأة في تلك الايام من
غير زوج -

---

৪৩. আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫২। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড,

৪৪. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০৩।

—বলা হয়, এ সময় এক হাযার মহিলা ব্যাভিচারের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।[৪৫]

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, মদীনাবাসীদের বিদ্রোহ অবৈধ ছিল, তাহলেও কি কোন বিদ্রোহী মুসলিম জনবসতি, এমনকি অমুসলিম বিদ্রোহী এবং যুদ্ধংদেহী কাফেরদের সাথেও এহেন আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ ছিল। তাও আবার অন্য কোন শহরে নয়, স্বয়ং মদীনা তুর-রাসূল (সঃ)-এর ব্যাপার। এ শহর সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী এবং মুসনাদে আহমাদে বিভিন্ন সাহাবা থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ উক্তিসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

لا يريد احد المدينة بسوء الا اذابه الله في النار ذوب الرصاص -

—যে কোন ব্যক্তি মদীনার সাথে মন্দ কাজের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আগুনে শিশার মতো গালিয়ে দেবেন।

মহানবী আরও বলেছেন ঃ

من اخاف اهل المدينة ظلما اخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين - لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا -

—যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে যুলুমে আতংকগ্রস্ত করবে, আল্লাহ্ তাকে আতংকগ্রস্ত করবেন ; তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তার কাছ থেকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না।

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, এসকল হাদীসের ভিত্তিতে একদল আলেম ইয়াযীদের ওপর লানতকে জায়েয মনে করেন। এদের সমর্থনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের একটি উক্তিও পাওয়া যায়। কিন্তু এর ফলে তার পিতা বা অন্য কোন সাহাবীর ওপর লানতের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার

---

৪৫. ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৭২-৩৭৯। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, ৩১০-৩১৩ এবং আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, ২১৯-২২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আশংকায় অপর একটি দল তা করতে নিষেধ করেন।[৪৬] হযরত হাসান বাসরী (রঃ)-কে বিদ্রূপ করে বলা হয় ঃ আপনি তো বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন না, তাহলে আপনি কি সিরিয়াবাসীদের (মানে উমাইয়াদের) ওপর সন্তুষ্ট? জবাবে তিনি বলেন ঃ "সিরিয়াবাসীদের ওপর আমি সন্তুষ্ট থাকবো? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। তারা কি রাসূলুল্লাহর হেরমকে হালাল করেনি? তিন দিন ধরে সেখানকার অধিবাসীদের পাইকারী হারে হত্যা করেনি। তাদের নিবতী এবং কিবতী সৈন্যদেরকে সেখানে যা খুশী করার পাইকারী অনুমতি দেয়নি? তারা শরীফ দ্বীনদার মহিলাদের ওপরও আক্রমণ চালিয়েছে, কারোর সম্ভ্রম বিনষ্ট করা থেকেই তারা নিবৃত্ত

---

৪৬. আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড পৃষ্ঠা-২২৩। ইবনে কাসীর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের যে উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার বিবরণ এই যে, একদা তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়াযীদের ওপর লানত সম্পর্কে আপনি কি বলেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ যার ওপর লানত করেছেন, আমি কেন তার ওপর লানত করবো না? এর প্রমাণ হিসাবে তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامكم ○ اولئك الذين لعنهم الله - محمد : ٢٢-٢٣

—তোমরা ক্ষমতার অধিকারী হলে বিশ্বে বিপর্যয় ঘটাবে, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে—তোমাদের কাছ থেকে এ ছাড়া আর কি আশা করা যায়? এরাই হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ যাদের ওপর লানত করেছেন।" এ আয়াত পাঠ করে ইমাম সাহেব বলেন, ইয়াযীদ যা কিছু করেছে, তাঁর চেয়ে বড় বিপর্যয় এবং তার চেয়ে বড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন আর কি হতে পারে? মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রাসূল আল-বারযানজী আল-ইশায়াহ ফী আশরাতিস-সা-আহ'এ এবং ইবনে হাজার আল-হাইসামী আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকায় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আল্লামা সাফারিনী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদ ইয়াযীদের ওপর লানতকে পসন্দ করতেন না। আহলুস সুন্নাতের আলেমদের মধ্যে যারা লানতের স্বপক্ষে, তাঁদের মধ্যে ইবনে জাওযী, কাযী আবু ইয়ালা, আল্লামা তাফতাযানী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আর যাঁরা এর বিপক্ষে, তাঁদের মধ্যে ইমাম গাযযালী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া শীর্ষস্থানীয়। আমার মতে অভিসম্পাতযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের ওপর সামগ্রিক ভাবে লানত করা যায় (যেমন, বলা যায়, যালেমদের ওপর আল্লার লানত) ; কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ধারিত ধারায় লানত করা উচিত নয়। কারণ, তিনি জীবিত থাকলে হতে পারে, পরে আল্লাহ তাকে তাওবা করার তাওফিক দিবেন, আর তিনি মারা গিয়ে থাকলে, আমরা জানিনা, কি অবস্থায় তাঁর জীবনের সমাপ্তি হয়েছে। এ জন্য আমাদেরকে এ সব লোকদের অন্যায় কাজকে অন্যায় বলেই ক্ষান্ত হতে হবে এবং লানত থেকে বিরত থাকাই উত্তম। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এখন ইয়াযীদের তারীফ করতে হবে, তাকে রাযিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন) লিখা হবে। একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত

হয়নি। অতঃপর বায়তুল্লাহ — আল্লাহর ঘরের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার ওপর আল্লার লানত হোক, তার পরিণতি হোক নিকৃষ্ট।"[৪৭]

তৃতীয় ঘটনাটি সম্পর্কে হযরত হাসান বাসরী (র:) সব শেষে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স:) হেরেমের ধ্বংস সাধন করে উক্ত বাহিনী হযরত ইবনে যুবাইয়ের (রা:)–এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য মক্কা আক্রমণ করে এবং মিঞ্জানিক দিয়ে খানায়ে কা'বার ওপর প্রস্তর বর্ষণ করে। ফলে কা'বার একখানা দেয়াল ভেঙ্গে যায়। কা'বায় অগ্নিসংযোগের বর্ণনাও পাওয়া যায়। অবশ্য এর অন্যান্য কারণও রয়েছে বলে বলা হয়। তবে প্রস্তর বর্ষণ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই।[৪৮]

এ সকল ঘটনা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, এ শাসকরা তাদের ক্ষমতা এবং তার স্থিতি ও সংরক্ষণকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিতেন। তারা এ জন্য যে কোন সীমাতিক্রম এবং যে কোন রকম অন্যায় কাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না।

মারওয়ান বংশের রাজত্বকালে

এরপর মারওয়ান এবং তার বংশের লোকদের শাসনকাল শুরু হয়। এ সময় ধর্ম থেকে রাজনীতির পৃথকীকরণ বরং রাজনীতির যুপকাষ্ঠে ধর্মের বিধি–বিধান বলি দেবার প্রবণতা চরমে পৌছে। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান উঁচুদরের ফকীহদের অন্যতম ছিলেন। বাদশাহ হওয়ার আগে তাকে মদীনায় হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং কাবীসা ইবনে যুবাইর–এর সমপর্যায়ের ফকীহ মনে করা হতো। ইয়াযীদের শাসনকালে খানায়ে কা'বায় প্রস্তর বর্ষণের বিরুদ্ধে তিনি ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে খলীফা হয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা:)–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মক্কায় পাঠান। যালেম হাজ্জাজ ঠিক হজ্বের সময় মক্কা আক্রমণ করে ; জাহেলী যুগে কাফের মুশরিকরাও এ সময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতো। সে আবু কুবায়েস পাহাড়ে মিঞ্জানিক স্থাপন করে খানায়ে কা'বার ওপর প্রস্তর বর্ষণ করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের কঠোর পীড়াপীড়িতে বাইরে আগত হাজীদের তাওয়াফ এবং সাঈ সম্পন্ন করা পর্যন্ত প্রস্তর বর্ষণ বন্ধ রাখে। কিন্তু সে বছর মক্কার লোকেরা মিনা এবং আরাফাতে যেতে পারেনি, স্বয়ং হাজ্জাজের সেনাবাহিনীর লোকেরাও তাওয়াফ এবং সাঈ করতে পারেনি। বহিরাগতরা তাওয়াফ শেষ করলে হাজ্জাজ সকলকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নতুন করে প্রস্তর বর্ষণ শুরু করে।[৪৯] বিজয় লাভের পর আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে

ওমর ইবনে আবদুল আযীযের দরবারে ইয়াযীদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ শব্দ উচ্চারণ করলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন ঃ তুমি ইয়াযীদকে আমীরুল মু'মিনীন বলছো? এ বলে তিনি তাকে ২০ টি কশাঘাত করেন। (তাহযীবুত–তাহযীব, ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৬১)।

৪৭. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭০।

৪৮. আত–তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩৮৩। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩১৬। আল–বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–২২৫। তাহযীবুত তাহযীব, ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩৬১।

৪৯. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা–২৩ ; আল–বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩২৯। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৭–২৮।

সাফওয়ান এবং ওমারা ইবনে হাযম-এর মস্তক এবং লাশের সাথে যা কিছু আচরণ করা হয় আমরা ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করেছি।

হাজ্জাজের গবর্ণরী ছিল আবদুল মালেক এবং তাঁর পুত্র ওয়ালিদের শাসনামলের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ২০ বছর যাবৎ তাকে যুলুম-নির্যাতন চালাবার অনুমতি দেয়া হয়। দুনিয়ায় কোন মানুষই নিরংকুশভাবে অনিষ্টের প্রতীক নয় ; হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মধ্যেও ভাল কিছু ছিল না, তা নয়। কুরআনে 'যের-যবর-পেশ' বসান তার এমন এক পুন্যকাজ, বিশ্ব যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন তার কাজের প্রশংসা করা হবে। সিন্ধু বিজয়ও তার অন্যতম প্রশংসনীয় কীর্তি, যার বদৌলতে আজ এ উপমহাদেশে আল্লার নাম নেয়ার লোক পাওয়া যায়। কিন্তু হাজ্জাজ তার দীর্ঘ শাসনামলে যেসব যুলুম নির্যাতন চালিয়েছে, তার কথা সরাসরি বাদ দিয়েও বলা যায়, কোন ব্যক্তি একজন নিরপরাধ মু'মিনকে হত্যা করে যে ধরনের গুনাহের অধিকারী হয়, তার সারা জীবনের সমস্ত নেকীও তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ইলমে কেরাআতের মশহুর ইমাম আসেম ইবনে আবিন নজুদ বলেন ঃ "আল্লার এমন কোন হারাম কাজ নেই, যা সে করেনি।" হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ "দুনিয়ার সমস্ত জাতি যদি তাদের সকল কুকীর্তি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে আমরা কেবল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কুকীর্তি উপস্থাপিত করেই সকলের ওপর টেক্কা দিতে পারি।" সে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে মোনাফেকদের সর্দার বলতো। সে বলতো, "আমি ইবনে মাসউদকে পেলে তার রক্ত দিয়ে মাটির পিপাসা নিবৃত্ত করতাম। সে ঘোষণা করে ঃ কোন ব্যক্তি ইবনে মাসউদের কেরাত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর কুরআন থেকে তার কেরাআত শুকুরের হাড্ডি দিয়ে মুছে ফেলতে হলে তাও আমি করবো। সে হযরত আনাস ইবনে মালেক এবং ইবনে সাহাল ইবনে সাআদ সায়েদী (রাঃ)-এর মতো বুযবর্গ ব্যক্তিবৃন্দকে গালি দেয়। এবং তাঁদের ঘাড়ে মোহর অংকিত করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে হত্যার হুমকি দেয়। সে প্রকাশ্যে বলতো, আমি যদি লোকদেরকে মসজিদের এক দরজা দিয়ে বের হবার নির্দেশ দেই, আর তারা অন্য দরযা দিয়ে বের হয়, তাহলে আমার জন্য তাদের রক্ত হালাল। তার শাসন কালে বিনা বিচারে আটক যে সকল ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, বলা হয়ে থাকে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাযার। তার মৃত্যুর সময় বিনা বিচারে যারা কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুণছিল,তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাযার।[৫০] আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান মৃত্যুকালে এ যালেম গবর্ণর সম্পর্কে তাঁর পুত্রদেরকে ওসিয়্যাত করেছিলেন ঃ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের প্রতি সব সময় সুনযর দেবে। কারণ সেই-তো আমাদের জন্য রাজত্ব কন্টকমুক্ত করেছে, শত্রুদের পরাভূত করেছে আমাদের বিরোধীদের দমন করেছে।[৫১] তারা যে মানসিকতা নিয়ে রাজত্ব করেছে, এ ওসিয়্যাত তার প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের দৃষ্টিতে আসল গুরুত্ব ছিল নিজেদের গদীর। যেসব উপায়ে ক্ষমতা সংহত

---

৫০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫ ; ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৭১। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৯, ১৩৩। আল-বেদায়া, ৯ম খণ্ড,পৃষ্ঠা—২, ৮৩, ৯১, ১২৮, ১২৯ এবং ১৩১-১৩৮। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৯।

৫১. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৩। আল-বেদায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৭। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৮।

ও প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা-ই তাদের কাছে ভালো বলে গৃহীত। এতে শরীয়াতের সকল সীমা লংঘিত হলেও তাদের কিছু যায় আসে না।

এ যুলুম-নির্যাতন এতদূর পৌঁছে যে, ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক-এর শাসনকালে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয একদা চিৎকার করে বলে ওঠেন : "ইরাকে হজ্জাজ, সিরিয়ায় ওয়ালীদ, মিসরে কুররা ইবনে শরীক, মদীনায় ওসমান ইবনে হাইয়্যান এবং মক্কায় খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ আল কাসরী—হে আল্লাহ্! তোমার পৃথিবী যুলুমে ছেয়ে গেছে। এবার জনগণকে শান্তি দাও, মুক্তি দাও।"[৫২] রাজনৈতিক নির্যাতন ছাড়াও এরা সাধারণ ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক ঔদ্ধত্যপরায়ণ হয়ে ওঠে। সালাতে অস্বাভাবিক বিলম্ব তাদের অভ্যাস হয়ে পড়ে।[৫৩] তারা বসে বসে জুমার প্রথম খোতবা দিতো।[৫৪] ঈদের সালাতের পূর্বে খোতবা দেয়ার রীতি মারওয়ান চালু করে। আর তার খান্দানের জন্য এটা ছিল একটা স্বতন্ত্র রীতি।[৫৫]

ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মোবারক শাসনকাল

বনী উমাইয়াদের দীর্ঘ ৯২ বছরের শাসনামলে ওমর ইবনে আবদুল আযীযের খেলাফতের আড়াই বছর অন্ধকারে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। একটি ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি এই :

"হিজরী ৯৩ সাল। তিনি তখন মদীনার গবর্ণর। ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেকের নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের পুত্র খোবায়েবকে ৫০টি চাবুক মারা হয়। শুধু তাই নয়, কনকনে শীতের মধ্যে তাঁর মাথায় পানির মশক ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর সারা দিন তাকে মসজিদে নববীর দরযায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এরি ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়।[৫৬] এটা ছিল সুস্পষ্ট যুলুম এবং সম্পূর্ণ শরীয়াত বিরোধী শাস্তি। গবর্ণর হিসেবে তাকে এ শাস্তি বরদাস্ত করতে হয়। কিন্তু এরপর তিনি গবর্ণর পদে ইস্তফা দেন। এ জন্য তিনি ভীষণ মর্মপীড়া অনুভব করেন এবং আল্লার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন।

হিজরী ৯৯ সালে সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের গোপন ওসিয়াত ক্রমে তাঁকে খলীফা করা হলে তিনি আর একবার বিশ্বের দরবারে খেলাফত এবং বাদশাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তার পক্ষে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ শেষে সর্ব প্রথম তিনি যে ভাষণ দেন, তার ভাষা ছিল এই :

"আমার ওপর এ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আমি এটা চাইনি। এ ব্যাপারে আমার মতামত গ্রহণ করা হয়নি, মুসলমানদের পরামর্শও গ্রহণ করা

---

৫২. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩২।
৫৩. আল-বেদায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৯।
৫৪. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৯।
৫৫. আত-তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬। আল-বেদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৮। ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০-৩১। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০০।
৫৬. আল-বেদায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮।

হয়নি। তোমাদের ঘাড়ে আমার আনুগত্যের যে রজ্জু পরিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি নিজে তা খুলে ফেলেছি। এখন যাকে খুশী তোমরা নিজেদের নেতা বানাতে পার।

সমবেত জনতা সমস্বরে বলে ওঠে, আমরা আপনাকেই চাই। আমরা সকলেই আপনার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে সন্তুষ্ট। জনগণের এ স্বতস্ফূর্ত সমর্থনের পরই তিনি খেলাফত গ্রহণ করেন। অতঃপর বলেন ঃ "আসলে রব, নবী ও দ্বীনি কিতাবের ব্যাপারে এ উম্মাতের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই, মতভেদ আছে কেবল দীনার-দিরহামের ব্যাপারে। আল্লার কসম! আমি অন্যায় ভাবে কাউকে দেবো না, কারো বৈধ অধিকারে বাধাও দেবো না। জনগণ! শোন যে আল্লার আনুগত্য করে, তার আনুগত্য ওয়াজেব। আর যে আল্লার আনুগত্য করে না, তার জন্য কোন আনুগত্য নেই। যতক্ষণ আমি আল্লার অনুগত থাকি, তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি আল্লার অবাধ্য হয়ে গেলে তোমাদের জন্য আমার আনুগত্য কিছুতেই বাধ্যতামূলক হবে না।"[৫৭]

এরপর তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসৃত সকল রাজকীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুরূপ জীবন ধারা অবলম্বন করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব অবৈধ সম্পত্তি তিনি লাভ করেছিলেন, তার সব কিছু ফেরত দেন ঃ এমনকি স্ত্রীর অলংকারাদি এবং সোনাদানা সব বায়তুল মালে ফেরত পাঠান। বার্ষিক ৪০ হাযার দীনারের সম্পত্তির মধ্যে মাত্র বার্ষিক চারশ দীনার নিজের জন্য গ্রহণ করেন। তিনি কেবল এ চারশ দীনারেরই বৈধ মালিক ছিলেন।[৫৮] এভাবে সর্বপ্রথম আল্লাহ এবং জনগণের কাছে নিজের হিসেব পেশ করে তিনি ঘোষণা করেন ঃ রাজপরিবার এবং ওমরাদের মধ্যে যার বিরুদ্ধে কারো কোন দাবী আছে, সে যেন তার অভিযোগ পেশ করে। অধিকার হরণের কথা যে কোন ব্যক্তি প্রমাণ করতে পেরেছে, তাকে এর অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এতে বনী উমাইয়াদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। তারা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের ফুফী ফাতেমা বিনতে মারওয়ানকে—যাকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন—তাঁর কাছে পাঠায় তাঁকে একার্জ থেকে বিরত রাখার জন্য। কিন্তু তিনি তাকে জবাব দেন ঃ শাসনকর্তার আপন জনেরা যুলুম করলে সে যদি তা প্রতিহত করতে না পারে, তবে সে কোন্ মুখে অন্যদেরকে বারণ করবে? জবাবে তিনি বলেন ঃ "তোমার বংশের লোকেরা তোমাকে সতর্ক করছে যে, তোমাকে এ জন্য কঠোর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।" জবাবে ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ কিয়ামতের চেয়েও বেশী যদি কোন কিছুকে ভয় করে থাকি, তবে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি দোয়া করি।" অবশ্য তাঁর ফুফী নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়ে গোত্রের লোকদেরকে বলেন ঃ এ সবই হচ্ছে তোমাদের নিজেদের কর্মফল। তোমরা ওমর ইবনুল খাত্তাবের বংশের মেয়ে বিয়ে করিয়ে এনেছ। ছেলে শেষ পর্যন্ত তার নানার পথ অনুসরণ করেছে।[৫৯] (উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মাতা ছিলেন হযরত ওমর এর দৌহিত্রী)।

---

৫৭. আল-বেদায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১২-২১৩।

৫৮. আল-বেদায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০০-২০৮। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৩-১৬৪।

৫৯. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৪। আল-বেদায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১৪।

দায়িত্বের অনুভূতি যে তাঁর মধ্যে কি পরিমাণ জাগ্রত ছিল তা নিম্নোক্ত ঘটনাটি থেকে জানা যায়। তাঁর পূর্বসূরী সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক–এর দাফন কার্য সম্পন্ন করে ফিরে আসার পর তাঁকে অত্যন্ত বিষণ্ন দেখায়। জনগণ অবাক হন যে, বাদশাহী পেয়ে আনন্দিত না হয়ে উল্টো দুঃখিত হয়েছেন। তারা দুঃখিত হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ "পূর্ব–পশ্চিমে বিস্তৃত উম্মাতে মুহাম্মাদীর এমন একজন সদস্যও নেই, দাবী করার পূর্বেই আমাকে যার অধিকার আদায় করতে হবে না।৬০ তাঁর স্ত্রী বলেন ঃ আমি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দেখি, জায়নামাযে বসে বসে কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছেন কেন? তিনি জবাব দেন ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব আমার ঘাড়ে ন্যস্ত হয়েছে। ভাবছি তাদের অনেকে কপর্দকহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, অনেকে রোগে–শোকে আক্রান্ত হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে, অনেকে যুলুম–নির্যাতনের শিকার, অনেকে দ্বীন–হীন অবস্থায় বন্দীত্বের জীবন যাপন করছে। আবার অনেকে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও বিপুল দারিদ্রের মধ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে দিন অতিবাহিত করছে এক কথায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের লোক ছড়িয়ে আছে। আমি জানি, কিয়ামতের দিন পরওয়ারদেগার আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি এদের জন্য কি করেছি। মুহাম্মাদ (সঃ) কিয়ামতের দিন আমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবেন ; আমি ভয় করছি, মামলায় আমি যেন দোষী সাব্যস্ত না হই। এ জন্য নিজের ভবিষ্যতের করুণ অবস্থা চিন্তা করে কাঁদছি।"৬১ উপরোক্ত বর্ণনা থেকে তার দায়িত্বানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি যালেম গবর্ণর এবং কর্মচারীদের বরখাস্ত করে তৎপরিবর্তে সৎ লোকদেরকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। বনী উমাইয়াদের শাসনামলে যেসব অবৈধ কর উসুল করা হতো, তিনি সে সব রহিত করেন। নও–মুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপের নিয়ম বন্ধ করেন তিনি। কর্মচারীদের কঠোর নির্দেশ দিয়ে লেখেন যে, কোন মুসলমান বা যিম্মীকে বেআইনীভাবে বেত্রাঘাত করবে না, আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে হত্যা করবে না বা কারো হাত কাটবে না।৬২

তাঁর শাসনকালের শেষের দিকে একদল খারেজী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। তিনি বিদ্রোহীদের দলপতিকে লিখেন ঃ "খুন–খারাবী দ্বারা কি লাভ হবে? এসে আমার সাথে আলোচনা করো ; তোমরা সত্যের ওপর থাকলে আমি মেনে নেবো, আর আমি সত্যের ওপর থাকলে তোমরা মেনে নেবে। খারেজীদের দলপতি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আলাপ আলোচনার জন্য ২ ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করে। তারা বলে ঃ "স্বীকার করি, আপনার খান্দানের অন্যান্য ব্যক্তিদের চেয়ে আপনার রীতি স্বতন্ত্র। তাদের কার্যকালাপকে আপনি অন্যায় বলে অভিহিত করেন। তবে তারা যখন গুমরাহীর ওপর ছিল, তখন আপনি তাদের ওপর অভিসম্পাত করেন না কেন? হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয জবাব দেন ঃ "আমি তাদের কার্যকলাপকে অন্যায় বলে থাকি ; তাদের নিন্দা করার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়? এরপরও আবার অভিশম্পাত করার কি

৬০ ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৪।

৬১. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৫

৬২ আত–তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩১৪, ৩১৫, ৩২১। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৮, ১৬৩।

দরকার? তোমরা ফেরাউনের ওপর কতবার অভিশম্পাত করেছো?" এমনি করে তিনি খারেজীদের এক একটি অভিযোগের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। অবশেষে তাদের একজন বলে : একজন ন্যায় পারয়ণ ব্যক্তি কি এটা সহ্য করতে পারে যে, তার উত্তরাধিকারী হবে একজন অত্যাচারী। তিনি নেতিবাচক জবাব দিলে সে পুনরায় প্রশ্ন করে আপনি আপনার অবর্তমানে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেকের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন, অথচ আপনি জানেন যে, সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।" তিনি জবাব দেন : "আমার পূর্বসূরী (সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক তার স্বপক্ষে পূর্বেই বায়াত গ্রহণ করেছেন। এখন আমি কি করতে পারি?" খারেজী আবার প্রশ্ন করে : "যে ব্যক্তি ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালেককে আপনার পর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছে, আপনি কি মনে করেন, তার এমনটি করার অধিকার ছিল? আপনি কি তার এ সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন? এ প্রশ্নে ওমর ইবনে আবদুল আযীয লা-জবাব হয়ে যায়। বৈঠক ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি বারবার বলতে থাকেন : ইয়াযীদের ব্যাপারটি আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমার কাছে এ যুক্তির কোন জবাব নেই। পরওয়ারদেরগার! আমাকে ক্ষমা করো।" ৬৩

এ ঘটনার পর বনী উমাইয়ারা আশংকা করতে থাকে যে, এখন এ ব্যক্তি বংশীয় কর্তৃত্বও খতম করে শূরার হাতে খেলাফত ন্যস্ত করবে। এর কিছুকাল পরেই তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় এবং তারপর সব কিছু আবার আগের মতো চলতে থাকে।

আব্বাসীয় সাম্রাজ্য

সিন্দু থেকে স্পেন পর্যন্ত দুনিয়ার এক বিরাট অঞ্চলে দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে বনী উমাইয়াদের শাসন চলে। বাহ্যত তাদের শক্তি-সামর্থ দেখে কেউ ধারণাও করতে পারেনি যে, একদিন এ সুবিশাল সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটবে। কিন্তু যেভাবে তাদের শাসন চলছিল তাতে কেবল মানুষের মাথাই তাদের সামনে নত হয়েছিল—মানুষের মনে তাদের কোন স্থানই ছিল না। এ কারণে এক শতাব্দী হতে না হতেই আব্বাসীয়রা অতি সহজেই তাদের পতন ঘটাল। আর তাদের এ মর্মান্তিক পতনে অশ্রুপাত করার মতোও কেউ ছিল না।

খেলাফতের নয়া দাবীদারদের জয়যুক্ত হবার কারণ ছিল, তারা মুসলমানদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিল যে, তারা রাসূলের বংশের লোক, তারা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করবে এবং তাদের হাতে আল্লার বিধি-বিধান কায়েম হবে। হিজরী ১৩২ সালের রবিউসসানী মাসে সাফফার হাতে কুফায় খেলাফতের বায়আত কালে প্রথম ভাষণে বনী উমাইয়াদের অত্যাচার-অবিচারের বিষয় উল্লেখ করে সাফফাহ বলেছিলেন :

---

৬৩. আত-তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩১১। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৫-১৫৭। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬২-১৬৩।

"আমি আশা করি, যে খান্দান থেকে তোমরা কল্যাণ লাভ করেছ সে খান্দান থেকে তোমাদের প্রতি কোন যুলুম-নির্যাতন চালান হবে না। যে খান্দান থেকে তোমরা সংশোধনের পথ লাভ করেছো সে খান্দান তোমাদের ওপর কোন ধ্বংস বা বিপর্যয় ডেকে আনবে না।"

সাফ্ফার পর তার চাচা দাউদ ইবনে আলী জনগণকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে

"নিজেদের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ, রাজ প্রাসাদ নির্মাণ এবং তাতে নহর খননের জন্য আমাদের উদ্ভব হয়নি। বরং যে বিষয়টি আমাদেরকে ডেকে এনেছে, তা হচ্ছে এই যে, আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। আমাদের চাচার বংশধরদের (অর্থাৎ আবু তালেবের বংশ) ওপর যুলুম-নির্যাতন চলছিল। বনী উমাইয়ারা তোমাদের মধ্য দিয়ে চলছিল অত্যন্ত খারাপ পথে। তারা তোমাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে চলছিল। আর তোমাদের বায়তুল মালকে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করছিল। এখন আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং হযরত আব্বাসের দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে, আমরা আল্লার কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করবো।"[৬৪]

কিন্তু শাসন-ক্ষমতা লাভের পর কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা এ কথা প্রমাণ করে যে এ সব কিছুই ছিল ভাওতা মাত্র।

আব্বাসীয়দের কার্যকলাপ

বনী উমাইয়াদের রাজধানী দামেশ্ক জয় করে আব্বাসী সৈন্যরা সেখানে গণহত্যা চালায়। এ হত্যাকাণ্ডে ৫০ হাযার লোক নিহত হয়। ৭০ দিন যাবৎ দামেশ্কের উমাইয়া জামে মসজিদ ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়েছিল। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সহ সকল বনী উমাইয়ার কবর উপড়ে ফেলা হয়। হেশাম ইবনে আবদুল মালেক (রাঃ)-এর লাশ কবরে অবিকৃত অবস্থায় পেয়ে তার ওপর চাবুক মারা হয়। কয়েকদিন যাবত তা প্রকাশ্যে রাজপথে ঝুলিয়ে রাখা হয়, অতঃপর আগুনে পুড়িয়ে তার ছাই উড়িয়ে দেয়া হয়। বনী উমাইয়াদের শিশুদেরকেও হত্যা করা হয় এবং তাদের রক্তাক্ত লাশের ওপর ফরাশ বিছিয়ে খাদ্য খাওয়া হয়। বসরায় বনী উমাইয়াদের হত্যা করে মৃতদেরকে ঠ্যাং ধরে টেনে টেনে এনে রাস্তায় ফেলা হয়। সেখানে শৃগাল-কুকুর তাদের লাশ ভক্ষণ করে। মক্কা-মদীনায়ও তাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করা হয়।[৬৫]

সাফ্ফার বিরুদ্ধে মুসেলে বিদ্রোহ দেখা দিলে তার ভ্রাতা ইয়াহ্ইয়াকে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান। সে ঘোষণা জারী করে ঃ যে ব্যক্তি শহরের জামে মসজিদে প্রবেশ করবে, তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। হাযার হাযার লোক মসজিদে প্রবেশ করলে দরযায় পাহারা বসিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পাইকারী হারে হত্যা করা হয়। যেসব স্ত্রীর স্বামী এবং অভিভাবকদের হত্যা করা হয়, রাতের

৬৪. আত-তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮২-৮৩। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩২৫। আল-বেদায়া, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪১।

৬৫. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৩৩-৩৩৪, ৩৪১ ; আল-বেদায়া, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৫ ; ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩২-১৩৩।

বেলায় তাদের আর্তনাদ ইয়াহ্ইয়ার কানে ভেসে আসে। সে ঘোষণা দেয় যে, আগামীকাল স্ত্রী এবং শিশুদের পালা। এমনিভাবে ৩ দিন মুসেলে গণহত্যা চলে। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কাউকে ক্ষমা করা হয়নি। ইয়াহ্ইয়ার সেনাবাহিনীতে ৪ হাযার জঙ্গী সেনা ছিল। তারা মুসেল-এর মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় ধর্ষণের পালা। জনৈকা মহিলা ইয়াহ্ইয়ার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে লজ্জা দিয়ে বলে ঃ "তোমরা বনু হাশেমের লোক, রাসূল (সাঃ)-এর চাচার বংশধর। তোমাদের জঙ্গী সিপাহীরা আরব মুসলিম মহিলাদের সতীত্ব সম্ভ্রম লুটছে। তোমাদের লজ্জা হয় না?" ইয়াহ্ইয়ার মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। সে সেনাবাহিনীর জঙ্গী লোকদের বেতন এবং এনামের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে জড়ো করে সকলকে হত্যা করে।[৬৬]

সাফ্ফাহ নিজ হাতে ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে হুরায়রাকে নিরাপত্তামূলক চুক্তিপত্র লিখে দেন পরে চুক্তিপত্র লংঘন করে তাকে হত্যা করেন।[৬৭]

আব্বাসীয়রা কিতাব এবং সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর বিধি-বিধান কায়েম করবে—এ শর্তে এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খোরাসানের মশহুর ফকীহ ইবরাহীম ইবনে মায়মুন আস্সায়েগ তাদের আহ্বানে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিপ্লব সফল হওয়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন আবু মুসলিম খোরাসানীর দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু বিপ্লব সফল হওয়ার পর তিনি আবু মুসলিমের নিকট আল্লার বিধি-বিধান কায়েমের দাবী এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালে আবু মুসলিম তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন।[৬৮]

আবুতালেবের বংশধরদের ওপর বনী উমাইয়াদের যুলুম-নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই আব্বাসীয়দের অভ্যুদয়—মনসুরের শাসন আমলে তাদের এ দাবীরও মুখোশ উন্মোচিত হয়। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নফসে যাকিয়্যা এবং তাঁর ভাই ইবরাহীমের আত্মগোপন কালে তাদের ঠিকানা বলে না দেয়ার অপরাধে মনসুর তাদের পরিবারের সদস্যবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনকে গ্রেফতার করে। তাদের সকল সম্পত্তি বাযেয়াপ্ত করে নিলাম করা হয়। তাদেরকে হাতকড়া লাগিয়ে মদীনা থেকে ইরাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনুল হাসানকে জীবন্ত দেয়ালে পিষে হত্যা করা হয়। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লার শ্বশুরকে উলঙ্গ করে দেড়শ কোড়া মারা হয়। তারপর তাকে হত্যা করে খোরাসানের রাস্তায় রাস্তায় তার মস্তকের প্রদর্শনী করা হয়। কয়েকজন লোককে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা জনগণের সামনে সাক্ষী দিচ্ছিল যে, এটা নফসে যাকিয়্যার মস্তক।[৬৯] কিছুদিন পর নফসে যাকিয়্যা মদীনায় শহীদ হলে তাঁর শিরচ্ছেদ করে শহরে শহরে প্রদর্শনী করা হয়। তাঁর এবং

৬৬. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৯-৩৪০। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৭।

৬৭. আত-তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৭-১০৯। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৮; আল-বেদায়া, ১০খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫। ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬।

৬৮. আল-বেদায়া, ১০ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৮।

৬৯ তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬১, ১৭১-১৮০। ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৭০-৩৭৫। আল-বেদায়া. ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮০-৮২।

তার সঙ্গীদের লাশ তিন দিন যাবৎ মদীনার রাজপথে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং পরে সাল্‌আ পর্বতের নিকটে ইয়াহুদীদের গোরস্থানে নিক্ষেপ করা হয়।[৭০]

এসব ঘটনাবলী শুরু থেকেই এ কথা প্রমাণ করে যে, বনী উমাইয়াদের মতো আব্বাসীয়দের শাসনও দ্বীন বর্জিত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা লংঘনে উমাইয়ারা যেমন দ্বিধা করতো না, তেমনি আব্বাসীয়দেরও কোন দ্বিধা নেই। আব্বাসীয়রা যে বিপ্লব সাধন করে তাতে কেবল শাসকের পরিবর্তন হয়েছে, শাসন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা উমাইয়া যুগের কোন একটি বিকৃতির সংশোধন করেনি। বরং খেলাফতে রাশেদার পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারা তার সবটুকু পুরোপুরিই বহাল রাখে।

বনী উমাইয়া যেভাবে রাজ কার্জ চালিয়ে আসছিলেন আব্বাসীয় আমলেও সেভাবেই চলতে থাকে। পার্থক্য হয়েছে কেবল এটুকু যে, বনী উমাইয়াদের জন্য আদর্শ ছিল কনস্টান্টিনোপলে কাইজার আর আব্বাসীয়দের জন্য অনুসরণীয় হয়েছে ইরানের কিসরা।

শূরা ভিত্তিক শাসন নীতিও পরিত্যাগ করা হয়। এর যা ফল দাঁড়ায়, সে দিকে আমি ইতিপূর্বেও ইঙ্গিত করেছি।

বায়তুল মালের ব্যাপারে তাদের কর্মধারা উমাইয়াদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। বায়তুল মালের আয়-ব্যয় কোন ব্যাপারেই শরীয়াতের বিধান এবং নিয়ম-নীতি মেনে চলা হতো না। জনগণের নয়, বরং বাদশাহদের ধন-ভাণ্ডারে পরিণত হয় বায়তুল মাল। তার আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে কারো জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন অধিকার ছিল না।

বিচার বিভাগের ওপর খলীফা, রাজপ্রাসাদের ব্যক্তিবর্গ, শাসক ও পরিষদ বর্গের হস্তক্ষেপ তেমনি চলতে থাকে, যেমনি চলছিল বনি উমাইয়াদের শাসনামলে। খলীফা আল-মেহেদীর সময় তাঁর জনৈক সিপাহসালার এবং একজন ব্যবসায়ীর মামলা কাযী ওবায়দুল্লাহ ইবনে হাসানের আদালতে পেশ করা হয়। খলীফা কাযীকে লিখে পাঠান যে, এ মামলার রায় আমার সিপাহসালারের পক্ষে করবেন। কাযী তার নির্দেশ পালন না করায় তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।[৭১] হারুনুর রশীদের শাসনকালে কাযী হাফস ইবনে গেয়াস খলীফার বেগম যুবায়দার জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়সালা করলে তাঁকে চাকুরী হারাতে হয়।[৭২]

শুউবী আন্দোলন ও যিন্দীক

বনী উমাইয়ারা বংশ-গোত্র এবং জাতীয়তাবাদের যে বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিল, আব্বাসীয়দের শাসনকালে তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এক খান্দানের বিরুদ্ধে আরেক খান্দানের অধিকারের ওপর

৭০. আল-বেদায়া, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৯০।

৭১. আল-খতীব ঃ বাগদাদের ইতিহাস, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৯, মিসর, ১৯৩১।

৭২. তাশ কোবরাযাদাহ ঃ মেফতাহুস সাআদাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৯, ১ম সংস্করণ, হায়দারাবাদ, ১৩২৯ হিজরী।

ভিত্তি করেই আব্বাসীয়দের আন্দোলনের সূচনা হয়। কিন্তু নিজেদের বিজয় ও সাফল্যের জন্য তারা একদিকে আরবদের এক কবীলাকে আরেক কবিলার বিরুদ্ধে সংঘাত মুখর করে অপরদিকে আজমীদেরকে আরবদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলে এটাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার নীতি অবলম্বন করে। আব্বাসী আন্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। আবু মুসলিম খোরাসানীকে খোরাসানের দায়িত্বে নিয়োগ করার প্রাক্কালে তিনি যেসব নির্দেশ দান করেন তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, আরবদের মধ্যে ইয়ামানী এবং মুযারীর যে দ্বন্দ্ব বর্তমান রয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করে ইয়ামানীদেরকে মুযারীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল ঃ সম্ভব হলে আরবী বলতে পারে এমন একজন লোকও জীবিত রাখবে না। পাঁচ আঙ্গুল বা তার চেয়ে বড় কোন আরব শিশু সম্পর্কে তোমার সামান্যতম সন্দেহ হলে তাকে হত্যা করবে।[৭৩] এ কর্মকাণ্ডের ফল দাঁড়ায় এই যে,বনী উমাইয়াদের শাসনামলে তাদের আরবী প্রীতির ফলে আজমীদের মনে স্বজাতি পূজার (শুউবিয়্যাত) যে আগুন ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল, আব্বাসীয়দের শাসনামলে তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং তা কেবল আরবদের স্বজাতি প্রীতির বিরুদ্ধেই নয়, বরং স্বয়ং ইসলামের বিরুদ্ধেও যিন্দিকদের একটি দল সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আজমীদের (অনারবদের) মধ্যে বংশ-গোত্রের কৌলিণ্য স্পৃহা শুরু থেকেই বর্তমান ছিল। বিশেষত আরবদেরকে তারা নিজেদের তুলনায় একেবারেই নগণ্য জ্ঞান করতো। ইসলামের বিজয়কালে আরব মরুভূমির উষ্ট্রচালকদের হাতে পরাজিত হয়ে প্রথম প্রথম নিজেদেরকে ভীষণ অপমানিত বোধ করে তারা। কিন্তু ইসলসামের ন্যায় ও সাম্যনীতি এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, উম্মাতের আলেম ও ফকীহগণের দ্বীনদারীপূর্ণ কর্মপন্থা তাদের যখমে কেবল মলমই দেয়নি বরং তা তাদেরকে পূর্ণ সামাজিক সমঅধিকারসহ বিশ্বজনীন মুসলিম মিল্লাতের সাথে একীভূত করতে থাকে। সরকারের প্রশাসনিক নীতিও যদি এ নীতির সহায়ক হতো, তাহলে কোন অ-আরবের মনে স্বতন্ত্র অনুভূতি সৃষ্টি হতো না। সৃষ্টি হতো না স্বজাতি পূজার উদ্দীপনা। কিন্তু তাদের সাথে অবমাননাকর ব্যবহারের ফলে বনী উমাইয়াদের অন্ধ আরব প্রীতি (ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি) তাদের মধ্যে প্রতিহিংসার জন্ম দেয় এবং পরে আব্বাসীয়রা এটিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে তার পরিপুষ্টি এবং বিস্তৃতি লাভের সুযোগ করে দেয়। আমাদের তরবারীর বলে নূতন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে আমরাই তাতে কর্তৃত্ব করবো এবং আরবী নেতৃত্ব শেষ করে দেবো। তাদের এ প্রত্যাশা যথার্থ ছিল এবং তা পূর্ণও হয়েছিল।

আল জাহেয বলেন, আব্বাসীয়দের সাম্রাজ্য খোরাসানী রাজত্বে পর্যবসিত হয়েছিল।[৭৪] মনসূরের খেলাফতকালে সিপাহসালার এবং গবর্ণরের অধিকাংশ পদে আজমীদের নিয়োগ করা হয় এবং

---

৭৩. ইবনুল আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৫। আল-বেদায়া, ১০ খণ্ড , পৃষ্ঠা-২৮। ইবনে খালদুন ঃ ৩য় খণ্ড, ১০৩।

৭৪. আল-বয়ান ওয়াত-তাবঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১। মাতবাআতুল ফুতুহিল আদবীয়্যাহ, মিসর, ১৩৩২ হিজরী।

আরবদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে।[৭৫] আল জিহশিয়ারী তারীখুল ওযারায় (উযীরদের ইতিবৃত্ত) মনসূরের শাসনকর্তাদের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে সব আজমীকেই দেখতে পাওয়া যায়।[৭৬] এ সকল আজমীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে শুউবী আন্দোলন শুরু করে। বাস্তবতার নিরিখে এটা নিছক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই ছিল না, বরং এ আন্দোলনের মর্মমূলে নাস্তিক্যবাদের বীজানুও উপ্ত ছিল।

আজমীদের ওপর আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই–এ বিতর্ক থেকেই শুউবি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই এ অন্দোলন আরব বিরোধিতার রূপ ধারণ করে এবং আরব এমনকি কুরায়েশ সহ তাদের একটি গোত্রের নিন্দায় গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। ইবনে নদীম–এর 'আল–ফিরিস্তিতে' আমরা এ সকল গ্রন্থের বর্ণনা দেখতে পাই। মধ্যপন্থী শুউবীরা এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়নি, কিন্তু তাদের চরমপন্থীরা আরও অগ্রসর হয়ে স্বয়ং ইসলামের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। আর আজমী আমীর–উযীর–সচিবরা এবং সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা গোপনে তাদের প্রেরণা যোগায়। আল–জাহেয বলেন ঃ "এমন বহু লোক যাদের অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে সংশয় ছিল, তাদের মধ্যে শুউবিয়্যাত থেকে এ রোগ সংক্রমিত হয়। আরবরা ইসলামের প্রচারক বলে তারা ইসলামের প্রতি রুষ্ট।"[৭৭] এরা মানী, জরথুষ্ট ও মাযদাক–এর ধর্ম–বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা জীবন্ত করে তুলতে শুরু করে। শুরু করে আজমী সংস্কৃতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মাহাত্ম বর্ণনা। কাব্য–সাহিত্যের অন্তরালে তারা পাপ, অনাচার এবং নৈতিক দেউলিয়াপনা বিস্তার করতে থাকে। ধর্ম এবং ধর্মীয় বিধি–বিধানের উপহাস করতে থাকে। মদ–জুয়ার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায়। ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানকে কটাক্ষ করতে থাকে। পরকাল এবং বেহেশত দোযখের কথা যারা বলতো, তাদেরকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। ইসলামকে বিকৃত করার মানসে এদের অনেকে মিথ্যা হাদীস রচনা করে তা প্রচার করে। ইবনে আবিল আওজা নামক জনৈক যিন্দীককে গ্রেফতার করা হলে সে স্বীকার করে যে, ৪ হাযার মিথ্যা হাদীস রচনা করে তার মাধ্যমে হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করেছে এবং ইসলামের আইন–কানুনে রদবদল করেছে। মনসুরের শাসনকালে কুফার গবর্ণর মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আলী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৭৮] ইউনুস ইবনে আবি ফারওয়া নামে অপর এক ব্যক্তি ইসলাম ও আরবদের নিন্দা করে গ্রন্থ রচনা করে এবং রুম এর শাসনকর্তা কাইজার–এর দরবারে তা পেশ করে এনাম লাভ করে।[৭৯] আল–জাহেয আজমী সচীবদের এক বিরাট অংশ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, এরা কুরআনের বিন্যাসের সমালোচনা করে, এর মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে দাবী করে, হাদীসকে অস্বীকার করে এবং তার সত্যতায় সংশয় সৃষ্টি করে। সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী স্বীকার করতে তাদের কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে আসে। কাযী

৭৫. আল–মাসউদী ঃ মুরুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৫১৫, সাআদা সংস্করণ মিসর, ১৯৫৮ ইং; আল মাকরিযী—কিতাবুস সুলুক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–১৫, দারুল কিতাব মিসর, ১৯৩৪ ইং।

৭৬. দিয়ানা সংস্করণ, ১৯২৬ ইং, পৃষ্ঠা–১৩৯, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭।

৭৭. কিতাবুল হায়ওয়ান, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৮, মিসর, ১৯০৬ সালের সংস্করণ।

৭৮. আল–বেদায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩।

৭৯. আমালিল মুরতাযা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০–১০০, সাআদা সংস্করণ, মিসর ১৯০৭ ইং।

শুরাইহ,হাসান বসরী এবং আশ-শাবীর প্রসঙ্গ উঠলে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু ইয়দশের ববকান এবং নওশেরাউঁয়ার প্রসঙ্গ এলে তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।[৮০] এ সময়ের বড় বড় নাম করা আজমীদের সম্পর্কে আবুল আ'লা আল-মাআররী বলেন, এদের সবাই ছিল যিন্দীক। উদাহারণ স্বরূপ দে'বেল, বাশ্‌শর ইবনে বুদ, আবু নোয়াস এবং আবু মুসলিম খোরাসানী প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন।[৮১] এ সব যিন্দীক সুলভ চিন্তাধারা কেবল ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কার্যত নৈতিক বন্ধন হতে মুক্তি ছিল এর অপরিহার্য অংশ। ইবনে আবদে রাব্বিহী বলেন ঃ শূরা, ব্যভিচার এবং উৎকোচ যিন্দীক সুলভ চিন্তাধারা অপরিহার্য অংশ— জনগণ তা ভাল করেই জানতো।[৮২]

খলীফা মনসুরের শাসনকালে (১৩৬—১৫৮ হিজরী, ৭৫৪-৭৭৫ খৃষ্টাব্দ) এ ফেতনা সর্বতোভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এটা মুসলমানদের মধ্যে কেবল আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক বিকৃতির আশংকাই সৃষ্টি করেনি বরং সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে এটা মুসলিম সমাজ এবং রাষ্ট্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবে—সে আশংকাও ছিল। আল-মাহদী তাঁর নিজ খান্দানের কূটনীতির এ আশংকাজনক পরিণতি দেখে শংকিত হয়ে ওঠেন। তিনি শক্তি প্রয়োগে এ আন্দোলনকে নির্মূল করার চেষ্টাই কেবল করেননি, বরং যিন্দীকদের সাথে বিতর্ক করা এবং তাদের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি একদল আলেমকেও নিয়োগ করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে গণমনে এরা যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছিল, জনগণের মন থেকে তা দূর করার জন্য এ সকল গ্রন্থ রচিত হয়।[৮৩] তাঁর শাসনে ওমর আল-কালওয়াযীর অধীনে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করা হয়। যিন্দীকসুলভ চিন্তাধারার মূলোৎপাটন এবং যিন্দীকদের বিলোপ সাধনই ছিল এ বিভাগের কাজ। [৮৪] নিজ পুত্র আল-হাদীকে তিনি যে সকল নির্দেশ দেন, তা থেকে অনুমান করা যায়, তিনি যিন্দীকদেরকে কত বড় বিপদ মনে করতেন। তিনি বলেন ঃ

"আমার পরে এ রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব তোমার হাতে এলে মানীর অনুসারীদের মূলোৎপাটনের কোন ত্রুটি করবে না। এরা প্রথমে জনসাধারণকে বাহ্যিক কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে, যথা ঃ অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা, দুনিয়ায় দরবেশীর জীবন যাপন এবং পরকালের জন্য কাজ করা। এরপর তারা জনগণকে দীক্ষা দেয় যে, গোশত হারাম, পানি স্পর্শ করা উচিত নয় (অর্থাৎ গোসল করা ঠিক নয়) কোন জীব হত্যা করা ঠিক নয়। এরপর তাদেরকে দুই খোদার প্রতি বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ এবং পেশাব দ্বারা গোসল করাকেও হালাল করে। বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে তারা শিশু চুরি করে। [৮৫]

---

৮০. ছালাছু রাসায়েল লিল-জাহেয, পৃষ্ঠা ৪২, সালকিয়া সংস্করণ, কায়রো ১৩৪৪ হিঃ
৮১. আল-গোফরানা দাবুল মায়ারেফ, মিশর-১৯৫০ ইং।
৮২. আল-ইকদুল ফরীদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-১৭৯।
৮৩. আল-মাসউদী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৫। আল-মাকরিযী- কিতাবুস সুলুক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫।
৮৪. আত-তাবারী, ৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯১-৩৮৯। আল-বেদায়া ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৯।
৮৫. আত-তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৩, ৪৩৪।

আল–মাহদীর এ বর্ণনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে , সে সময়ের আজমী যিন্দীকরা বাহ্যত মুসলমান সেজে ভেতরে ভেতরে তাদের প্রাচীন ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সচেষ্ট ছিল। আল–মাসউদীর বর্ণনা মতে মনসুরের শাসনকালে পাহলবী এবং ফারসী ভাষা থেকে সে সব গ্রন্থ অনুদিত হয়েছে। এবং ইবনে আবু আওজা, হাম্মাদ আজরাদ, ইয়াহিয়া ইবনে যিয়াদ, মূতী ইবনে ইয়াস–এর মতো লোকদের গ্রন্থাদি এ বিষ ছড়াচ্ছিল। ৮৬

উম্মাতের প্রতিক্রিয়া

খেলাফতে রাশেদার স্থলে রাজতন্ত্রের পত্তনের ফলে যে সকল পরিবর্তন সূচিত হয়, এটা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের নিজের ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করা এবং জোরপূর্বক তা প্রতিষ্ঠা করার পরিণতি কি দাঁড়ায় ; এ থেকেই তা অনুমান করা যায়। এ ভুল করার সময় তার কাজের পরিণতির অনুভূতি না থাকলেও এবং এর এ পরিণতি হোক এমন ইচ্ছা সে পোষণ না করলেও তার এ স্বাভাবিক পরিণতি দেখা দিতে বাধ্য।

কিন্তু এ সকল রাজনৈতিক পরিবর্তন ইসলামী জীবন বিধানের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়েছিল— এমন ধারণা করা মারাত্মক ভুল হবে। কেউ কেউ অত্যন্ত ভাসাভাসাভাবে ইতিহাস অধ্যয়ন করে নির্দ্বিধায় ফায়সালা করে বসেন যে, ইসলাম তো কেবল ৩০ বছর চলেছিল, এরপরই তার অবসান ঘটেছে। অথচ সত্যিকার পরিস্থিতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্মুখে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ কথা লিপিবদ্ধ করছি যে, মুসলিম উম্মাহ যখন এ রাজনৈতিক বিপ্লবের সম্মুখীন হলো, তখন কিভাবে তাদের সামষ্টিক অনুভূতি তাদের জীবন ব্যবস্থাকে আকড়ে ধরার জন্যে একটি পন্থা অবলম্বন করলো।

নেতৃত্বের বিভক্তি

খেলাফতে রাশেদার সত্যিকারের সৌন্দর্য ছিল এই যে, তা ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব—ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি। খলীফায়ে রাশেদ নিছক রাশেদ বা সত্যাশ্রয়ীই ছিলেন ; বরং তিনি ছিলেন মুরশেদ বা পথ প্রদর্শকও। রাষ্ট্রের কোন আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সেনাবাহিনী পরিচালনা করাই তাঁর কাজ ছিল না ; বরং সামগ্রীকভাবে আল্লার গোটা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাঁর কাজ। তাঁর সত্তায় একই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একীভূত ছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে এ নেতৃত্ব মুসলমানদের দিক দর্শনের ভূমিকা পালন করতো এবং বিশ্বাস, ধর্ম, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, আইন, শরীয়াত, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সমস্ত বিষয়ে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দায়িত্বও আঞ্জাম দিচ্ছিল। যে ভাবে ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে পরিব্যাপ্ত আছে, ঠিক তেমনি এ নেতৃত্বও সকল দিককে বেষ্টন করেছিল। মুসলমানরা পরিপূর্ণ আস্থার সাথে এ নেতৃত্বের দিক দর্শনে তাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালিত করতো।

রাজতন্ত্র যখন এ খেলাফতের স্থান গ্রহণ করে, তখন তা এ ব্যাপক নেতৃত্বের যোগ্য ছিল না ; আর মুসলমানরা এক দিনের জন্যও রাজতন্ত্রকে এ মর্যাদা দান করতে প্রস্তুত ছিল না। বাদশাহদের

৮৬. মরুজুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৫১৫।

যেসব কীর্তিকলাপ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, তারপর বাহ্যত তাদের কোন নৈতিক মান-মর্যাদা জাতির মধ্যে বজায় থাকতে পারে না। তারা জনগণের মাথা জোরপূর্বক নোয়াতে পারতো এবং তারা তা করেছিলও। ভয়-ভীতি এবং লোভ- লালসার অস্ত্র দ্বারা তারা অগণিত মানুষকে নিজেদের উদ্দেশ্যের খাদেমে পরিণত করতে পারতো এবং করেছিলও তাই। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে লোকেরা যাতে তাদেরকে ইমাম বলে গ্রহণ করে, সে জন্য তারা সাধারণ মানুষের অন্তর জয় করতে পারেনি।

এ নুতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতেই মুসলমানদের নেতৃত্ব দুভাগে ভাগ হয়ে যায় ঃ

রাজনৈতিক নেতৃত্ব

বাদশাহরা শক্তি প্রয়োগ করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশ নিজেদের করায়ত্ব করেছিল। আর যেহেতু শক্তি প্রয়োগ ছাড়া তার অপসারণ সম্ভবপর ছিল না এবং শক্তি বিহীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্ভবই ছিল না, তাই অনিচ্ছা সত্বেও মুসলিম উম্মাহ এ নেতৃত্ব গ্রহণ করে নেয়। তা আল্লাদ্রোহী নেতৃত্ব ছিল না যে, উম্মাত তা প্রত্যাখান করবে। এ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচালকরা মুসলমান ছিল। তারা ইসলাম ও ইসলামের আইন মেনে চলতো। আল্লার কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহকে তারা আইনের ভিত্তি হিসেবে মানতে কখনো অস্বীকার করেনি। তাদের শাসনে সাধারণ বিষয়াদি শরীয়াত অনুযায়ী পরিচালিত হতো। কেবল তাদের রাজনীতি দ্বীনের অনুবর্তী ছিল না। আর এ কারণেই তারা ইসলামের শাসননীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাই মুসলিম উম্মাহ ও রাষ্ট্রের শাসন-শৃংখলা বহাল, আইন-শৃংখলা রক্ষা, সীমান্ত প্রতিরোধ, দ্বীনের দুশমনদের সাথে জিহাদ, জুমা, জামাআত এবং হজ্জ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আদালতের মাধ্যমে ইসলামী আইন কানুনের প্রয়োগ অব্যাহত থাকে। সাহাবা, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন এ সব উদ্দেশ্যে তাদের নেতৃত্ব স্বীকার করে থাকলে তার অর্থ এ নয় যে, তাঁরা এ বাদশাহদেরকে সত্য-পন্থী নেতা এবং তাদের খেলাফতকে খেলাফত রাশেদা ও মুরশেদা— সত্যের ধারক-বাহক ও সত্যের পথ প্রদর্শক—বলে স্বীকার করতেন। বরং তার অর্থ ছিল এই যে, এখন তারাই উম্মাতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী— এ বাস্তব সত্যকে তারা স্বীকার করতেন।

ধর্মীয় নেতৃত্ব

দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল ধর্মীয় নেতৃত্বের। সাহাবাদের অবশিষ্টাংশ তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং উম্মাতের সদাচারী জনগোষ্ঠী এগিয়ে এসে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। যদিও তাদের নেতৃত্ব সুসংগঠিত ছিলনা, সকলে পথ প্রদর্শক (মুরশেদ) বলে স্বীকার করে নিতে পারে, এমন কোন একজন ইমাম বা নেতা যদিও ছিল না, যদিও ছিল না তার এমন কোন শক্তি-সম্পন্ন কাউন্সিল, যাতে করে কোন ধর্মীয় সমস্যা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ একটা সমাধান করা যায় আর গোটা দেশ সে সমাধান গ্রহণ করে নেয়, তবুও ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানরা সম্পূর্ণ আস্থার সাথে তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়। এরা সকলেই নিজেদের একক মর্যাদায় কাজ করতেন পৃথক পৃথক ভাবে। নৈতিক প্রভাব ও সম্ভ্রম ছাড়া তাদের কাছে অন্য কোন শক্তি ছিল না। যেহেতু এরা সকলেই একই হেদায়াতের উৎস-

আল্লার কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ থেকে আলো গ্রহণ করেন এবং সদুদ্দেশ্য নিয়ে দ্বীনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাই খুঁটি–নাটি বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে তাঁদের মেজায এবং প্রকৃতি ছিল এক ও অভিন্ন। মুসলিম জাহানের প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সকলেই মুসলমানদেরকে একই চিন্তা–চরিত্রের নেতৃত্ব দিয়ে যান।

উভয় নেতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক

এ দুপ্রকার নেতৃত্বের মধ্যে সহযোগিতা ছিল সামান্য এবং সংঘাত বা কমপক্ষে অসহযোগিতা ছিল বেশী। ধর্মীয় নেতৃত্বকে তার দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুব কমই সাহায্য করেছে। আর যতটুকু সাহায্য সে করতে পারতো ধর্মীয় নেতৃত্ব তারও অনেক কম গ্রহণ করেছে। কারণ তার সাহায্যের বিনিময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট তাকে যে মূল্য দিতে হতো, তা আদায় করতে তার ঈমান এবং বিবেক প্রস্তুত ছিল না। আর স্বয়ং উম্মাতের অবস্থা ছিল এই যে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যারাই রাজা–বাদশাহের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং যারাই তাদের নিকট থেকে কোন পদ বা পারিতোষিক গ্রহণ করেছেন, তারা অতিকষ্টে জাতির মধ্যে তাদের আস্থা বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছেন। রাজা–বাদশাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে থাকা এবং তাদের রোশানলের সামনে অটল–অবিচল থাকা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় নেতৃত্বের যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। কোন ধর্মীয় নেতা এ মানদণ্ডে না উৎরালে জাতি অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করতো। রাজা–বাদশাদের সান্নিধ্যে এসেও দ্বীনের ব্যাপারে কোন আপোষ না করলেই কেবল জাতি তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ মুসলামান তো দূরের কথা, যারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে মাথা বিক্রি করে দিয়েছিল, তারাও এমন কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের ইমাম ও ধর্মীয় নেতৃত্বের পদে বসাতে রাযী ছিল না যে তাদেরই মতো বিক্রি হয়ে গেছে অথবা ক্ষমতার দাপটে পড়ে ধর্মীয় বিধানে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করতে উদ্যত হয়েছে।

এমনি করে হিজরী প্রথম শতকের মধ্যভাগ থেকেই ধর্মীয় নেতৃত্বের পথ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পথ থেকে পৃথক হয়ে যায়।[৮৭] উম্মাতের আলেম সমাজ তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ এবং দ্বীনী জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে গ্রন্থ প্রণয়ন ও কুরআন হাদীস পঠন–পাঠন এবং ফতোয়ার যতটুকু কাজ করেছেন, তার সবটুকুই করেছেন সরকার থেকে মুক্ত থেকে, সরকারী সাহায্য ছাড়াই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের বিরোধিতার মুখে এবং সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপের কঠোর মুকাবিলা করেই করেছেন। উম্মাতের সৎকর্মশীল মুসলমানদের মন–মানস এবং চরিত্র ও আচার–আচরণ পরিশুদ্ধ করার যে

---
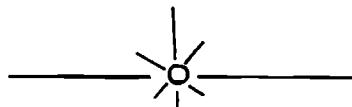
৮৭. এখানে ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য এ কথা জেনে নেয়া ফলপ্রসূ হবে যে, হিজরী ৩য় শতকে যখন আব্বাসীয় খেলাফতের পতন শুরু হয়, তখন ধর্মীয় নেতৃত্ব যথারীতি আলেম সমাজ, ফকীহ এবং উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হাতে ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমীর উমরাহ ও সুলতানরাই কার্যত এ নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে বসলেন, যাদের হাতে মূলত রাষ্ট্রের চাবিকাঠি ছিল। আর আব্বাসীয় খলীফারা নিছক রাজনৈতিক গদিনশীন হয়ে পড়লেন। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব—কোনটাই তাদের হাতে ছিল না। তারা নিছক প্রদর্শনী সুলভ ধর্মীয় সুচীতার অধিকারী ছিল, যা খেলাফতের নামে তারা লাভ করেছিলেন। এরই ভিত্তিতে তারা সুলতানদের মুকুট পরাতেন, আর সুলতানরা তাদের খোতবা এবং মুদ্রা চালাতেন।

দায়িত্ব পালন করেন, তাও ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত। অধিকন্তু এ সকল বুযর্গদের বদৌলতেই ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। রাজা-বাদশারা বড়জোর এতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন যে, দেশের পর দেশ জয় করে কোটি কোটি মানুষকে ইসলামের প্রভাব বলয়ে নিয়ে এসেছেন।

এরপর কোটি কোটি মানুষের ঈমানের বৃত্তে প্রবিষ্ট হওয়া রাজা-বাদশাদের রাজনীতির ফল ছিল না; বরং তা ছিল উম্মাতের সৎকর্মশীল পূত-পবিত্র চরিত্রের অলৌকিক ফলশ্রুতি।

ইসলামের সত্যিকার উদ্দেশ্য

কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, নেতৃত্বের এহেন বিভক্তি দ্বারা ইসলামের উদ্দেশ্য সফল হয় না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মীয় নেতৃত্ব ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের যে মহামূল্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল খেদমতের ফলেই আজ দুনিয়ায় ইসলাম টিকে আছে, আর মুসলিম মিল্লাত তাদের দ্বীনকে যথার্থ ও অবিকৃত আঙ্গিকে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ইসলামের আসল উদ্দেশ্য কেবল তখন পূর্ণ হতে পারতো, যখন উম্মাত এমন এক নেতৃত্ব লাভ করতো, যা খেলাফতে রাশেদার ন্যায় একই সংগে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয়ই হতো এবং যার রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের সমস্ত উপায় উপকরণ কেবলমাত্র দ্বীনের উদ্দেশ্য সার্থক করার কাজে ব্যয়িত হতো না, বরং এ ক্ষমতার মূল লক্ষ্যই হতো দ্বীনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। দেড় দু'শো বছর পর্যন্ত যদি ইসলামী খেলাফত এ অবস্থা টিকিয়ে রাখতে পারতো তাহলে দুনিয়ার বুকে সম্ভবত কুফরীর চিহ্নই থাকতো না, আর থাকলেও তার মাথা তুলে দাঁড়াবার সামর্থ থাকতো না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় মতবিরোধের সূচনা ও তার কারণ

যে সকল কারণে যে পরিস্থিতিতে খেলাফতে রাশেদার পতন হয়, তার অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল মুসলিম মিল্লাতের অভ্যন্তরে ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি। অতঃপর খেলাফতে রাশেদা তার যথার্থ অবয়বে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণেই এ সকল মতবিরোধ শিকড় গেড়ে বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ দেয়। কারণ, যথাসময় যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মতো নির্ভরযোগ্য এবং ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাজতন্ত্রে আদৌ বর্তমান ছিল না।

এ ফেতনার সূচনা বাহ্যত তেমন মারাত্মক ছিল না। সাইয়্যেদেনা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনকালের শেষের দিকে কিছু কিছু রাজনৈতিক অভিযোগ এবং প্রশাসনিক অভিযোগ থেকেই এ গোলযোগের উদ্ভব হয়। তখনও তা কেবল একটি গোলযোগের পর্যায়েই ছিল। এর পেছনে কোন দর্শন, মতবাদ বা ধর্মীয় আকীদা ছিল না। কিন্তু এর পরিণতিতে যখন তাঁর শাহাদাত সংঘটিত হয় এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তুমুল বিরোধ এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে, একের পর এক জামাল যুদ্ধ, সিফ্ফীন যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহ্‌রাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে, তখন নানাজনের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়—এসব যুদ্ধে কে ন্যায়ের পথে আছে এবং কেন? কে অন্যায়ের পথে আছে? তার অন্যায়ের পথে হওয়ার কারণ কি? এ সকল প্রশ্ন নানা স্থানে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। উভয় দলের কার্যকলাপের ব্যাপারে কেউ যদি নীরবতা ও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে, তাহলে কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সে এ নীতি অবলম্বন করেছে? এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। মূলত এ সকল মতবাদ ছিল নিরেট রাজনৈতিক। কিন্তু পরে এসব মতবাদের সমর্থকরা তাদের মতবাদ সুদৃঢ় করার জন্য কিছু না কিছু ধর্মীয় ভিত্তি সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করে। এমনি করে এ সব রাজনৈতিক দল ধীরে ধীরে ধর্মীয় দলে রূপান্তরিত হতে থাকে।

অতঃপর মতবিরোধের সূচনাকালে যে সকল খুন-খারাবী সংঘটিত হয় এবং পরবর্তী কালে বনী উমাইয়া এবং বনী-আব্বাসীয়দের শাসনামলে তা অব্যাহত থাকে, তার ফলে এ সকল মতবিরোধ আর নিছক বিশ্বাস ও ধারণা-কল্পনার বিরোধেই সীমিত থাকেনি, বরং তাতে এমন সব কঠোরতা দেখা দেয়, যা মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্যকে এক বিরাট সংকটের মুখে নিক্ষেপ করে। বিরোধমূলক বিতর্ক ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি বিষয় থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রতিটি নতুন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ফেরকার সৃষ্টি হয়, আর সেসব ফেরকার উদর থেকে আরও অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার জন্ম হতে থাকে। এ সব ফেরকার মধ্যে কেবল পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষই সৃষ্টি হয়নি, বরং কলহ বিবাদ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। ইরাকের কেন্দ্রস্থল কূফা ছিল এ ফেতনা ফাসাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কারণ, ইরাক অঞ্চলেই জামাল, সিফফীন এবং নাহ্‌রাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়। এখানেই জন্ম হয়েছে সকল বড় বড় ফেরকার। বনী উমাইয়া এবং পরে বনী আব্বাসীয়রা তাদের বিরোধী শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশী কঠোরতা অবলম্বন করে।

অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের এ যুগে যে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হয়, মূলত এ সবের মূলে ছিল ৪টি বড় ফেরকা ঃ শীআ, খারেজী, মুর্জিয়া এবং মু'তাযিলা। আমরা অতি সংক্ষেপে এখানে প্রতিটি ফেরকার মতবাদের সংক্ষিপ্ত সার বিবৃত করবো।

শীআ

হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক দলকে প্রথমে 'শীআনে আলী' বলা হতো। পরে পরিভাষা হিসেবে এ দলকে কেবল শীআ বলা হতে থাকে।

বনী হাশেমের কিছু লোক এবং অন্যদের মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা নবী করীম (সঃ)-এর পরে হযরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফতের জন্য যোগ্যতর ব্যক্তি মনে করতেন। অনেকের এ ধারণাও ছিল যে, তিনি অন্যান্য সাহাবা, বিশেষ করে হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ। এমনও কেউ কেউ ছিল, যারা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে আত্মীয়তার কারণে তাঁকে খেলাফতের অধিক হকদার মনে করতো। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় পর্যন্ত এ ধারণাগুলো কোন সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের আকার ধারণ করেনি। এহেন চিন্তাধারার লোকেরা তাদের সময়ের খলীফাদের বিরোধীও ছিল না। বরং তারা প্রথম তিন খলীফারই খেলাফত স্বীকার করতেন।

জামাল যুদ্ধে তালহা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ)-এর সঙ্গে, সিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর সঙ্গে এবং নাহ্রাওয়ান যুদ্ধে খারেজীদের সঙ্গে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরোধকালে বিশেষ মতবাদ সম্বলিত একটা দলের উদ্ভব হয়। অতঃপর হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাত এদেরকে আরও সংঘবদ্ধ করে, এদের উৎসাহে ইন্ধন যোগায়—শক্তি দান করে। তাদের মতবাদকে একটা সুস্পষ্ট কাঠামো দেয়। এ ছাড়াও বনী উমাইয়াদের শাসন পদ্ধতির ফলে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ঘৃণা বিস্তার লাভ করে এবং উমাইয়া-আব্বাসীয়দের যুগে আলী (রাঃ)-এর বংশধর এবং তাদের সমর্থকদের প্রতি অত্যাচার অনাচারের ফলে মুসলমানদের হৃদয়ে যে সমবেদনার উদ্ভব হয়, তা শীআদের দাওয়াতকে অসাধারণ শক্তি যোগায়। কূফা ছিল এদের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র। এদের বিশেষ মতবাদ ছিল এই ঃ

এক ঃ ইমামত (খেলাফতের পরিবর্তে এটা তাদের বিশেষ পরিভাষা) জনসাধারণের বিবেচ্য বিষয় নয়। ইমাম নির্বাচনের দায়িত্বভার জনগণের হাতে ন্যস্ত করা যায় না। জনসাধারণ ইমাম বানালেই কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে যাবে না। বরং ইমামত দ্বীনের একটি অঙ্গ, ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তি। ইমাম নির্বাচনের ভার জনগণের হাতে ন্যস্ত না করে বরং সুস্পষ্ট নির্দেশের সাহায্যে ইমাম নিযুক্ত করা, নবীর অন্যতম দায়িত্ব।[১]

দুই ঃ ইমামকে মা'সুম-নিষ্পাপ হতে হবে। অর্থাৎ তাকে ছোট-বড় সকল পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে, হতে হবে তা থেকে সংরক্ষিত। তার দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি হতে পারবে না। তার সকল কথা এবং কাজ সত্য হতে হবে।[২]

---

১. ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা—১৯৬, মুস্তফা মুহাম্মাদ প্রেস, মিসর। আশ্-শাহরিস্তানী, কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল, লণ্ডন সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৮-১০৯।

২. ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা—১৯৬। আশ্-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৯।

তিন ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর পরে ইমাম মনোনীত করেছেন। স্পষ্ট শরীয়াতের নির্দেশ মতে তিনি ইমাম।[৩]

চার ঃ পূর্ববর্তী ইমামের নির্দেশক্রমে প্রত্যেক ইমামের পরে নতুন ইমাম নিযুক্ত হবেন। কারণ, এ পদে নিয়োগের দায়িত্ব উম্মাতের হাতে ন্যস্ত হয়নি। তাই মুসলমানদের নির্বাচনক্রমে কোন ব্যক্তি ইমাম হতে পারবে না।[৪]

পাঁচ ঃ ইমামত কেবল আলী (রাঃ)-এর বংশধরদেরই হক —কেবল তাদেরই প্রাপ্য। শীআদের সকল দল-উপদল এ ব্যাপারে একমত।[৫]

এ সর্বসম্মত মতের পরে শীআদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয়। মধ্যপন্থী শীআদের মতে হযরত আলী (রাঃ) সকল মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। যে ব্যক্তি তার সাথে লড়াই করে বা বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আল্লার দুশমন। সে চিরকাল দোযখে বাস করবে। কাফের মুনাফিকদের সাথে তার হাশর হবে। আবুবকর, ওমর এবং ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)—যাদের তাঁর পূর্বে ইমাম বানান হয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের খেলাফত অস্বীকার করলে এবং তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে আমরা বলতাম যে, তিনিও দোযখী। কিন্তু তিনি যেহেতু তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, তাঁদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন, তাই আমরা তাঁর কার্যকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে পারি না। আলী (রাঃ) এবং নবী (সঃ)-এর মধ্যে আমরা নবুয়াতের মর্যাদা ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য করতে পারি না। অন্যসব ব্যাপারে আমরা তাঁকে নবীর সমমর্যাদা দেই।[৬]

চরমপন্থী শীআদের মতে হযরত আলী (রাঃ)-এর পূর্বে যেসব খলীফা খেলাফত গ্রহণ করেছেন, তারা ছিনতাইকারী। আর যারা তাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন,তারা গুমরাহ ও যালেম। কারণ, তাঁরা নবীর ওসিয়্যাত অস্বীকার করেছে, সত্যিকার ইমামকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এদের কেউ কেউ আরও কঠোরতা অবলম্বন করে প্রথম তিন খলীফা এবং যারা তাঁদেরকে খলীফা বানিয়েছে, তাদেরকে কাফেরও বলে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে নরম মত হচ্ছে যায়দিয়াদের। এরা যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (ওফাত ঃ ১২২ হিজরী—৭৪০ ঈসায়ী)-এর অনুসারী। এরা হযরত আলী (রাঃ)-কে উত্তম মনে করে। কিন্তু, এদের মতে উত্তমের উপস্থিতিতে অ-উত্তম ব্যক্তির ইমাম হওয়া অবৈধ নয়। উপরন্তু এদের মতে হযরত আলী (রাঃ)-এর স্বপক্ষে স্পষ্টত এবং ব্যক্তিগতভাবে রাসূলুল্লাহ -এর কোন নির্দেশ ছিল না। তাই এরা হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত স্বীকার করতো। তবুও এদের মতে

---

৩. আশ্-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৮। ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা—১৯৬-১৯৭।

৪. ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা—১৯৭, আল-আশআরী ঃ মাকালাতুল ইসলামিইঈন, আন-নাহজাতুল মিসরিয়া লাইব্রেরী, কায়রো, ১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৭। আশ্-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৯।

৫. আশ্-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৮।

৬ ইবনু আবিল হাদীদ, নাহজুল বালাগার ভাষ্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫২০।

ফাতেমার বংশধরদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তির ইমাম হওয়া উচিত। তবে এ জন্য শর্ত এই যে, তাকে বাদশাদের বিরুদ্ধে ইমামতের দাবী নিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং ইমামতের দাবী করতে হবে।[৭]

খারেজী

শীআ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদের অধিকারী দলটি ছিল খারেজী। সিফ্ফীন যুদ্ধকালে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন নিজেদের মতবিরোধ নিরসনে দু'জন লোককে সালিস নিযুক্তিতে সম্মত হন, ঠিক সে সময় এ দলের উদ্ভব হয়। তখন পর্যন্ত এরা হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিল। কিন্তু সালিস নিযুক্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে হঠাৎ এরা বিগড়ে যায়। এরা বলে ঃ আল্লার পরিবর্তে মানুষকে ফায়সালাকারী স্বীকার করে আপনি কাফের হয়ে গেছেন। অতঃপর এরা আপন মতবাদের ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে যায়। যেহেতু এরা ছিল চরম কঠোর মনোভাব সম্পন্ন। উপরন্তু এরা নিজেদের থেকে ভিন্ন মতবাদ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং যালেম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার সমর্থক ছিল, তাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত এরা খুন-খারাবী চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় শাসনামলে এদের শক্তি নির্মূল হয়ে যায়।

এদেরও সবচেয়ে বেশী শক্তি ছিল ইরাকে। বসরা এবং কূফার মধ্যবর্তী আল-বাতায়েহ্ নামক স্থানে এদের বড় বড় আখড়া ছিল। এদের মতবাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ এরা হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকে বৈধ স্বীকার করতো। কিন্তু এদের মতে খেলাফতের শেষের দিকে হযরত ওসমান (রাঃ) ন্যায় এবং সত্যচ্যুত হয়েছেন। তিনি হত্যা বা পদচ্যুতির যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ ছাড়া মানুষকে সালিস নিযুক্ত করে হযরত আলী (রাঃ)-ও কবীরা গুনাহের ভাগী হয়েছেন। উপরন্তু উভয় সালিস অর্থাৎ হযরত আমর ইবনুল আ'স, এদেরকে সালিস নিযুক্তকারী অথাৎ হযরত আলী (রাঃ) এবং মুআবিয়া ও এদের সালিসীতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আলী (রাঃ) এবং মুআবিয়া (রাঃ)-এর সকল সাথীই গুনাহগার ছিল। হযরত তালহা যোবায়ের এবং উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সমেত জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই বিরাট পাপের ভাগী ছিলেন।

দুই ঃ তাদের মতে পাপ কুফরীর সমার্থক। সকল কবীরা গুণাহকারীকে এরা কাফের বলে আখ্যায়িত করে (যদি তারা তাওবা করে গুণাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে)। তাই, ওপরে যেসব বুযর্গের উল্লেখ করা হয়েছে, এরা তাঁদের সকলকেই প্রকাশ্যে কাফের বলতো। বরং তাঁদেরকে অভিসম্পাত করতে এবং গালী-গালাজ করতেও এরা ভয় পেতো না, উপরন্তু সাধারণ মুসলমানকেও এরা কাফের বলতো। কারণ, প্রথমত, তারা পাপমুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত সাহাবীদেরকে তারা কেবল মুমিনই স্বীকার করতো না, বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করতো। তাদের বর্ণীত হাদীস থেকে শরীয়াতের বিধানও প্রমাণ করেন।

তিন ঃ খেলাফত সম্পর্কে তাদের মত এই ছিল যে, কেবল মুসলমানদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

---

৭. আল-আশআরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৯। ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা—১৯৭-১৯৮। আশ্-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা— ১১৫-১১৭।

চার : খলীফাকে কুরাইশী বংশোদ্ভূত হতেই হবে এ কথা তারা স্বীকার করতো না। তারা বলতো, কুরাইশী, অ-কুরাইশী—যাকেই মুসলমানরা নির্বাচিত করে, সে-ই বৈধ খলীফা।

পাঁচ : তারা মনে করতো যে, খলীফা যতক্ষণ ন্যায় এবং কল্যাণের পথে অটল-অবিচল থাকে, ততক্ষণ তার আনুগত্য ওয়াজেব। কিন্তু সে যদি এ পথ থেকে বিচ্যুত হয় তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাকে পদচ্যুত এবং হত্যা করাও ওয়াজেব।

ছয় : কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসেবে মানতো। কিন্তু হাদীস এবং ইজমার ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

•

এদের একটি বড় দল—যাদেরকে 'আন-নাজদাত' বলা হয়—মনে করতো যে, খেলাফত তথা রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা আদতেই অপ্রয়োজনীয়—এর কোন দরকার নেই। মুসলমানদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সামাজিক ভাবে কাজ করা উচিত। অবশ্য তারা যদি খলীফা নির্বাচন করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে, তা-ও করতে পারে তারা। এমনটি করাও জায়েজ—বৈধ।

এদের সবচেয়ে বড় দল আযারেকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। এদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেয়া খারেজীদের জন্য জায়েয নয়। অন্য কারো জবাই করা পশু তাদের জন্য হালাল নয় ; কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েয নয়। খারেজী আর অ-খারেজী একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা অন্য সব মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরযে আইন মনে করতো। তাদের স্ত্রী-পুত্র হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাকে 'মোবাহ' মনে করতো। তাদের নিজেদের মধ্যকার যেসব লোক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না, তাদেরকেও কাফের মনে করতো। তারা তাদের বিরোধীদের ধন-সম্পদ আত্মসাত করাকে হালাল মনে করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো!

এদের সবচেয়ে নমনীয় দল ছিল ইবাদিয়া। এরা সাধারণ মুসলমানকে কাফের বললেও মুশরিক বলা থেকে বিরত থাকতো। তারা বলতো "এরা মু'মিন নয়।" অবশ্য তারা মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতো। এদের সাথে বিবাহ-শাদী এবং উত্তরাধিকারীকে বৈধ জ্ঞান করতো। এরা তাদের অঞ্চলকে দারুল কুফর বা দারুল হারব নয়, বরং দারুত-তাওহীদ মনে করতো। অবশ্য সরকারের কেন্দ্রকে এরা দারুত-তাওহীদ মনে করতো না। গোপনে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করাকে তারা অবৈধ মনে করতা। অবশ্য প্রকাশ্য যুদ্ধকে তারা বৈধ মনে করতো।[৮]

---

৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : আবদুল কাহের বাগদাদী : আল-ফারকু বাইনাল ফেরাক, আল-মায়ারেফ প্রেস, মিসর, পৃষ্ঠা—৫৫, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৮২, ৮৩, ৯৯, ৩১৩, ৩১৪, এবং ৩১৫।
আশ-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭৮, ৯০, ৯১,৯২, এবং ১০০।
আল-আশআরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫২, ১৫৭, ১৫৯, ১৮৯, ১৯০। আল-মাসউদী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯১।

মুর্জিয়া

শিআ এবং খারেজীদের চরম পরস্পর-বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়া একটি তৃতীয় দলের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ দলটিকে মুর্জিয়া বলে অভিহিত করা হয়। হযরত আলী (রাঃ)-এর বিভিন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু লোক তাঁর পূর্ণ সমর্থক এবং কিছু লোক তার চরম বিরোধী ছিল। একটি দল নিরপেক্ষও ছিল। এরা গৃহযুদ্ধকে ফেতনা মনে করে দূরে সরে ছিল অথবা এ ব্যাপারে কে ন্যায়ের পথে আর কে অন্যায়ের পথে আছে এ সম্পর্কে সন্ধিগ্ন ছিল। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে খুন-খারাবী একটি বিরাট অন্যায়—এ কথা তারা অবশ্যই উপলব্ধি করতো। কিন্তু এরা সংঘর্ষে লিপ্ত কাউকে খারাপ বানাতে প্রস্তুত ছিল না। তারা এ বিষয়ের ফায়সালা আল্লার হাতে ছেড়ে দিতো—কিয়ামতের দিন তিনিই ফায়সালা করবেন, কে ন্যায়ের পথে আছে আর কে অন্যায়ের পথে এ পর্যন্ত তাদের চিন্তাধারা সাধারণ মুসলমানদের চিন্তাধারা বিরোধী ছিল না। কিন্তু শিআ এবং খারেজীরা যখন তাদের চরম মতবাদের ভিত্তিতে কুফরী আর ঈমানের প্রশ্ন উঠাতে শুরু করে এবং তা নিয়ে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্কের সিলসিলা শুরু হয় তখন এ নিরপেক্ষ দলটিও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে স্বতন্ত্র ধর্মীয় দর্শন দাঁড় করায়। এদের ধর্মীয় দর্শনের সার সংক্ষেপ এই ঃ

এক ঃ কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের মা'রেফাতের নামই ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত নয়। তাই, ফরয পরিত্যাগ এবং কবিরা গুণাহ করা সত্ত্বেও একজন লোক মুসলমান থাকে।

দুই ঃ নাজাত কেবল ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। কেবল শির্ক থেকে বিরত থেকে তাওহীদ বিশ্বাসের ওপর মৃত্যু বরণই মানুষের নাজাতের জন্য যথেষ্ট।[৯]

কোন কোন মুর্জিয়া আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলে যে, শির্ক থেকে নিকৃষ্ট যতবড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে।[১০] কেউ কেউ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলে যে, মানুষ যদি অন্তরে ঈমান পোষণ করে এবং সে যদি দারুল ইসলামেও বসে—যেখানে কারো পক্ষ থেকে কোন আশংকা নেই—মুখে কুফরী ঘোষণা করে, বা মূর্তি পূজা করে বা ইয়াহুদীবাদ-খৃষ্টবাদ গ্রহণ করে—এতদসত্ত্বেও সে কামেল ঈমানদার, আল্লার ওলী এবং জান্নাতী।[১১]

এসব চিন্তাধারা পাপাচার ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপ এবং যুলুম নির্যাতনকে বিরাট উৎসাহ যুগিয়েছে। মানুষকে আল্লার ক্ষমার আশ্বাস দিয়ে পাপাচারে উৎসাহী করে তুলেছে।

এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, আমর বিল মা'রুফ এবং নাহী আনিল মুনকার—ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ—এর জন্য যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়—তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকার ছাড়া অন্যদের খারাপ কাজে বাধা দেয়া

---

৯. আশ্-শাহরীস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৩, ১০৪, আল-আশআরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯৮,২০১।
১০. আশ্-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৪।
১১. ইবনে হাযম্ ঃ আল-ফাস্ল্ ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০৪, আলমাতবাআতুল আদাবীয়্যা, মিসর, ১৩১৭ হিজরী।

নিঃসন্দেহে জায়েয—কিন্তু সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়।[১২] আল্লামা আবুবকর জাস্‌সাস এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হস্ত সুদৃঢ় করেছে। অন্যায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মু'তাযিলা

এ সংঘাত মুখর যুগে একটি চতুর্থ মতবাদও জন্ম নেয়। ইসলামের ইতিহাসে যা ইতিযাল নামে অভিহিত। অবশ্য প্রথম তিনটি দলের মতো এ দলের জন্মও নিরেট রাজনৈতিক কার্যকারণের পরিণতি ছিল না। তা সত্ত্বেও এ দলটি সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে কতিপয় সুস্পষ্ট দর্শন উপস্থাপিত করেছে ; মতবাদ এবং চিন্তাধারার লড়াইয়ে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। সমকালীন রাজনৈতিক কার্যকারণের ফলে সারা মুসলিম জাহানে, বিশেষ করে ইরাকে যে মতবাদের দ্বন্দ্ব চলছিল, তাতে তারা শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছে। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিল ওয়াসেল ইবনে আতা (৮০—১৩১ হিজরী ঃ ৬৯৯—৭৪৮ ঈসায়ী) এবং আমর ইবনে ওবায়েদ (মৃত্যু ঃ ১৪৫ হিজরী—৭৬৩ ঈসায়ী)। প্রথম দিকে বসরা ছিল এদের আলোচনার কেন্দ্রস্থল।

এদের রাজনৈতিক মতবাদের সার-সংক্ষেপ এই ঃ

এক ঃ এদের মতে ইমাম নিযুক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজেব। আবার কোন কোন সময় মু'তাযিলার মতে ইমামের আদৌ কোন প্রয়োজনই নেই। উম্মাত নিজে যদি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে ইমাম নিযুক্তি অর্থহীন।[১৩]

দুই ঃ এদের মতে ইমাম নির্বাচনের ভার উম্মাতের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। উম্মাতের নির্বাচনক্রমেই ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪] কোন কোন মু'তাযিলা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করে বলে যে, ইমামত কায়েম করার জন্য সমস্ত উম্মাতের একমত হওয়া প্রয়োজন। বিপর্যয় এবং মতভেদের পরিস্থিতিতে ইমাম নিযুক্ত করা যায় না।[১৫]

তিন ঃ এদের মতে উম্মাত নিজের ইচ্ছামতো যে কোন সৎ এবং যোগ্য মুসলমানকে ইমাম বানাতে পারে। এ ব্যাপারে কুরায়শী, অ-কুরায়শী, আরবী বা আজমীর কোন শর্ত নেই।[১৬] কোন কোন মু'তাযিলা আরও অগ্রসর হয়ে বলে যে, আজমীকে ইমাম করাই শ্রেয়। বরং মুক্ত ক্রীতদাসকে ইমাম করা হলে তা আরও উত্তম। কারণ, ইমামের সমর্থক সংখ্যা অধিক না থাকলে যুলুম-নির্যাতন কালে তাকে অপসারণ করা সহজ হবে।[১৭] যেন সরকারকে স্থিতিশীল করার তুলনায় শাসকদেরকে কিভাবে সহজে অপসারণ করা যায় সেই চিন্তাই এদের বেশী।

---

১২. আল-জাস্‌সাস ঃ আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪০।
১৩. আল-মাসউদী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯১।
১৪. আল মাসউদী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা—১৯১
১৫. আশ্‌-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫১।
১৬. আল-মাসউদী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯১।
১৭. আশ্‌-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৩।

চার ঃ এদের মতে দুষ্কৃতিকারী ইমামের পেছনে সালাত জায়েয নয়।[১৮]

পাঁচ ঃ আমর বিল মারুফ এবং নিহী আনিল মুনকার—ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কার্য থেকে বারণও এদের অন্যতম মূলনীতি। বিদ্রোহের ক্ষমতা থাকলে এবং বিপ্লব সফল করার সম্ভাবনা থাকলে অন্যায়-অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে এরা ওয়াজেব মনে করতো।[১৯] এ কারণে এরা উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদ (১২৫—১২৬ হিজরী ঃ ৭৪৩—৭৪৪ ঈসায়ী)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এরা অংশ গ্রহণ করে। এবং তাঁর পরিবর্তে ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদকে ক্ষমতাসীন করার চেষ্টা করে। কারণ, তিনি তাদের সমমনা মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[২০]

ছয় ঃ খারেজী এবং মুর্জিয়াদের মধ্যে কুফর এবং ঈমানের ব্যাপারে যে বিরোধ চলে আসছিল, সে ব্যাপারে এদের নিজস্ব ফায়সালা এই ছিল যে, পাপী মুসলমান মু'মিনও নয়, কাফেরও নয় ; বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।[২১]

এ সব মতবাদ ছাড়াও সাহাবাদের মতবিরোধ এবং অতীত খেলাফতের ব্যাপারেও এরা নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। ওয়াসেল ইবনে আতার উক্তি ছিল ঃ জামাল এবং সিফফীন যুদ্ধের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনও এক পক্ষ ফাসেক ছিল। কিন্তু কোন পক্ষ ফাসেকী কাজ করেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা চলে না। এ কারণে এরা বলতো যে, আলী, তালহা এবং যোবায়ের (রাঃ) যদি এক আঁটি তরকারীর ব্যাপারেও সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও আমি এদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবো না। কারণ, এদের ফাসেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমর ইবনে ওবায়েদের মতে উভয় পক্ষই ফাসেক ছিল।[২২] এরা হযরত ওসমান (রাঃ)-এরও কঠোর সমালোচনা করে। এমনকি এদের কেউ কেউ হযরত ওমর (রাঃ)-কেও গাল-মন্দ দেয়।[২৩] এছাড়াও অনেক মুতাযিলা ইসলামী আইনের উৎসের মধ্য থেকে হাদীস এবং ইজমাকে প্রায় বাতিলই করে।[২৪]
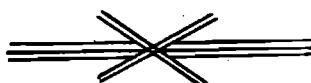
বৃহত্তম অংশের অবস্থা

এ সব দ্বন্দ্ব মুখর এবং চরমপন্থী দলগুলোর মধ্যে মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও আদর্শ সর্বসম্মতভাবে চলে আসছিল সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাধারণত সাহাবা-তাবেঈন এবং সাধারণ মুসলমানরা শুরু থেকে সেগুলোকেই

১৮. আল-আশআরী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৪।
১৯. আল-আশআরী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৫।
২০. আল-মাসউদী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯০, ১৯৩, আস্ সুয়ূতী ঃ তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা—২৫৫, গবর্ণমেন্ট প্রেস, লাহোর ১৮৭০ ঈসায়ী।
২১. আল-ফারকু বাইনাল ফেরাক, পৃষ্ঠা—৯৪-৯৫।
২২ আল-ফারক বাইনাল ফেরাক, পৃষ্ঠা—১০০,১০১, আশ-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৪।
২৩. ঐ, পৃষ্ঠা—১৩৩-১৩৪, আশ-শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪০।
২৪. ঐ, পৃষ্ঠা—১৩৮-১৩৯।

ইসলামী মূলনীতি ও আদর্শ মনে করতেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বড়জোর শতকরা ৮/১০ জন এ ফেরকাবাদীতে প্রভাবিত হয়েছে। অবশিষ্ট সকলেই ছিল গণ মানুষের চিন্তা-বিশ্বাসের ওপর অটল-অবিচল।

কিন্তু মতবিরোধের যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর সময় পর্যন্ত কেউই বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের মতামত যথারীতি ব্যাখ্যা করেননি। কেউ তাকে একটা স্বতন্ত্র চিন্তাধারার রূপ দেননি। বরং বিভিন্ন ফকীহ মুহাদ্দিস বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের উক্তি, ফতোয়া, বর্ণনা-ঐতিহ্য এবং কর্মধারার মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে ইসলামী চিন্তধারার ব্যাখ্যা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, রাজতন্ত্রের সূচনার সাথে সাথে নেতৃত্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ঃ রাজনৈতিক নেতৃত্ব শাসক শ্রেণীর হাতে ছিল এর চাবি কাঠি। দুই ঃ দ্বীনি নেতৃত্ব উম্মাতের আলেম সমাজ এবং সত্যনিষ্ঠ লোকেরা এ নেতৃত্ব গ্রহণ করে। নেতৃত্বের এহেন বিভক্তির কার্যকারণ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ বিভক্তির যুগে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধরন-প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাও উল্লেখ করেছি। যারা উম্মাতের দ্বীনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কেমন ছিলেন, সে সময়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলো তাঁরা কিভাবে সমাধান করেছিলেন, এখন এক নযরে আমরা তা দেখতে চাই। এ উদ্দেশ্যের জন্যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-কে দ্বীনি নেতৃত্বের একজন প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করে এখানে তাঁর কার্যাবলী পেশ করবো। তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) কিভাবে তাঁর কার্য সমাপ্ত করেছিলেন, অতঃপর আমরা তা-ও উল্লেখ করবো।

সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস

তাঁর নাম ছিল নো'মান ইবনে সাবেত। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে হিজরী ৮০ সালে (৬৯৯ খৃষ্টাব্দ) কুফায় তাঁর জন্ম। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তখন উমাইয়া খলীফা। আর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইরাকের গবর্ণর। তিনি তাঁর জীবনের ৫২ বছর উমাইয়াদের শাসন কালে এবং ১৮ বছর আব্বাসীয়দের শাসনামলে কাটান, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর । ওমর ইবনে আবদুল আযীযের যমানায় তিনি তরুণ। ইয়াযীদ ইবনুল মুহাল্লাব, খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কাসরী এবং নসর ইবনে সাইয়্যার প্রমুখ ইরাকের শাসনকর্তাগণের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ শাসন কাল তাঁর চোখের সামনে কেটেছে। উমাইয়াদের শেষ গবর্ণর ইবনে হুবায়রার যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি নিজে। আর তাঁর সামনেই আব্বাসীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। তাঁর নিজের শহর কুফা ছিল এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। বাগদাদ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কুফাই ছিল কার্যত নব-উদ্ভূত আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত। খলীফা মনসুরের শাসনামলে হিজরী ১৫০ সালে (৭৬৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাঁর খান্দান প্রথমত ছিল কাবুলের অধিবাসী। তাঁর দাদা—যার নাম কেউ যাওতা আর কেউ যূতা লিখেছেন—যুদ্ধে বন্দী হয়ে কুফায় নীত হন এবং মুসলমান হয়ে বনী তাইমুল্লা গোত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় (patronage) এখানে অবস্থান করেন। ব্যবসায় ছিল তাঁর পেশা। হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সাথে এতদূর সম্পর্ক ছিল যে, তিনি কখনো কখনো তাঁর কাছে হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাতেন।[১] তাঁর পুত্র সাবেত (ইমাম আবু হানিফার পিতা)-ও কুফায় ব্যবসা করতেন। স্বয়ং ইমামের এক বর্ণনায় জানা যায় যে, কুফায় তাঁর রুটির দোকান (Bakery) ছিল।[২]

---

১. আল-কারদারী ঃ মানাকেবুল ইমামিল আ'যাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৫-৬৬, ১ম সংস্করণ, ১৩২১ হিজরী, দায়েরাতুল মাআ'রেফ হয়দারাবাদ।

২. আল-মাক্কী, আল-মুয়াফ্‌ফাক ইবনে আহমাদ, মানাকেবুল ইমামিল আ'যাম আবি হানীফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬২, ১ম সংস্করণ, ১৩২১ হিজরী, দায়েরাতুল মাআ'রেফ, হায়দারাবাদ।

ইমামের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজের বর্ণনা এই যে, প্রথমত তিনি কেরাআত, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি সে সময়ের প্রচলিত সকল জ্ঞানই অধ্যয়ন করেন।[৩] অতঃপর তিনি কালাম শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং দীর্ঘ দিন ধরে এর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে এতটুকু পর্যন্ত উন্নতি করেন যে, এ বিষয়ে তাঁর দিকে সবাই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে শুরু করে। তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদ যুফার ইবনুল হোযাইলের বর্ণনা মতে ইমাম তাঁকে বলেন ঃ "প্রথমে কালাম শাস্ত্রের প্রতি আমার আসক্তি ছিল। এতে আমি এমন পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিলাম যে, লোকেরা এ ব্যাপারে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতো।[৪] অপর এক বর্ণনায় ইমাম নিজেই বলছেন ঃ

"আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম, ইলমে কালামের আলোচনায় যার দক্ষতা ছিল। এক সময় এমন ছিল যে, আমি এসব বিতর্ক আলোচনায় মশগুল থাকতাম। অধিকাংশ মতবিরোধের কেন্দ্রস্থল যেহেতু বসরায়ই ছিল, তাই আনুমানিক বিশ বার আমি সেখানে গিয়েছি। কখনো কখনো ছ'মাস—এক বছর সেখানে অবস্থান করে খারেজীদের বিভিন্ন দল—এবাযিয়া ছুফরিয়া ইত্যাদি এবং হাশবিয়্যাদের নানা উপদলের সাথে বিতর্ক-যুদ্ধ করেছি।[৫]

এথেকে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যেতে পারে যে, তিনি তৎকালীন দর্শন, তর্কশাস্ত্র (মানতেক) এবং ধর্মীয় বিরোধ সম্পর্কিত বিষয়াবলীতেও অবশ্যই প্রচুর জ্ঞান লাভ করে থাকবেন। কারণ, এ ছাড়া কেউ কালাম শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে না। উত্তরকালে তিনি আইন শাস্ত্রে ন্যায়ানুগ যুক্তি প্রয়োগ এবং বুদ্ধি ব্যবহারের যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, বড় বড় জটিল সমস্যা সমাধানে যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তা ছিল এ প্রাথমিক মানস গঠনের ফলশ্রুতি।

দীর্ঘ দিন যাবৎ এ কাজে মশগুল থাকার পর কালাম শাস্ত্রের কূটতর্ক এবং বাদানুবাদের প্রতি তাঁর মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তিনি ফিকাহ (ইসলামী আইন)-এর প্রতি মনযোগ দেন। এখানে স্বভাবত-ই আহলুল হাদীসদের চিন্তাধারার প্রতি তাঁর আসক্তি হতে পারেনি। তখন ইরাকের আসহাবুর রায়দের (স্বাধীন মতামত-এর অধিকারী) কেন্দ্র ছিল কূফা। তিনি এর সাথেই সংশ্লিষ্ট হন। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (মৃত্যু ৩২ হিজরী—৬৫২ খৃঃ) থেকেই এ চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে। অতঃপর তাদের ৩ শগরিদ কাজী শুরাইহ (মৃত্যু ঃ ৭৬ হিজরী—৬৯৭ খৃষ্টাব্দ) আলকামা (মৃত্যু ঃ ৬২ হিজরী—৮১৪ খৃষ্টাব্দ) এবং মাসরূক (মৃত্যু ঃ ৬৩ হিজরী, ৬৮২ খৃষ্টাব্দ) এ চিন্তাধারার নামযাদা ইমাম হয়েছেন। তখন সমগ্র মুসলিম জাহানে তাঁদের খ্যাতি ছিল। অতঃপর ইবরাহীম নাখয়ী (মৃত্যু ঃ ৯৫ হিজরী—৭১৪ খৃষ্টাব্দ) এবং তাঁর পরে হাম্মাদ পর্যন্ত এর নেতৃত্ব পৌঁছে। ইমাম আবু, হানীফা (রঃ) এ হাম্মাদেরই শাগরিদী (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটান । কিন্তু কূফায় তাঁর শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে যে জ্ঞান ছিল, তিনি শুধু তাতেই তুষ্ট হননি ; বরং হজ্জ উপলক্ষে বারবার হেজায গিয়ে ফিকাহ্ এবং হাদীসের অন্যান্য বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন।

---

৩. আল-মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৭-৫৮।

৪. আল-মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৫-৫৯।

৫. আল-মাক্কী. ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৯।

হিজরী ১২০ সালে তাঁর উস্তাদ হাম্মাদের ইন্তেকাল হলে তাঁর চিন্তাধারার অনুসারীরা সকলে একমত হয়ে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এ পদ–মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে পঠন–পাঠন এবং ফতওয়া দানের এমন অক্ষয়কীর্তি তিনি আঞ্জাম দেন, আজ যা হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ তিরিশ বছর সময়ে তিনি কারো মতে ৬০ হাযার, আর কারো মতে ৮৩ হাযার আইন সংক্রান্ত সমস্যার (কানুনী মাসায়েল) সমাধান দেন, যা তাঁর জীবন কালেই বিভিন্ন শিরোনামে সংগৃহীত হয়েছিল।[৬] তিনি এমন সাত–আটশো শাগরিদ তৈরী করেন, যারা মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দারস এবং ফতোয়ার মসনদ অলংকৃত করেন এবং জনগণের ভক্তি–শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। তাঁদের শাগরিদদের মধ্যে এমন প্রায় পঞ্চাশজনের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা তাঁর পরে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের কাযী (বিচার পতি) নিযুক্ত হন। তাঁর মাযহাব মুসলিম জাহানের বিশাল অংশের আইনে পরিণত হয়। তা আব্বাসী, সালজুকী, ওসমানী এবং মোগল সাম্রাজ্যেরও আইন ছিল। আর আজ চীন থেকে তুরস্ক পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলমান তাঁরই ফিকাহ অনুসরণ করে।

পৈত্রিক পেশা ব্যবসায়কে তিনি জীবিকার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। কূফায় তিনি 'খায্' (এক বিশেষ ধরনের কাপড়)–এর ব্যবসা করতেন। ধীরে ধীরে তিনি এ পেশায়ও অস্বাভাবিক উন্নতি করেন। তাঁর নিজের একটি বিরাট কারখানা ছিল ; সেখানে 'খায্' তৈরী করা হতো।[৭] তাঁর কারখানায় তৈরী কাপড় কেবল কূফাতে তাঁর নিজস্ব কুঠিতে বিক্রি হতো না, বরং দেশের দূর দূরান্তেও তাঁর পণ্য যেতো। তাঁর বিশ্বস্ততা ও সততায় সাধারণ আস্থা বৃদ্ধি পেলে তাঁর কুঠিটি কার্যত একটি ব্যাংক–এর রূপ ধারণ করে। মানুষ সেখানে কোটি কোটি টাকা আমানত রাখতো। তাঁর ইন্তেকালের সময় সে কুঠিতে পাঁচ কোটি দিরহাম আমানত জমা ছিল।[৮] অর্থ এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে এ ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে আইনের বহু বিভাগে এমন সব দূরদর্শীতা সৃষ্টি করেছিল, নিছক তাত্ত্বিক দিক থেকে আইনবিদরা যা অর্জন করতে পারতেন না। ফিকাহ শাস্ত্র প্রণয়নে তাঁর এ অভিজ্ঞতা অনেক সহায়ক হয়েছে। এ ছাড়াও জাগতিক কাজ কারবারে তাঁর দূরদর্শীতা এবং অভিজ্ঞতার ধারণা এ থেকেও হতে পারে যে, হিজরী ১৪৫ সালে (৭৬২ খৃষ্টাব্দ) আল–মনসুর বাগদাদ নগরের পত্তন শুরু করলে তাঁকেই এর তত্ত্বাবধান কার্যে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত তিনি এ কার্যের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।[৯]

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। একবার তিনি নিজের জনৈক অংশীদারকে পণ্য বিক্রয় করার জন্য বাইরে পাঠান। সে পণ্যের একাংশ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ইমাম অংশীদারকে নির্দেশ দেন, যার কাছেই বিক্রি করবে, তাকে ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করবে। কিন্তু

৬. আল–মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৯৬। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩২—১৩৬।
৭. আল–ইয়াফেয়ী ঃ মেরআতুল জেনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকাতান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩১০, প্রথম সংস্করণ, ১৩৩৭ হিজরী, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ।
৮. আল–মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২২০।
৯. আত–তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩৮। ইবনে কাসীর ঃ আল–বেদায়া ওয়ান নেয়াহা, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৯৭।

অংশীদার তা ভুলে যান এবং ত্রুটি প্রকাশ না করেই সমস্ত পণ্য বিক্রি করে ফিরে আসেন। ইমাম সমস্ত পণ্যের উসূলকৃত মূল্য (তা ছিল ৩৫ হাযার দিরহাম) দান করে দেন।[১০] ঐতিহাসিকরা এমন অনেক ঘটনারও উল্লেখ করেছেন যে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের পণ্য বিক্রয় করার জন্য তাঁর দোকানে এসে দাম কম চাইলে ইমাম নিজে তাদেরকে বলতেন, তোমার পণ্যের মূল্য আরও বেশী। এবং তাদেরকে সঠিক মূল্য দিতেন।[১১] তাঁর সমকালীন ব্যক্তিবর্গ তাঁর পরহেযগারীর প্রশংসায় অস্বাভাবিক পঞ্চমুখ। হাদীসের মশহুর ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-এর উক্তি ঃ "আমি আবু হানিফা (রঃ)-এর চেয়ে অধিক পরহেযগার ব্যক্তি দেখিনি। তাঁর সামনে দুনিয়া এবং তার সম্পদ পেশ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেছেন। তাঁকে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে, তবুও তিনি দৃঢ় চিত্ত রয়েছেন। যেসব পদমর্যাদা লাভ করার জন্য মানুষ ছুটাছুটি করে, তিনি কখনো তা গ্রহণ করেননি। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে।"[১২] কাযী ইবনে শুব্রুমা বলেন ঃ "দুনিয়া তাঁর পেছনে দৌড়ায় কিন্তু তিনি তা থেকে দূরে সরে যান ; আর আমাদের কাছ থেকে তা দূরে সরে যায় কিন্তু আমরা তার পেছনে ছুটি।"[১৩] হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন ঃ "আল্লার কসম, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কখনো কোন আমীরের উপহার উপঢৌকন বা হাদিয়া গ্রহণ করেননি।"[১৪] একদা হারুনুর রশীদ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য জানতে চান। তিনি বলেন ঃ

"আল্লার কসম, তিনি আল্লার নিষিদ্ধ (হারামকৃত) বস্তুরাজী কঠোরভাবে পরিহারকারী, দুনিয়াদার থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং অধিকাংশ সময় মৌনতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি ছিলেন। সবসময় চিন্তা গবেষণায় মগ্ন থাকতেন, কখনো বাজে কথা বলতেন না। তাঁকে কোন মাসআলা (ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কিত সমস্যা) জিজ্ঞেস করা হলে সে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান থাকলে জবাব দিতেন। আমীরুল মোমিনীন। আমি তো শুধু এটুকু জানি যে, তিনি নিজের নফস এবং দ্বীনকে মন্দ কাজ থেকে সংরক্ষণ করতেন এবং লোকদের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেকে নিয়ে মশগুল থাকতেন। তিনি কখনো কারোর চরিত্রের খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করতেন না।"[১৫]

তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। বিশেষ করে বিদ্বজ্জন মণ্ডলী ও ছাত্রদের জন্য দু'হাতে অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি তাঁর ব্যবসায়িক লভ্যাংশের এক বিশেষ অংশ এ জন্য পৃথক করে রাখতেন। এ

---

১০. আল-খতীব ঃ তারীখে বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড অধ্যায়, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, মোল্লা আলী কারী ঃ যায়লুল জাওয়াহেরিল মুযিয়্যা, পৃষ্ঠা—৪৮৮, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দারাবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৩২ হিজরী।
১১. আল-মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–২১৯–২২০
১২. আয-যাহাবী ঃ মানাকেবুল ইমাম আবি হানীফা ওয়া সাহেবাইহে, পৃষ্ঠা—১১৫, দারুল কুতুবিল আরাবী, মিসর, ১৩৬৬ হিজরী।
১৩. আর-রাগেব আল-ইসফাহানী ঃ মুহাযারাতুল উদাবা, পৃষ্ঠা—২০৬, মাতবাআতুল হিলাল, মিসর, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।
১৪. আয-যাহাবী, পৃষ্ঠা—২৬।
১৫. আয-যাহাবী, পৃষ্ঠা—৯।

থেকে সারা বছর ধরে আলেম এবং ছাত্রসমাজকে আর্থিক সাহায্য করতেন। শেষ পর্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাও তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তাদেরকে অর্থ দানকালে তিনি বলতেন ঃ আপনারা এ সব নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করুন, আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কৃতজ্ঞ হবেন না। আমি আপনাদেরকে আমার নিজের কাছ থেকে কিছুই দেইনি। "এটা আল্লার ফযল (অনুগ্রহ) যা আপনাদের জন্যই তিনি আমাকে দান করেছেন।"[১৬] তাঁর শাগরিদদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক এমন ছিল, যাদের ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। ইমাম আবু ইউসুফের পরিবারের সমস্ত ব্যয়ভারই তিনি নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন। কারণ, তাঁর পিতা ছিলেন গরীব। তাঁরা শিশুকে শিক্ষা থেকে সরিয়ে নিয়ে কোন অর্থকরী কাজে নিয়োযিত করতে চাইতেন।[১৭]

এহেন চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইমাম আবু হানিফাকে খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধের প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারই মুখোমুখী হতে হয়েছে।

তাঁর মতামত

যেসব সমস্যা সম্পর্কে ইমাম তাঁর চিন্তাধারাকে নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এখন আমরা সর্বপ্রথম সেগুলো আলোচনা করবো। তিনি কোন লেখক ছিলেন না। তাই তাঁর কার্য সম্পর্কে অধিকন্তু অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যমের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কিন্তু শিআ, খারেজী, মুর্জিয়া এবং মোতাযিলাদের উপস্থাপিত কতিপয় সমস্যা এমন ছিল যে, যে সম্পর্কে স্বীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেছেন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ভাষায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত (অর্থাৎ মুসলিম সমাজের সংখ্যাধিক্য লোকের) বিশ্বাস এবং মত ও পথ সংকলন করেছেন। স্বভাবতঃই তাঁর কার্যধারা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাকেই আমাদের প্রথম স্থান দিতে হবে, যা তাঁর রচনার আকারে আমরা পাই।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে বনু উমাইয়াদের শাসনের সূচনা পর্বে মুসলমানদের মধ্যে যে সকল মতবিরোধ দেখা দেয় তার ফলে চারটি বড় ফেরকা জন্ম লাভ করে। কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে এরা শুধু চরম মতামত ব্যক্ত করেনি, বরং তাকে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস বলে গ্রহণ করেছে, যা মুসলিম সমাজ গঠন, ইসলামী রাষ্ট্রের ধরন-প্রকৃতি, ইসলামী আইনের উৎস এবং উম্মাতের অতীতের সমষ্টিগত ফায়সালার নির্ভরযোগ্য ভূমিকার ওপরও প্রভাব বিস্তার করতো। এ সমস্যা সম্পর্কে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের মত ও পথ সুনির্দিষ্ট-সুস্পষ্ট ছিল। কারণ, সাধারণ মুসলমানরা সে অনুযায়ী চলতো এবং বড় বড় ফকীহরা সময়ে সময়ে নিজেদের কথায় ও কাজে তা ব্যক্তও করতেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর সময় পর্যন্ত কেউ দ্ব্যর্থহীন পন্থায় স্পষ্ট লিখিত রূপে এগুলো সংকলিত করেননি।

---

১৬. আল-খতীব, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৬০। আল-মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৬২।
১৭. ইবনে খাল্লেকান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪২২-২৩। আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১২।

আহলে সুন্নাতের আকীদা বিশ্লেষণ

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল-ফিকহুল আকবার।[১৮] (সবচেয়ে বড় ফিকাহ) রচনা করে এ সব ধর্মীয় ফেরকার মুকাবিলায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর আকীদা সপ্রমাণ করেছেন।

এ গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত, যেসব প্রশ্ন নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, তার প্রথমটি হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের ভূমিকা সংক্রান্ত। ধর্মীয় ফেরকাগুলো এদের কারোর কারোর খেলাফতের যথার্থতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাঁদের কে কার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান? বরং তাদের কেউ মুসলমানও ছিলেন কিনা? এ সকল প্রশ্নের ধরন অতীতের কতিপয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিছক ঐতিহাসিক রায়ই ছিল না, বরং তা থেকে মৌলিক প্রশ্ন সৃষ্টি হতো যে, যেভাবে এসব খলীফাদেরকে মুসলমানদের ইমাম বানানো হয়েছিল, তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধান নিযুক্তির আইনগত পন্থা স্বীকার করা হবে কিনা। এ ছাড়াও তাদের কারো খেলাফত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হলে তা থেকে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তার সময়ের এজমাভিত্তিক ফায়সালা ইসলামী আইনের অংশ বলে স্বীকৃত হবে কিনা, এবং সে খলীফার নিজস্ব ফায়সালা আইনসিদ্ধ নযীর এবং মর্যাদা পাবে কিনা? এ ছাড়াও তাঁর খেলাফতের বৈধ-অবৈধ এবং তাঁর ঈমান থাকা না থাকা এমনকি তাঁদের মধ্যে কারুর ওপর কারুর ফযীলত (প্রাধান্য)-এর প্রশ্নও আপনা-আপনিই এ প্রশ্নে এসে দাঁড়ায় যে, পরবর্তীকালের মুসলমানরা সে প্রাথমিক ইসলামী সমাজের প্রতি আস্থা রাখে কিনা। তাদের সমষ্টিগত ফায়সালাকে স্বীকার করে কিনা, যেসব ফায়সালা নবী (সঃ)-এর সরাসরি হেদায়াত-তারবিয়াত (পথ নির্দেশ এবং দীক্ষা)- এর ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল, এবং যার মাধ্যমে কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ ও ইসলামী বিধানের সমস্ত জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছেছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে সাহাবাদের জামায়াতের পজিশন সংক্রান্ত। একটি দল —যার বিপুলাংশকে একটি দল যালেম, গুমরাহ বরং কাফের পর্যন্ত বলতো। কারণ, তারা প্রথম তিনজন খলীফাকে ইমাম বানিয়েছিলেন। খাওয়ারেজ এবং মু'তাযিলারা যাদের এক বিরাট জনসংখ্যাকে কাফের-ফাসেক

---

১৮. ইলমে কালাম (যুক্তি শাস্ত্র)-এর সংজ্ঞা প্রবর্তনের পূর্বে আকায়েদ, দ্বীনের মূলনীতি এবং আইন—সব কিছুর জন্যই 'ফিকাহ' শব্দ ব্যবহৃত হতো। অবশ্য এভাবে পার্থক্য করা হতো যে, আকায়েদ এবং দ্বীনের মূলনীতিকে আল-ফিকহুল আকবার বলা হতো। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর গ্রন্থের জন্য এ নামই ব্যবহার করেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে গবেষকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, তা সংযোজন মাত্র— তাঁর নিজস্ব রচনা নয়। কিন্তু আমরা এখানে তার যেসব অংশ নিয়ে আলোচনা করছি, তার সত্যতা সর্বজন স্বীকৃত। কারণ, অন্যান্য যেসব উপায়েই এ সব সমস্যা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মত-পথ জানা যায়, তা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, ইমাম আবু হানীফার আল-ওয়াছিয়্যাত, আবু মুতী আল-বলখীর বর্ণিত 'আল-ফিকহুল আবসাত' এবং আকীদায়ে তাহাবীয়া—যাতে ইমাম তাহাবী (২৩৯-৩২১ হিজরী ঃ ৮৫৩-৯৩৩ খৃষ্টাব্দ) আবু হানীফা (রঃ) এবং তাঁর শাগরিদদ্বয়— ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী থেকে বর্ণিত আকায়েদ লিপিবদ্ধ করেছেন।

আখ্যায়িত করতো। এ প্রশ্নটিও পরবর্তী কালে নিছক একটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের পর্যায়ে ছিল না। বরং তা থেকে আপনা আপনি এ প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাদের মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা ইসলামী আইনের উৎস হবে কিনা?

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ঈমানের সংজ্ঞা, ঈমান কুফর–এর মৌলিক পার্থক্য এবং গুনাহর প্রভাব-পরিণতি সম্পর্কে। খাওয়ারেজ, মুতাযিলা এবং মুর্যিয়াদের মধ্যে এ নিয়ে কঠোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ প্রশ্নটিও নিছক দ্বীনিয়াতের প্রশ্ন ছিল না, বরং মুসলিম সমাজ গঠনের সাথে এর সম্পর্ক ছিল। কারণ, এ সম্পর্কে যে ফায়সালাই করা হবে, মুসলমানদের সামাজিক অধিকার এবং তাদের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে অবশ্যই তার প্রভাব পড়বে। উপরন্তু একটা ইসলামী রাষ্ট্রে এ থেকে এ প্রশ্নও সৃষ্টি হতো যে, পাপাচারী শাসকদের শাসনে জুমা এবং জামায়াতের মতো ধর্মীয় কার্য, আদালত তথা বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ ও জেহাদের মতো রাজনৈতিক কার্য যথার্থভাবে কিভাবে করা যাবে, অথবা আদৌ করা যাবে কিনা?

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এ সব সমস্যা সম্পর্কে আহ্‌লুস সুন্নাতের যে মত-পথ সপ্রমাণ করেছেন তা এইঃ

খোলাফায়ে রাশেদীন প্রসঙ্গ

"রাসূলুল্লার পরে সর্বোত্তম মানুষ আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), তারপর ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) অতঃপর আলী ইবনে আবুতালেব (রাঃ) আনহুম। এ'রা সকলেই হকের ওপর ছিলেন আর সত্যের সাথেই তাঁরা জীবন যাপন করেন।" [১৯]

আকীদায়ে তাহবিয়া' গ্রন্থে এর আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবেঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পর আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে সমস্ত উম্মাতের ওপর সর্বাধিক মর্যাদাবান মনে করে সর্বপ্রথম তাঁর জন্য খেলাফত প্রমাণ করি। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর জন্য। এরপর ওসমান (রাঃ)-এর জন্য এবং অতঃপর আলী ইবনে আবুতালেব (রাঃ)-এর জন্য। এ'রা হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশেদীন—সত্যাশ্রয়ী খলীফা এবং হেদায়াত প্রাপ্ত ইমাম।"[২০]

এ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ব্যক্তিগতভাবে হযরত ওসমান (রা:)-এর তুলনায় হযরত আলী (রা:)-কে অধিক ভালবাসতেন।[২১] তাঁর ব্যক্তিগত মত এও ছিল যে, এ

---

১৯. মোল্লা আলী ক্বারী ঃ আল-ফিকহুল আকবার-এর ভাষ্য, পৃষ্ঠা—৭৪-৮৭, হিজরী ১৩৪৮ সালে দিল্লীর মুজতাবায়ী প্রেস থেকে মুদ্রিত সংস্করণ, আল-মাগনিসারী আল-ফিকহুল আকবার-এর ভাষ্য,পৃষ্ঠা—২৫-২৬ দায়েরাতুল মাআরেফ হায়দরাবাদ, ১৩২১ হিজরী।

২০. ইবনু আবিল ইয আল-হানাফী ঃ তাহবিয়ার ভাষ্য, পৃষ্ঠা— ৪০৩—৪১৬ দারুল মাআরেফ মিসর, ১৩৭৩ হিজরী।

২১. আল-কারদারী ঃ মানাকিবুল ইমামিল আযম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭২, ১ম সংস্করণ, ১৩২১ হিজরী, হায়দরাবাদ।

বুযুর্গদ্বয়ের মধ্যে কাউকে কারুর ওপর প্রাধান্য দেয়া যায় না।[২২] কিন্তু হযরত ওসমান (রা:)–এর নির্বাচন উপলক্ষে সংখ্যাধিক্যে যে ফায়সালা হয়েছিল, তাকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি এই সামষ্টিক আকীদা স্থির করেন যে, মর্যাদার ক্রমিক ধারাও তাই, যা খেলাফতের ক্রমিক ধারা।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে

"ভাল ব্যতীত অন্য কোন রকমে আমরা সাহাবীদের স্মরণ করি না।"[২৩]

আকীদায়ে তাহবিয়া গ্রন্থে এর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে ঃ

"আমরা রাসূলুল্লাহ (স:)–এর সমস্ত সাহাবীকেই ভালবাসি। তাঁদের কারো ভালোবাসায় সীমা লংঘন করি না, কাউকে গাল–মন্দ দেই না। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদেরকে মন্দ বলে, আমরা তাদেরকে না–পসন্দ করি। ভাল ব্যতীত অন্য কোনভাবে তাদের আলোচনা করি না।"[২৪]

অবশ্য সাহাবা (রা:)–দের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র:) তাঁর মত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, যাদের সাথে হযরত আলী (রা:)–এর যুদ্ধ হয়েছে (স্পষ্ট যে, জামাল এবং সিফফীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীরাও এর পর্যায়ভুক্ত), তাদের তুলনায় আলী (রা:) অধিক সত্যাশ্রয়ী ছিলেন।[২৫] কিন্তু প্রতিপক্ষকে নিন্দা করা থেকে তিনি সর্বতোভাবে বিরত থাকেন।

ঈমানের সংজ্ঞা ঃ

"স্বীকার করা এবং বিশ্বাস করার নাম ঈমান।"[২৬]

'আল–ওয়াসিয়্যাত' গ্রন্থে তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ "মুখে স্বীকার এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।" আরও সামনে অগ্রসর হয়ে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করেন তিনি এভাবে ঃ "আমল (কর্ম) ঈমান থেকে পৃথক জিনিস, আর ঈমান আমল থেকে পৃথক এর প্রমাণ এই যে, কোন কোন সময় মু'মিন থেকে আমল অপসৃত হয়ে যায়, কিন্তু ঈমান অপসৃত হয় না। .... যেমন, বলা যেতে পারে যে, ধনহীন ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজেব নয়; কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, তার ওপর

---

২২. ইবন আবদিল বার আল–ইন্তেকা, পৃষ্ঠা —১৬৩, আল–মাতাবাতুল কাদসী, কায়রো, ১৩৭০ হিজরী। আল–সারাখসী ঃ শারহুস সিয়ারিল কাবীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৭–১৫৮, মিসরীয় সংস্করণ, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ। ইমাম মালেক এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ আল– কাত্তান–এরও এ মত ছিল। ইবনু আবদিল বার ঃ আল–ইস্তীআব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৬৭।

২৩. মোল্লা আলী ক্বারী, পৃষ্ঠা—৮৭। আল–মাগনিসাবী, পৃষ্ঠা—২৬।

২৪. ইবনু আবিল ইয, পৃষ্ঠা—৩৯৮]

২৫. আল–মাক্কী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৩–৮৪। আল–কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭১–৭২। এটাও কেবল একা ইমাম আবু হানীফারই মত ছিল না, বরং সকল আহলুস সুন্নাত এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। হাকেম ইবনে হাজার আল–এসাবা গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা) এ কথা উল্লেখ করেছেন।

২৬. মোল্লা আলীক্বারী, পৃষ্ঠা—১০৩। আল–মাগনিসাবী, পৃষ্ঠা—৩৩।

ঈমান ওয়াজেব নয়।"[২৭] এমনি করে তিনি খারেজীদের এ মত—আমল ঈমানের মূল তত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত এবং গুনাহ অবশ্যই ঈমানহীনতার সমর্থক—বাতিল করে দেন, তার প্রতিবাদ করেন।

গুনাহ এবং কুফরের পার্থক্য

"কোন গুনাহ্‌র ভিত্তিতে—তা যত বড়ই হউক না কেন—আমরা কোন মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করি না, যতক্ষণ সে তাকে হালাল বলে স্বীকার না করে। আমরা তার থেকে ঈমান অপসারণ করতে পারি না, বরং মূলত তাকে মু'মিন বলেই মনে করি। একজন মু'মিন ব্যক্তি ফাসেক (পাপাচারী) হতে পারে, কিন্তু কাফের নয় — আমাদের মতে এমন হতে পারে।"[২৮]

'আল-ওয়াসিয়্যাত' গ্রন্থে এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

"মুহাম্মাদ (স:)-এর উম্মাতের সকল গুনাহগার মু'মিন, কাফের নয়।"[২৯]

'আকীদায়ে তাহবিয়্যা' গ্রন্থে এর আরও ব্যাখ্যা এই ঃ

"বান্দা ঈমান থেকে খারেজ হয় না, কিন্তু শুধু সে জিনিসকে অস্বীকার করে, যে জিনিস তাকে ঈমানে দাখিল করেছে।"[৩০]

একবার খারেজীদের সাথে এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মোনাযারা (তর্কযুদ্ধ) হয়। এ মোনাযারা থেকে এ আকীদা এবং তার সামাজিক ফলাফল (Social Consequences) এর ওপর পূর্ণ আলোকসম্পাত হয়। খারেজীদের একটি বিরাট দল তাঁর কাছে এসে বলে যে মসজিদের দ্বারে দু'টি জানাযা হাযির। একটি জানাযা এমন এক মদ্যপায়ীর, মদ পান করতে করতে যার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয়টি এক মহিলার, সে ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয় এবং লজ্জায় পড়ে আত্মহত্যা করে মারা যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এরা কোন্ মিল্লাতের লোক ছিল? তারা কি ইয়াহুদী ছিল? তারা বললো, না। জিজ্ঞাসা করলেন, খৃষ্টান ছিল। বললো, না। জিজ্ঞাসা করলেন, মজুসী (অগ্নিপূজক) ছিল? তারা বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তবে তারা কোন মিল্লাতের লোক ছিল? তারা জবাব দেয়, তারা সে মিল্লাতের লোক ছিল, যে মিল্লাত ইসলামের কালেমার সাক্ষ্য দেয়। ইমাম জিজ্ঞেস করেন ঃ বল, তা ঈমানের ⅓ না ¼ না ⅕ অংশ? তারা বলে, ঈমানের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চমাংশ হয় না। সে কালেমার শাহাদাতকে শেষ পর্যন্ত তোমরা ঈমানের কত অংশ বলে স্বীকার করো? তারা বললো, পুরো ঈমান। এরপর ইমাম তাদেরকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেন, তোমরা নিজেরাই যখন তাদেরকে মু'মিন বলছো, তবে আর আমাকে কি জিজ্ঞেস করছো? তাদের জবাব, আমরা জানতে চাই ঃ তারা জান্নাতী, না জাহান্নামী? ইমাম জবাব দেন ঃ তোমরা যখন জানতেই চাও, তখন আমি তাদের সম্পর্কে তা-ই বলবো, আল্লার নবী ইবরাহীম (আ:) তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট গুনাহগার সম্পর্কে যা বলেছিলেন ঃ

---

২৭. মোল্লা হুসাইন, আল-জাওহারাতুল মুনীফা শারহে ফি ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আবি হানীফা; পৃষ্ঠা—৩, ৬ ও ৭। দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, ১৩২১ হিযরী।
২৮. মোল্লা আলী ক্বারী, পৃষ্ঠা—৮৬-৮৯। আল-মাগনিসাবী, পৃষ্ঠা—২৭-২৮।
২৯. মোল্লা হোসাইন, পৃষ্ঠা-৬।
৩০. ইবনু আবিল ইয্। পৃষ্ঠা-২৬৫।

فمن تبعني فانه مني ج ومن عصاني فانك غفور

رحيم ٥- ابراهيم : ٣٦

—"আল্লাহ্ ! যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার, আর যে আমার নাফরমানী করে, তবে তুমি গাফুরুর রাহীম—ক্ষমাশীল, দয়ালু।—ইবরাহীম ঃ ৩৬

আল্লার আর এক নবী ঈসা (আ:)-ও যা বলেছিলেন এদের চেয়েও বড় গুনাহগার সম্পর্কে ঃ

ان تعذبهم فانهم عبادك ج وان تغفر لهم فانك

انت العزيز الحكيم ٥- المائده : ١١٨

—"আপনি যদি তাদেরকে আযাব দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।" —আল মায়েদা ঃ ১১৮

আল্লার আর এক নবী নূহ (আ:) যা বলেছিলেন ঃ

ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ٥ وما انا بطارد

المؤمنين ٥- الشعراء : ١١٣ - ١١٤

—"তাদের হিসাব নেয়া তো আমার রব-এর কাজ; যদি তোমরা বুঝতে ! আমি তো মু'মিনদের বিতাড়নকারী নই।— আশ-শুয়ারা ঃ ১১৩–১১৪

ইমামের এ জবাব শোনে সেই খারেজীদেরকে নিজেদের চিন্তার ভ্রান্তি স্বীকার করে নিতে হয়েছে।[৩১]

গুনাহগার মু'মিনের আঞ্জাম

"মু'মিনের জন্য গুনাহ ক্ষতিকর নয়—এমন কথা আমরা বলি না। মু'মিন জাহান্নামে যাবে না, তা-ও আমরা বলি না ; সে ফাসেক হলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে— এমন কথাও আমরা বলি না।"[৩২]

---

৩১. আল-মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৪–১২৫।

৩২. মোল্লা আলী কারী, ৯২ পৃষ্ঠা। আল-মাগনিসাবী, ২৮–২৯।

"আর মুর্যিয়াদের মতো আমরা এ কথাও বলি না যে, আমাদের নেকীসমূহ অবশ্যই গৃহীত হবে এবং আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো অবশ্যই ক্ষমা করা হবে।"[৩৩]

'আকীদায়ে তাহাবিয়া' এর ওপর এতটুকু সংযোজন করছে ঃ

"আহলি কেবলার মধ্যে কারো জান্নাতী হওয়ার ফায়সালা আমরা করি না, জাহান্নামী হওয়ারও না। আমরা তাদের ওপর কুফর, শিরক এবং মুনাফিকীর হুকুমও আরোপ করি না—যতক্ষণ তাদের দ্বারা এমন কোন বিষয়ের কার্যত প্রকাশ না পাওয়া যায়। তাদের নিয়াতের ব্যাপারে আমরা আল্লার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।"[৩৪]

এ আকীদার ফলাফল

এমনিভাবে ইমাম শিআ', খারেজী, মু'তাযিলা এবং মু'র্যিয়াদের চরম মতামতের মধ্যে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ আকীদা পেশ করেন, যা মুসলিম সমাজকে বিশৃংখলা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা করে; মুসলিম সমাজের ব্যক্তিবর্গকে নৈতিক দেউলিয়াপনা এবং গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়া থেকেও বারণ করে। যে বিপর্যয়কালে তিনি আহলে সুন্নাতের আকীদার এ ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন, তার ইতিহাস দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে এটা তার বিরাট কীর্তি বলে প্রতীয়মান হয়; যদ্বারা তিনি উম্মাতকে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ আকীদার অর্থ ছিল এই যে, নবী (সঃ) যে প্রাথমিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উম্মাত তার ওপর পূর্ণ আস্থাশীল। সে সমাজের ব্যক্তিবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাধিক্যের বলে যে ফায়সালা করেছিল, উম্মাত তা স্বীকার করে। তারা যেসব সাহাবীদেরকে পরস্পর খলীফা মনোনীত করেছিলেন, তাদের খেলাফত এবং তাদের সময়ের ফায়সালাকেও উম্মাত আইনের মর্যাদায় সত্য সঠিক মনে করে। শরীয়াতের সে পূর্ণ জ্ঞানকেও উম্মাত গ্রহণ করে, যা সে সমাজের ব্যক্তিবর্গ (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম)-এর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধররা লাভ করেছে। যদিও এ আকীদা ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর নিজের আবিষ্কার নয়, বরং উম্মাতের বিপুল সংখ্যক লোক সে সময় এ আকীদা পোষণ করতো, কিন্তু ইমাম তাকে লিখিত আকারে সংগৃহীত করে এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কারণ, এদ্বারা সাধারণ মুসলমানরা জানতে পারে যে, বিভিন্ন দলের মুকাবিলায় তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মত এবং পথ কি?

ইসলামী আইন প্রণয়ন

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর সবচেয়ে বড় কীর্তি—যা তাঁকে ইসলামের ইতিহাসে অক্ষয় মহত্ব দান করেছে—এ ছিল যে, খেলাফতে রাশেদার পর শুরার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ইসলামের আইন ব্যবস্থায় যে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, তিনি তা পূরণ করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা এর প্রভাব-পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেছি। প্রায় এক শতাব্দী এ অবস্থায় কেটে যাওয়ার ফলে যে

৩৩. আল-মাগনিসাবী, পৃঃ ৯৩ ও আল মাগনিসাবি, পৃঃ ২৯।
৩৪. ইবনু আবিল ইয, পৃষ্ঠা—২১২-২১৩।

কত ক্ষতি হতে থাকে, সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই তা উপলব্ধি করতেন। এক দিকে সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত মুসলিম দেশের সীমা বিস্তার লাভ করেছিল ; নিজেদের স্বতন্ত্র তামাদ্দুন পৃথক আচার-প্রথা এবং অবস্থা নিয়ে অসংখ্য জাতি মুসলিম দেশের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্যা, শিল্প-কলা, কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্যা, বিবাহ-শাদীর সমস্যা, শাসনতান্ত্রিক এবং দেওয়ানী-ফৌজদারী আইন-বিধানের সমস্যা দিন দিন উদ্ভূত হচ্ছিল। দেশের বাইরে বিশ্বের বহু জাতির সাথে এ বিশাল-বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছিল ; তাদের মধ্যে যুদ্ধ-সন্ধি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, বাণিজ্যিক লেন-দেন, জলে-স্থলে পরিভ্রমণ, কাষ্টম ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। মুসলমানদের যেহেতু এক স্বতন্ত্র দর্শন, জীবনধারা এবং মৌলনীতি ছিল, তাই নিজেদের আইন-বিধান অনুযায়ী এ সব নিত্য নতুন সমস্যা সমাধান করা তাদের জন্য ছিল একান্ত অপরিহার্য। মোদ্দা কথা, এক দিকে সময়ের এ বিরাট চ্যালেঞ্জ, ইসলামকে যে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে হচ্ছিল ; অপর দিকে অবস্থা এই ছিল যে, খেলাফতে রাশেদার অবসানের পর এমন কোন স্বীকৃত আইন সংস্থা অবশিষ্ট ছিল না, যেখানে মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞানী-ফকীহ এবং বিশেষজ্ঞরা বসে সেসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে, শরীয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী সেসব সমস্যার নির্ভরযোগ্য সমাধান পেশ করবে, যে সমাধান দেশের আদালত এবং সরকারী বিভাগগুলোর জন্য আইন বলে স্বীকৃত হবে, সমগ্র দেশে সমভাবে তা কার্যকরী হবে।

খলীফা, গবর্ণর, শাসক, কাযী-বিচারপতি সকলেই এ ক্ষতি উপলব্ধি করছিলেন। কারণ, ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, এবং জ্ঞান-ধ্যানের জোরে দৈনন্দিন উদ্ভূত এতসব নানাবিধ সমস্যা যথা সময় সমাধান করা কোন মুফতী, শাসক-বিচারক এবং কোন একটি বিভাগের পরিচালকের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে তা সমাধান করলেও তার ফলে পরস্পর বিরোধী ফায়সালার এক জঞ্জাল সৃষ্টি হয়ে পড়ছিল। অসুবিধা ছিল এই যে, এমন একটা সংস্থা সরকারই স্থাপন করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা এমন লোকদের হাতে ছিল, যারা নিজেরা জানতো যে, মুসলমানদের মধ্যে তাদের কোন নৈতিক মর্যাদা এবং আস্থা নেই। তাদের পক্ষে ফকীহদের সম্মুখীন হওয়া তো দূরের কথা, তাদেরকে বরদাস্ত করাই ছিল দুষ্কর। তাদের অধীনে প্রণীত আইন কোন অবস্থায়ই মুসলমানদের নিকট ইসলামী আইন-বিধানের অংশ হতে পারতো না। এ শূন্যতা পূরণ করার জন্য ইবনুল মুকাফ্‌ফা তাঁর আস্‌সাহাবা গ্রন্থে আল-মনসুরের নিকট এ প্রস্তাব পেশ করেন ঃ খলীফা জ্ঞানীদের একটি কাউন্সিল গঠন করবেন, এতে সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সুধীজনরা নিজ নিজ জ্ঞান এবং মতামত পেশ করবেন। অতঃপর খলীফা নিজে প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব ফায়সালা দেবেন। আর খলীফার ফায়সালাই হবে আইন। কিন্তু মনসুর এ বোকামী করার মতো নিজের সম্পর্কে এত বে-খবর ছিল না। তার ফায়সালা আবুবকর-ওমর (রাঃ)-এর ফায়সালা হতে পারতো না। তার ফায়সালার বয়স স্বয়ং তার নিজের বয়সের চেয়ে বেশী হতে পারতো না। বরং সারা দেশে এমন একজন মুসলমান পাওয়া যাবে, যে তার মঞ্জুরীকৃত আইন নিষ্ঠার সাথে মেনে চলবে—তার নিজের জীবনে এমন আশাও ছিল না। তা একটা ধর্মহীন আইন (Secular Law)-তো হতে পারতো, কিন্তু ইসলামী আইনের একটা অংশও হতে পারতো না।

এ পরিস্থিতিতে ইমাম অবু হানীফা (রঃ) এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ বেছে নেন। তা ছিল এই যে, রাষ্ট্র-সরকার থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে তিনি নিজে এক বেসরকারী আইন পরিষদ (Private Legislature) স্থাপন করেন। একজন একান্ত স্বতন্ত্র চিন্তাধারার ব্যক্তিই এমন প্রস্তাবের কথা ভাবতে পারে। এ ছাড়াও কেবল সে ব্যক্তিই এমন সাহস করতে পারে, স্বীয় যোগ্যতা প্রতিভা, চরিত্র এবং নৈতিক মান-মর্যদার প্রতি যার এতটুকু আস্থা আছে যে, এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সে আইন প্রণয়ন করলে ত কোন রাজনৈতিক অনুমোদন (Political Sanction) ছাড়াই স্বীয় সৌন্দর্য, বৈচিত্র, বিশুদ্ধতা,পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং আইন প্রণয়নকারীদের নৈতিক প্রভাব বলে আপনাপনিই তা কার্যকরী হবে, জাতি নিজেই তা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র-সরকার আপনাপনিই তা মেনে নিতে বাধ্য হবে। ইমাম গায়েব জানতেন না যে, সত্য সত্যই তাঁর পরে অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই এমন সব ফলাফল দেখা দিয়েছে যা তিনি পূর্বাহ্নেই দেখে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজেকে এবং নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকে জানতেন। মুসলমানদের সামাজিক মন-মানস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, সময়ের পরিস্থিতির প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন। একজন বিজ্ঞ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি একান্ত সঠিক ধারণাই করে নিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা দিয়ে এ শূন্যতা পূরণ করতে পারেন, আর তাঁর পূরণ করা দ্বারা এ শূন্যতা সত্যই পূরণ হবে।

এ পরিষদের সদস্যরা ছিলেন ইমামের আপন শাগরেদ, বছরের পর বছর তিনি যাদেরকে স্বীয় আইন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আইন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে, তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে গবেষণা করতে এবং যুক্তি-প্রমাণ থেকে ফলাফল বের করতে শিক্ষা দান করেছেন। তাদের প্রায় সকলেই ইমাম ছাড়াও সেকালের অন্যান্য বড় বড় ওস্তাদদের নিকট কুরআন, হাদীস, ফিকাহ এবং অন্যান্য সহায়ক জ্ঞান—যথা ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, ইতিহাস এবং জীবন-চরিত শিক্ষা লাভ করেছেন। বিভিন্ন শাগরেদকে বিভিন্ন জ্ঞানের বিশেষ পারদর্শি মনে করা হতো। যেমন, কেয়াস এবং রায় (যুক্তি ও মতামত)-এ কারো বিশিষ্ট স্থান ছিল, কারো কাছে ছিল হাদীস, সাহাবাদের ফতওয়া (মতামত) এবং অতীত খলীফা ও কাযীদের নযীরের বিপুল জ্ঞান, আর কেউ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ইলমে তাফসীর বা আইনের কোন বিশেষ বিভাগে, ভাষা জ্ঞান, ব্যাকরণ এবং মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত জ্ঞান)-এ। এরা কোন্ পর্যায় এবং কি মর্যাদার লোক ছিলেন, সে সম্পর্কে ইমাম নিজেই একবার তাঁর এক বৈঠকে বলেছিলেন ঃ

"এরা ছত্রিশ জন, যাদের মধ্যে ২২ জন কাযী হওয়ার যোগ্য, ৬ জন ফতওয়া দেয়ার যোগ্যতা রাখে ; আর দুজন এমন যোগ্যতা সম্পন্ন যে, কাযী এবং মুফতী তৈরী করতে পারে তারা।"[৩৫]

ইমামের নির্ভরযোগ্য চরিতকাররা এ পরিষদের যে কার্যপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা আমরা তাদের নিজের ভাষায় উল্লেখ করছি। আল-মুয়াফফাক ইবনে আহমদ আল মাক্কী (মৃত্যু ৫৬৮ হিজরী—১১৭২ খৃষ্টাব্দ) লিখেছেন ঃ

"আবু হানীফা (রঃ) তাঁর মাযহাব তাদের (যাকে তাঁর নিজের যোগ্য এবং বিশেষজ্ঞ শাগরেদদের) পরামর্শক্রমে সংকলন করেছেন। আপন সাধ্যানুযায়ী দ্বীনের জন্য চরম চেষ্টা-সাধনা

৩৫. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪৬

করার যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তাঁর ছিল, আল্লাহ, আল্লার রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্য যে পূর্ণমানের এখলাস (নিষ্ঠা) তাঁর অন্তরে ছিল, তার কারণে শাগরেদদের বাদ দিয়ে নিছক নিজের ব্যক্তিগত মতে এ কাজ করে ফেলা তিনি পসন্দ করেননি। এক একটি সমস্যা তিনি তাদের সামনে পেশ করতেন, সমস্যার বিভিন্ন দিক তাদের সামনে তুলে ধরতেন, তাদের জ্ঞানযুক্তি এবং মতামতও শোনতেন ও নিজের রায়ও ব্যক্ত করতেন। এমনকি, কখনো কখনো এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে মাসের পর মাস কেটে যেতো। শেষ পর্যন্ত একটি মত (রায়) সাব্যস্ত হলে কাযী আবু ইউসুফ কুতুবে উসুলে (মূলনীতি গ্রন্থে) তা লিপিবদ্ধ করতেন।"[৩৬]

ইবনুল বায্যায আল-কারদারী (ফাতাওয়া বায্যাযিয়ার রচয়িতা, মৃত্যু ঃ ৮২৭ হিজরী—১৪২৪ খৃষ্টাব্দ) বলেন ঃ

"তাঁর শাগরেদরা একান্ত দিল খুলে এক একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, সকল বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতেন। এ সময় ইমাম নীরবতার সাথে তাদের বক্তব্য শুনতেন। অতঃপর আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কে তিনি নিজের ভাষণ শুরু করতেন, তখন মজলিসে এমন নীরবতা বিরাজ করতো, যেন তিনি ছাড়া আর কেউ-ই সেখানে উপস্থিত নেই।"[৩৭]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, একবার এ মজলিসে একটি সমস্যা নিয়ে একাধারে তিন দিন আলোচনা চলে। তৃতীয় দিন বিকেলে আমি যখন আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনি, তখন বুঝতে পারলাম যে, আলোচনার ফায়সালা হয়েছে।[৩৮]

ইমামের অপর এক শাগরেদ আবু আবদুল্লার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ মজলিসে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যেসব মতামত ব্যক্ত করতেন, পরে তিনি তা পড়িয়ে শুনে নিতেন। তাঁর নিজের ভাষা এই ঃ "আমি ইমামের বক্তব্য তাকে পাঠ করে শোনাতাম। আবু ইউসুফ (মজলিসের ফায়সালা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে) সঙ্গে সঙ্গে নিজের বক্তব্যও বিধিবদ্ধ করতেন। তাই পড়ার সময় আমি চেষ্টা করতাম তাঁর বক্তব্য বাদ দিয়ে যেতে ; কেবল ইমামের নিজস্ব বক্তব্যই তাঁকে শোনাতে। একদিন আমি ভুলে ভিন্ন বক্তব্যও পড়ে ফেলি। ইমাম জিজ্ঞেস করেন, এ ভিন্ন বক্তব্যটি কার।"[৩৯]

আল-মাক্কীর বর্ণনা থেকে এ-ও জানা যায় যে, যে ফায়সালা এ মজলিসে লিপিবদ্ধ করা হতো, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর জীবদ্দশায়ই তা স্বতন্ত্র শিরোনামার অধীনে অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্টও হয়েছিল ঃ

---

৩৬. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৩
৩৭. আল-কারদারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৮।
৩৮. আল-মাক্কী, দ্বিতীয় খণ্ড,পৃষ্ঠা—৫৪।
৩৯. আল-কারদারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৯।

"আবু হানীফা (রঃ) প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ শরীয়াতের জ্ঞান সংকলন করেন। তাঁর পূর্বে কেউ এ কাজ করেনি।.........তিনি তাকে অধ্যায় এবং পৃথক পৃথক শিরোনামার অধীনে পরিচ্ছেদের আকারে সংগৃহীত করেন।[৪০]

ইতিপূর্বে আমরা আল-মাক্কীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছি যে, এ মজলিসে ৮৩ হাযার আইন সংক্রান্ত সমস্যা মীমাংসা করা হয়েছে। সে সময় পর্যন্ত ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে কার্যত যেসব সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়েছে, এ মজলিসে শুধু সেসব সমস্যাই আলোচিত হতো না ; বরং বিভিন্ন বিষয়ের সম্ভাব্যরূপ কল্পনা করে তা নিয়েও আলোচনা করা হতো, তার সমাধান তালাশ করা হতো—যাতে, এখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি, এমন কোন সমস্যা আগামীতে দেখা দিলে আইনে তার সমাধান পাওয়া যায়। এ সব সমস্যা আইনের প্রায় সকল বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। আন্তর্জাতিক আইন[৪১] (যার জন্য আল-মিসর-এর পরিভাষা ব্যবহৃত হতো), শাসনতান্ত্রিক আইন, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইন, সাক্ষ্য আইন, আদালতের নীতিমালা, অর্থনৈতিক জীবনের সকল বিভাগের স্বতন্ত্র আইন, বিবাহ তালাক এবং উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়ের আইন, ইবাদতের বিধি-বিধান—এ মজলিসের সংগৃহীত তথ্যাবলী দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ এবং অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী পরবর্তীকালে যেসব গ্রন্থ রচনা করেন, তার সূচীপত্রেই আমরা এ সব শিরোনামা দেখতে পাই।

এ যথারীতি আইন বিধিবদ্ধ করণের (Codification) ফল এই হয়েছিল যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেসব মুজতাহিদ, মুফতী এবং কাযী কাজ করেন, তাদের কাজে আস্থা হারাতে থাকে। কুরআন-হাদীসের বিধি-বিধান এবং অতীত ফায়সালা এবং নযীরের যাঁচাই বাছাই করে সুধীজনদের একটি পরিষদ ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতো একজন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির সভাপতিত্ব এবং তত্ত্বাবধানে শরীয়াতের যে বিধান একান্ত পরিচ্ছন্নরূপে তুলে ধরেছিলেন অতঃপর শরীয়াতের মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যাপক ইজতিহাদ করে জীবনের সকল অধ্যায়ে দেখা দিতে পারে এমন সম্ভাব্য প্রয়োজনের জন্য গ্রহণযোগ্য যে আইন সংগৃহীত করে দিয়েছেন, তারপরে বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সংকলিত সংগৃহীত বিধান। অতিকষ্টে মর্যদা লাভ করতে পারে। তাই, এ কার্যধারা জন-সমক্ষে উপস্থিত হলেই জনগণ—শাসক-বিচারক—সকলেই সে দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। কারণ,

৪০. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৬।

৪১. বর্তমান কালের লোকেরা এ ভুল ধারণায় রয়েছে যে, আন্তর্জাতিক আইন একটা নতুন জিনিস। প্রথম যে ব্যক্তি আইনের এ বিভাগের পত্তন করেন, তিনি হচ্ছেন হল্যাণ্ডের গ্রোটিয়াস (Grotius ১৫৮৩—১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার শাগরেদ মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (১৩২—১৮৯ হিজরী, ৭৪৯—৮০৫ ঈসায়ী) (রঃ)-এর কিতাবুস সিয়ার যিনি দেখেছেন, তিনি জানেন যে, গ্রোটিয়াসের ৯শ বছর আগে ইমাম আবু হানীফার হাতে এ জ্ঞান অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সংগৃহীত হয়েছিল। এতে আন্তর্জাতিক আইনের অধিকাংশ দিক এবং তার বড় বড় জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে জ্ঞানীদের একটি দল এ সত্য স্বীকারও করেছেন এবং জার্মানে Shaibani Society of International Law নামে একটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তা ছিল সময়ের দাবী। আর মানুষ দীর্ঘ দিন থেকে এ জিনিসটিরই অভাব বোধ করছিল। তাই, প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম (মৃতু ঃ ২০৩ হিজরী—৮১৮ ঈসায়ী) বলেন ঃ ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর বক্তব্যের সামনে অন্যান্য ফকীহ্দের বক্তব্যের বাজার ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে। তাঁর জ্ঞানই বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে, খলীফা, ইমাম এবং শাসকরা তাঁর ভিত্তিতেই ফায়সালা করতে শুরু করেন ; তার আলোকেই লেনদেন চলতে থাকে।[৪২] খলীফা মামুনের (১৯৮-২১৮ হিজরী—৮১৩-৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) যমানা পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, আবু হানীফা (রঃ)-এর জনৈক বিরুদ্ধবাদী ফকীহ্ একদা উযীরে আযম ফযল ইবনে সহলকে পরামর্শ দেন যে, হানাফী ফিকাহর প্রয়োগ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ জারী করা হউক। উযীরে আযম বিশেষজ্ঞদের ডেকে এ ব্যাপারে তাদের মতামত চান। "তারা সকলেই এক মত হয়ে বলেন, এটা বলবেন না, সারা দেশের লোক আপনাদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়বে। যে ব্যক্তি আপনাকে এ পরামর্শ দিয়েছে, তার জ্ঞান অসম্পূর্ণ।" উযীর বলেন,আমি নিজেও এদের সাথে একমত নই। আর আমীরুল মু'মিনীনও এতে রাযী হবেন না।[৪৩]

এমনি করে ইতিহাসের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় যে, এক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী আইন প্রণয়ন সংস্থার প্রণীত আইন নিছক নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তার সংকলকদের নৈতিক মর্যাদা বলে নানা দেশ এবং নানা রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয়েছে। এর সাথে তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফল এ-ও দেখা দেয় যে, তা মুসলিম আইন গবেষকদের জন্য ইসলামী আইন প্রণয়নের এক নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেয়। পরবর্তীকালে অন্য যতো বড় বড় ফিকাহ্ ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে, স্বীয় ইজতিহাদ পদ্ধতি এবং তার ফলাফলের বিচারে তা যতই স্বতন্ত্র হউক না কেন, কিন্তু এটাই ছিল সে জন্য নমুনা। এ নমুনাকে সামনে রেখেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

---

৪২. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪১।
৪৩. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৭-১৫৮। আল-কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৬-১০৭।

অষ্টম অধ্যায়

খেলাফত ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতামত

খেলাফত ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতামত

রাজনীতির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করতেন। রাষ্ট্রদর্শন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল দিক এবং বিভাগ সম্পর্কেই তাঁর এ অভিমত ব্যাপৃত ছিল। কোন কোন মৌলিক বিষয়ে তাঁর অভিমত অন্যান্য ইমামদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল। এখানে আমরা প্রতিটি দিক–বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর মতামত পেশ করবো।

এক ঃ সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্র–চিন্তার যে কোন দর্শন নিয়েই আলোচনা কারা হোক না কেন, তাতে মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, সার্বভৌমত্ব কার, কার জন্য এ সার্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন করা হবে? সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর মতবাদ ছিল ইসলামের সর্বসজন স্বীকৃত মৌলিক মতবাদ। অর্থাৎ সত্যিকার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলা। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল আনুগত্যের অধিকারী। আল্লাহ এবং রাসুলের বিধান হচ্ছে সে সর্বোচ্চ সার্বিক বিধান. যার মুকাবিলায় আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা চলে না। যেহেতু তিনি একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি এ বিষয়টিকে রাষ্ট্র দর্শনের পরিবর্তে আইনের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

"আল্লার কিতাবে কোন বিধান পেলে আমি তাকেই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করি। আল্লার কিতাবে সে বিধানের সন্ধান না পেলে রাসূলের সুন্নাহ এবং তাঁর সে সব বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রসিদ্ধ। আল্লার কিতাব এবং রাসুলের সুন্নায়ও কোন বিধান না পেলে রাসুলুল্লাহ (সঃ)–এর সাহাবীদের উক্তি অর্থাৎ তাঁদের ইজমা বা সর্বসম্মত মতের অনুসরণ করি। আর তাঁদের মতভেদের অবস্থায় যে সাহাবীর উক্তি খুশী গ্রহণ করি, আর যে সাহাবীর উক্তি খুশী বর্জন করি। কিন্তু এদের উক্তির বাইরে গিয়ে কারো উক্তি গ্রহণ করি না .....অবশিষ্ট রইল অন্য ব্যক্তিরা। ইজতিহাদের অধিকার তাদের যেমন আছে তেমনি আছে আমারও।[১]

ইবনে হাযম্ বলেন ঃ

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর মাযহাব ছিল এই যে, কোন যঈফ (দুর্বল) হাদীসও পাওয়া গেলে তার মুকাবিলায় কেয়াস এবং ব্যক্তিগত মত পরিত্যাগ করা হবে। তাঁর সকল শাগরেদ এ ব্যাপারে একমত।[২]

তিনি কুরআন এবং সুন্নাহকে চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) বলে গ্রহণ করতেন — এ থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রতিভাত হয়। তাঁর আকীদা ছিল এই যে, আইনানুগ সার্বভৌমত্ব

---

১. আল–খতীব আল–বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৬৮ ; আল–মাক্কী মানাকেবুল ইমামিল আযম আবিহানীফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৯ ; আয্‌যাহাবী ঃ মানাকেবুল ইমাম আবু হানীফা ওয়া সাহেবাইহে, পৃষ্ঠা—২০।

২ আয্‌–যাহাবী, পৃষ্ঠা—২১।

(Legal Sovereignty) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। তাঁর মতে, কেয়াস এবং ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা আইন প্রণয়নের সীমা সে বৃত্ত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যেখানে আল্লাহ এবং রাসূলের কোন বিধান বর্তমান নেই। রাসূল (সঃ)-এর সাহাবীদের ব্যক্তিগত উক্তিকে অন্যান্যদের উক্তির ওপর তিনি যে অগ্রাধিকার দিতেন, তার মৌল কারণ এই ছিল যে, সাহাবীর জ্ঞানে রাসূলুল্লার কোন নির্দেশ থেকে থাকবে আর সেটাই তাঁর উক্তির উৎস মূল—সাহাবীর ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যেসব ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে, সেসব ব্যাপারে তিনি কঠোর ভাবে কোন সাহাবীর উক্তি গ্রহণ করতেন, আপন মত মতো সকল সাহাবীর উক্তির পরিপন্থী কোন ফায়সালাই তিনি করতেন না। কারণ, এতে জেনে-শুনে সুন্নার বিরুদ্ধাচারণের আশংকা ছিল। অবশ্য, এ সকল উক্তির মধ্যে কারো উক্তি সুন্নার নিকটতর হতে পারে, কেয়াস দ্বারা তিনি তা নির্ণয় করার চেষ্টা করতেন। ইমামের জীবদশায়ই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি কেয়াসকে নছ (স্পষ্ট বিধানের) ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। এ অভিযোগ খণ্ডন করে তিনি বলেন ঃ

"আল্লার শপথ করে বলছি, যে বলে আমরা কেয়াসকে নছ-এর ওপর অগ্রাধিকার দেই-সে মিথ্যা বলে, আমাদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে। আচ্ছা, নছ-এর পরও কি কেয়াসের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে?"[৩]

একদা খলীফা আল-মনসুর তাঁকে লিখেন, আমি শুনেছি, আপনি কেয়াসকে হাদীসের ওপর অগ্রাধিকার দান করেন। জবাবে তিনি লিখেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যা শুনেছেন, তা সত্য নয়। আমি সর্বাগ্রে কিতাবুল্লার ওপর আমল করি। অতঃপর রাসূলুল্লার সুন্নার ওপর। এরপর আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী আলাইহিম আজমাঈন—তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন)-এর ফায়সালার ওপর। অবশ্য, তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে আমি কেয়াস করি।"[৪]

দুই ঃ খেলাফত নিষ্পন্ন করার সঠিকপন্থা

খেলাফত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর অভিমত এই ছিল যে, প্রথমে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা অধিকার করে পরে প্রভাব খাটিয়ে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করা তা সম্পাদনের কোন বৈধ উপায় নয়। মতামতের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্মতি এবং পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতই সত্যিকার খেলাফত। এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি এ মত ব্যক্ত করেছেন, যখন এ মত মুখে উচ্চারণকারীর ঘাড়ে মস্তক থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আল-মনসুর-এর সেক্রেটারী রবী ইবনে ইউনুসের উক্তি তিনি ইমাম মালেক (রঃ), ইবনে আবি যে'ব এবং ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-কে ডেকে বলেন ঃ "আল্লাহ তাআলা এ উম্মাতের মধ্যে আমাকে এ রাজত্ব দান করেছেন, এ ব্যাপারে আপনাদের কি মত? আমি কি এর যোগ্য?"

---

৩. আশ-শা'রানী ঃ কিতাবুল মীযান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬১, আল-মাতবাআতুল আল-যাহারীয়্যাহ, মিসর, ৩য় সংস্করণ, ১৯২৫।

৪. আশ-শারানী ঃ কিতাবুল মীযান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬২।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেন ঃ "আপনি এর যোগ্য না হলে আল্লাহ্ তাআ'লা তা আপনাকে সোপর্দ করতেন না।"

ইবনে আবি যে'ব বলেন ঃ

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, দুনিয়ার রাজত্ব দান করেন। কিন্তু পরকালের রাজত্ব তিনি তাকে দান করেন, যে তা কামনা করে এবং এ জন্য আল্লাহ্ যাকে তাওফীক দেন। আপনি আল্লার আনুগত্য করলে আল্লার তাওফীক আপানার নিকটতর হবে। অন্যথায় তাঁর নাফরমানী করলে তাঁর তাওফীক আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। আসল কথা এই যে, আল্লাভীরু ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে খেলাফত নিষ্পন্ন হয়। আর যে ব্যক্তি নিজে খেলাফত অধিকার করে, তার মধ্যে কোন তাকওয়া– আল্লাভীতি নেই। আপনি এবং আপনার সহায়করা তাওফীক থেকে দূরে এবং সত্যচ্যুত। এখন আপনি যদি আল্লার কাছে শান্তি কামনা করেন, পূত–পবিত্র কর্মধারা দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করেন, তাহলে এ জিনিসটি আপনার ভাগ্যে জুটবে। অন্যথায় আপনি নিজেই নিজের শিকার হবেন।"

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, ইবনে আবি যে'ব যখন এ কথা বলছিলেন, তখন আমি এবং মালেক (রঃ) নিজ নিজ কাপড় সংবরণ করে নিচ্ছিলাম যে, সম্ভবত তখনই তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। তাঁর রক্তের ছিটা আমাদের কাপড়ে পড়বে।

অতঃপর মনসুর ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি মত ? তিনি জবাবে বলেন ঃ

"দ্বীনের খাতিরে সত্য পথের সন্ধানী ব্যক্তি ক্রোধ থেকে দূরে থাকে। আপনি আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করলে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে আপনি আমাদেরকে আল্লার খাতিরে ডাকেন নি ; বরং আপনার অভিপ্রায় হচ্ছে, আমরা আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কথা বলি। আর আমাদের উক্তি জনসমক্ষে আসুক। জনগণ জানুক, আমরা কি বলি। সত্য কথা এই যে, আপনি এমন পন্থায় খলীফা হয়েছেন যে, আপনার খেলাফতের ব্যাপারে মতামতের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু'জন লোকের ঐক্যমতও স্থাপিত হয়নি। অথচ মুসলমানদের সর্বসম্মতি এবং পরামর্শক্রমেই খেলাফত সম্পন্ন হয়। দেখুন, ইয়ামনের অধিবাসীদের বয়আত না আসা পর্যন্ত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) দীর্ঘ ছ'মাস যাবৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন।"

এ কথাগুলো বলে তিনজনই ওঠে পড়েন। পেছনে মনসুর রবীকে তিন থলি দেরহাম দিয়ে ব্যক্তিত্রয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তাকে তিনি বলে দেন, মালেক তা গ্রহণ করলে তা তাকে দিয়ে দেবে। কিন্তু আবু হানীফা এবং ইবনে আবি যে'ব তা গ্রহণ করলে তাদের শিরচ্ছেদ করবে। ইমাম মালেক এ দান গ্রহণ করেন। ইবনে আবি যে'ব–এর নিকট গমন করলে তিনি বলেন, আমি স্বয়ং মনসুরের জন্যও তো এ অর্থকে হালাল মনে করি না, নিজের জন্য কি করে হালাল মনে করি ! ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, আমার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হলেও আমি এ অর্থ স্পর্শ করবো না। এ বিবরণী শোনে মনসুর বলে—এ নিস্পৃহতা তাদের দু'জনের প্রাণ রক্ষা করেছে।[৫]

---

৫. আল–কারদারী ঃ মানাকেবুল ইমামিল আযম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫–১৬। আল–কারদারীর এ বর্ণনায় এমন একটি বিষয় উল্লেখ আছে যা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হইনি। তা এই যে, ইয়ামনবাসীদের বায়আত আসা পর্যন্ত হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) মাস যাবত ফায়সালা থেকে নিবৃত্ত ছিলেন।

তিন ঃ খেলাফতের যোগ্যতার শর্ত

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর যুগ পর্যন্ত খেলাফতের যোগ্যতার শর্তাবলী ততটা সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি, যতটা পরবর্তী কালের গবেষক আল-মাওয়ার্দী এবং ইবনে খালদুন ইত্যাকার লেখক-গবেষকরা বর্ণনা করেছেন। কারণ, এর অধিকাংশ শর্তই তখন প্রায় বিনা আলোচনায়ই স্বীকৃত-গৃহীত ছিল। যথা, মুসলমান হওয়া, পুরুষ হওয়া, স্বাধীন হওয়া (দাস না হওয়া), জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, সুষ্ঠু জ্ঞানের অধিকারী এবং দৈহিক ত্রুটিমুক্ত হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য দু'টি বিষয় তখন পর্যন্ত আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এক ঃ অত্যাচারী এবং দুরাচারী-পাপাচারী ব্যক্তি (যালেম এবং ফাসেক) বৈধ খলীফা হতে পারে কিনা? দুই ঃ খেলাফতের জন্য কোরায়শী হওয়া প্রয়োজন কিনা?

যালেম ফাসেকের নেতৃত্ব

ফাসেকের নেতৃত্ব সম্পর্কে তার মতামতের দু'টি দিক রয়েছে। যা ভালভাবে উপলব্ধি করা আবশ্যক। তিনি যে সময়ে এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করেন, বিশেষ করে ইরাকে এবং সাধারণভাবে গোটা মুসলিম জাহানে তা ছিল দু' চরমপন্থী মতবাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যুগ। এক দিকে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হচ্ছিল যে, যালেম ফাসেকের নেতৃত্ব একেবারেই না-জায়েয—সম্পূর্ণ অবৈধ। এ নেতৃত্বের অধীনে মুসলমানদের কোন সামাজিক কাজও নির্ভুল হতে পারে না। অপর দিকে আবার বলা হচ্ছিল যে, যালেম-ফাসেক যে কোনভাবেই রাষ্ট্রের ওপর জেঁকে বসুক না কেন, তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নেতৃত্ব এবং খেলাফত সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে যায়। এ দু' চরম মতবাদের মাঝামাঝি ইমাম আযম (রঃ) এক অতি ভারসাম্যপূর্ণ দর্শন উপস্থাপিত করেন। তাঁর এ দর্শনের বিস্তারিত বিবরণ এই ঃ

আল-ফিকহুল আকবার-এ তিনি বলেন ঃ "নেক-বদ যে কোন মু'মিনের পেছনে সালাত জায়েয।"[৬]

ইমাম তাহাভী আকীদা-ই-তাহাবীয়ায় এ হানাফী মতের ব্যাখ্যা করে লিখেন ঃ

"এবং হজ্জ ও জিহাদ মুসলিম উলিল আমর-এর অধীনে কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে—তা সে উলিল আমর নেক হোক, বা বদ—ভাল হোক, কি মন্দ। কেউ এ সব কাজ বাতিল করতে পারে না, পারে না তার সিলসিলা বন্ধ করতে।"[৭]

এটা আলোচ্য বিষয়ের একটি দিক। অপর দিক হচ্ছে এই যে, তাঁর মতে খেলাফতের জন্য 'আদালাত' অপরিহার্য শর্ত। কোন যালেম-ফাসেক ব্যক্তি বৈধ খলীফা, কাযী, শাসক বা মুফতী হতে পারে না। এমন ব্যক্তি কার্যত অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমানরা তার অধীনে তাদের সামাজিক জীবন যেসব কাজ শরীয়াতের সঠিক বিধান অনুযায়ী আঞ্জাম দেবে, তা জায়েয—বৈধ হবে,তার

---

৬. মোল্লা আলী ক্বারী ঃ ফিকহে আকবরের ভাষ্য, পৃষ্ঠা—৯১।
৭. ইবনু আবিল ইয্ আল-হানাফী ঃ শরহুত-তাহাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা—৩২২।

নিয়োগকৃত কাযী-বিচারক ন্যায়ত যেসব ফায়সালা করবে, তা জারী হবে—এটা স্বতন্ত্র কথা। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবুবকর আল-জাস্‌সাস তাঁর 'আহকামুল কুরআন' (কুরআনের বিধি-বিধান) গ্রন্থে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেন ঃ

"সুতরাং কোন যালেম-অত্যাচারী ব্যক্তির নবী বা নবীর খলীফা হওয়া জায়েয নয়। বৈধ নয় তার কাযী বা এমন কোন পদাধিকারী হওয়া, যার ভিত্তিতে দ্বীনের ব্যাপারে তার কথা গ্রহণ করা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে : যেমন মুফতী, সাক্ষ্যদাতা বা নবী (সঃ)-এর তরফ থেকে হাদীস বর্ণনাকারী হওয়া لا ينال عهدى الظالمين[৮]—এ কথা প্রতিপন্ন করে যে, দ্বীনের ব্যাপারে যে লোকই নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব লাভ করে, তার সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত।.........এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ফাসেক-পাপাচারীর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব বাতেল। সে খলীফা হতে পারে না। আর কোন ফাসেক ব্যক্তি যদি নিজেকে এ পদে প্রতিষ্ঠিত করে বসে, তা হলে জনগণের ওপর তার আনুগত্য অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। এ কথাই নবী (সঃ) বলেছেন যে, স্রষ্টা'র অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই। এ আয়াত এ কথাও প্রতিপন্ন করে যে, কোন ফাসেক ব্যক্তি বিচারপতি (জজ-ম্যাজিস্ট্রেট) হতে পারে না। সে বিচারক হলেও তার রায় জারী হতে পারে না। এমনি করে, তার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতে পারে না, পারে না নবী (সঃ) থেকে তার বর্ণনা গ্রহণ করা যেতে। সে মুফতী হলে তার ফতোয়া মানা যেতে পারে না।"[৯]

সামনে অগ্রসর হয়ে আল-জাস্‌সাস স্পষ্ট করে বলেন যে, এটাই ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব। অতঃপর তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর ওপর এটা কত বড় যুলুম যে, তাঁর বিরুদ্ধে ফাসেকের ইমামত ও নেতৃত্ব বৈধ করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয় ঃ

"কেউ কেউ ধারণা করে নিয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে ফাসেকের ইমামত-খেলাফত বৈধ।.............ইচ্ছা করে মিথ্যা না বলা হলে এটা এক ভ্রান্ত ধারণা। সম্ভবত এর কারণ এই যে, তিনি বলতেন, কেবল তিনিই নন, ইরাকের ফকীহদের মধ্যে যাদের উক্তি প্রসিদ্ধ, তাঁরা সকলেই এ কথা বলতেন যে, কাযী-বিচারপতি স্বয়ং; ন্যায়পরায়ণ হলে—কোন যালেম তাকে নিযুক্ত করলেও—তার ফায়সালা সঠিকভাবে জারী হয়ে যাবে। আর তাদের ফিস্‌ক সত্ত্বেও এ সব ইমামের পেছনে সালাত জায়েয হবে। এ মতটি যথাস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা যায় না যে, আবু হানীফা (রঃ) ফাসেকের ইমামত—কর্তৃত্বকে জায়েয—বৈধ জ্ঞান করতেন।"[১০]

ইমাম যাহাবী এবং আল-মুয়াফ্‌ফাক আল-মাক্কী উভয়েই ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

---

৮. "আমার অঙ্গীকার যালেমদের পৌঁছায় না"-(আল-বাকারা ঃ ১২৪)।

৯. আবুবকর আল-জাস্‌সাস ঃ আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮০ ।

১০. আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮০-৮১। শামসুল আইম্মা সারাখসী ও আল-মাবসূত-এ ইমামের এ মত ব্যক্ত করেছেন। ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩০।

যে ইমাম ফাই অর্থাৎ জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ-ব্যবহার করে, অথবা নির্দেশে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়, তার ইমামত-কর্তৃত্ব বাতেল ; তার নির্দেশ বৈধ নয়।[১১]

এ সব বিবৃতি গভীরভাবে অনুধাবন করলে এ কথা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) খারেজী এবং মুতাযিলাদের সম্পূর্ণ বিপরীতে আইনত (Dejure) এবং কার্যত (Defacto)-এর মধ্যে পার্থক্য করতেন। খারেজী এবং মুতাযিলাদের মতামত দ্বারা ন্যায়পরায়ণ এবং যোগ্য ইমামের অনুপস্থিতিতে মুসলিম সমাজ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে পড়া অবধারিত ছিল। জজ-বিচারক থাকবে না, থাকবে না জুমা-জামায়াত, আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে না, মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক-রাজনৈতিক — কোন কাজই চলবে না বৈধভাবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এ ভ্রান্তির অপনোদন করেছেন এভাবে যে, আইনানুগ ইমাম যদি সম্ভব না হয়, তবে যে ব্যক্তিই কার্যত মুসলমানদের ইমাম হবে, তার অধীনে মুসলমানদের গোটা সমাজ জীবনের পুরো ব্যবস্থাই বৈধভাবে চলতে থাকবে—সে ইমামের কর্তৃত্ব যথাস্থানে বৈধ না হলেও তা অব্যাহত থাকবে।

মুতাযিলা এবং খারেজীদের এ চরমপন্থার মুকাবিলায় মুর্জিয়া এবং স্বয়ং আহলুস সুন্নার কোন কোন ইমামও যে স্বতন্ত্র এক চরম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) মুসলমানদেরকে তা এবং তার পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন। তারাও কার্যত আর আইনতঃ-এর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। ফাসেকের কার্যত কর্তৃত্বকে তারা এমনভাবে বৈধ প্রতিপন্ন করে যেন তাই আইনত-এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এ হতো যে, মুসলমানরা অত্যাচারী-অনাচারী এবং দুরাচারী শাসনকর্তাদের শাসনে নিশ্চুপ-নিশ্চিন্ত বসে পড়তো। তাকে পরিবর্তনের চেষ্টা তো দূরের কথা, তার চিন্তাও ত্যাগ করতো। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের নিমিত্ত সর্বশক্তি নিয়োজিত করে এ সত্য ঘোষণা করেন যে, এমন লোকদের ইমামত কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বাতেল।

খেলাফতের জন্য কুরাইশী হওয়ার শর্ত

এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর অভিমত ছিল এই যে, খলীফাকে কুরাইশী হতে হবে।[১২] এটা কেবল তাঁরই নয়, বরং সমস্ত আহলুস সুন্নার সর্বসম্মত অভিমত।[১৩] এর কারণ কেবল এ ছিল না যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইসলামী খেলাফত কেবল একটি গোত্রের শাসনতান্ত্রিক অধিকার। বরং এর আসল কারণ ছিল সে সময়ের পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ রাখার জন্য খলীফার কুরাইশী হওয়া যরুরী ছিল। ইবনে খালদুন এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন যে, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের মূল রক্ষা কবচ ছিল আরব। আর আরবদের সর্বাধিক ঐক্য সম্ভব ছিল কুরাইশের খেলাফতের ওপর। অপর গোত্রের লোককে গ্রহণ করলে বিরোধ এবং অনৈক্যের সম্ভাবনা

১১. আয-যাহাবী ঃ মানাকেবুল ইমাম আবি হানীফা ওয়া সাহেবাইহে, পৃষ্ঠা—১৭। আল-মাক্কী ঃ মানাকেবুল ইমামিল আযম আবি হানীফা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০০।

১২ আল-মাসউদী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯২।

১৩. আশ-শাহরিস্তানী ঃ কিতাবুল মিলাল ওয়ান-নিহাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০৬। আবদুল কাহের বাগদাদী ঃ আল-ফারকো বাইনাল ফিরাকে, পৃষ্ঠা—৩৪০।

এতটা প্রকট ছিল যে, খেলাফত ব্যবস্থাকে এ আশংকার মুখে ঠেলে দেয়া সমীচীন ছিল না।[১৪] এ কারণে নবী (সঃ) হেদায়াত দিয়েছিলেন যে, ইমাম হবে কুরাইশের মধ্য থেকে।[১৫] অন্যথায় এ পদ অ-কুরাইশীর জন্য নিষিদ্ধ হলে ওফাতকালে খলীফা ওমর (রাঃ) বলতেন না যে, "হোযাইফার মুক্ত দাস সালেম জীবিত থাকলে আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করার প্রস্তাব করতাম।" নবী (সঃ) নিজেও কুরাইশের মধ্যে খেলাফত রাখার হেদায়াত দিতে গিয়ে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, যতদিন তাদের মধ্যে কতিপয় বিশেষ গুণাবলী বর্তমান থাকবে, ততদিন তাদের জন্য এ পদ।[১৭] এ থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, এ সকল গুণাবলীর অবর্তমানে অ-কুরাইশীর জন্য খেলাফত হতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং সকল আহলুস সুন্নার পথ এবং যে সকল খারেজী ও মুতাযিলার মতের মধ্যে এটাই হচ্ছে মূল পার্থক্য, যারা অ-কুরাইশীর জন্য অবাধ খেলাফতের বৈধতা প্রমাণ করে, বরং এক কদম অগ্রসর হয়ে অ-কুরাইশীকে খেলাফতের অধিক হকদার প্রতিপন্ন করে। তাদের দৃষ্টিতে আসল গুরুত্ব ছিল গণতন্ত্রের, তার পরিণতি বিচ্ছেদ অনৈক্যই হোক না কেন। কিন্তু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত গণতন্ত্রের সাথে রাষ্ট্রের স্থিতি সংহতির কথাও চিন্তা করতেন।

চার ঃ বায়তুল মাল

সমকালীন খলীফাদের যে সকল ব্যাপারে ইমাম সাহেব সবচেয়ে বেশী আপত্তি করতেন, রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডারে তাদের দেদার ব্যবহার এবং জনগণের সম্পদের ওপর হস্ত সম্প্রসারণ ছিল তার অন্যতম। তাঁর মতে নির্দেশ দানে অন্যায় এবং বায়তুল মালে খেয়ানত কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব রহিত করার মতো গর্হিত কাজ। ইমাম যাহাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা ইতিপূর্বে এ কথা উল্লেখ করেছি। বৈদেশিক রাষ্ট্র থেকে খলীফার নিকট যেসব উপহার উপঢৌকন আসতো, তাকেও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করাকেও তিনি জায়েয মনে করতেন না। তাঁর মতে এ সব হচ্ছে জনগণের ধনভাণ্ডারের হক, খলীফা এবং তার খান্দানের নয়। তাঁর মতে তারা মুসলমানদের খলীফা না হলে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তি প্রচেষ্টার বদৌলতে খলীফার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হলে গৃহে বসে খলীফা এ সব উপহার উপঢৌকন লাভ করতেন না।[১৮] তিনি বায়তুল মাল থেকে খলীফার যথেচ্ছ ব্যবহার এবং দান-দক্ষিণায়ও আপত্তি করতেন। যেসব কারণে তিনি খলীফাদের দান গ্রহণ করতেন না, এটাও ছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ।

---

১৪. আল-মোকাদ্দমা, পৃষ্ঠা—১৯৫-১৯৬।

১৫. ইবনে হাজার ঃ ফতহুল বারী, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৯৩,৯৬ ও ৯৭। মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৯, ১৮৩ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃঠা—৪২১। আল-মাতবাআতুল মায়মানিয়্যা, মিসর, ১৩০৬ হিজরী। মুসনাদে আবুদাউদ আত্-তায়ালেসী, হাদীস সংখ্যা ৯২৬, ২১৩৩। দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, ১৩২১ হিজরী সংস্করণ।

১৬. আত-তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯২।

১৭. ইবনে হাজার ঃ ফতহুল বারী, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৯৫।

১৮. আস-সারাখসী ঃ শারহুস সিয়ারিল কাবীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৯৮।

খলীফা মনসুরের সাথে যখন তাঁর ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছিল, সে সময়ে একবার মনসুর তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ আপনি আমার হাদিয়া গ্রহণ করেন না কেন? তিনি জবাব দেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন নিজের অর্থ থেকে কখন আমাকে দান করেছেন যে,আমি তাঁর দান গ্রহণ করবো না। আপনি নিজের সম্পদ থেকে দান করলে আমি নিশ্চয়ই গ্রহণ করতাম। আপনি তো আমাকে দিয়েছেন মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে। অথচ তাদের সম্পদে আমার কোন অধিকার নেই। আমিতো তাদের প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধ করি না যে, একজন সৈনিকের অংশ পাবো। আমি তো আর তাদের সন্তানাদি নই যে, সন্তানের অংশ গ্রহণ করবো, আমি তো আর ফকীর নই, যে ফকীরের প্রাপ্য হিস্যা পাবো।[১৯]

কাযীর পদ গ্রহণ না করায় মনসুর তাঁকে ৩০ ঘা বেত্রাঘাত করে। তাঁর দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে যায়। এ সময় খলীফার চাচা আবদুস সামাদ ইবনে আলী তাঁকে কঠোর তিরস্কার করে বলেন ঃ আপনি এ কি করেছেন? এক লক্ষ তরবারী আপনার জন্য ডেকে এনেছেন। ইনি ইরাকের ফকীহ্। বরং গোটা প্রাচ্যের ফকীহ্ তিনি। মনসুর এতে লজ্জিত হয়ে প্রতি কোড়ার বিনিময়ে এক হাজার দেরহাম হিসেব করে ইমামের নিকট ৩০ হাযার দেরহাম প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁকে বলা হয়, গ্রহণ করে দান করে দিন। জবাবে তিনি বলেন ঃ তার কাছে কোন হালাল সম্পদও কি আছে? [২০]

এর কাছাকাছি সময়ে উপর্যুপরী নির্যাতন সইতে গিয়ে যখন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি ওসিয়াত করেন যে, বাগদাদ শহর পত্তনের জন্য মানসুর মানুষের যেসব এলাকা জবর দখল করে নিয়েছিল সে সব এলাকায় যেন তাঁকে দাফন করা না হয়। তাঁর এ ওসিয়াতের কথা শোনে মনসুর চিৎকার করে বলে ওঠে ঃ 'আবু হানীফা। জীবনে মরণে তোমার পাকড়াও থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে।

পাঁচ ঃ শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এই যে, ন্যায়ের খাতিরে তাকে কেবল শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব মুক্তই হতে হবে না ; বরং বিচারককে এতটুকু ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে যে, স্বয়ং খলীফাও যদি জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তিনি যেন তার ওপরও নির্দেশ জারী করতে পারেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি যখন নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে, সরকার আর তাঁকে বেঁচে থাকতে দেবে না, তখন তিনি তাঁর শাগরেদদের সমবেত করে এক ভাষণ দান করেন। অন্যান্য গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় ছাড়া এ ভাষণে তিনি এ কথাও বলেন ঃ

'খলীফা যদি এমন কোন অপরাধ করে যা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, তখন মর্যাদায় তার নিকটতম কাযী (অর্থাৎ কাযীউল কোযাত— প্রধান বিচারপতি)-কে তার ওপর নির্দেশ জারী করতে হবে।'[২২]

---

১৯. আল-মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১৫।
২০. আল-মাক্কী, পৃষ্ঠা—২১৫-২১৬।
২১. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮০।
২২. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১০০।

বনী-উমাইয়া এবং বনী-আব্বাসীয়দের শাসনামলে সরকারী পদ বিশেষত কাযীর পদ গ্রহণ না করার অন্যতম প্রধান কারণ এই ছিল যে, তিনি এদের রাজত্বে কাযীর এ মর্যাদা দেখতে পাননি। সেখানে খলীফার ওপর আইনের বিধান প্রয়োগের সুযোগ ছিল না, কেবল তাই নয়, বরং তাঁর আশংকা ছিল যে, তাঁকে অত্যাচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তাঁর দ্বারা অন্যায় ফায়সালা জারী করান হবে জোর করে। আর তাঁর ফায়সালায় কেবল খলীফা-ই নয়, বরং খলীফা প্রাসাদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরাও হস্তক্ষেপ করবে।

বনী-উমাইয়াদের শাসনামলে সর্ব প্রথম ইরাকের গবর্ণর ইয়াযীদ ইবনে ওমর ইবনে হোবায়রা তাঁকে সরকারী পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এটা হিজরী ১৩০ সালের কথা। তখন ইরাকে উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের এমন এক ঘনঘটা দেখা দেয়, যা মাত্র দু'বছরের মধ্যেই উমাইয়াদের সিংহাসন ওলট-পালট করে ফেলে। এ সময় বড় বড় ফকীহদের সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রভাব দ্বারা কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছিল ইবনে হোবায়রা। তাই তিনি ইবনে আবি লায়লা, দাউদ ইবনে আবিল হিন্দ, ইবনে শুবরোমা প্রমুখ ব্যক্তিকে ডেকে গুরত্বপূর্ণ পদ দান করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফাকে ডেকে বলেন, আমার সীল মোহর আপনার হাতে সমর্পণ করছি। আপনি সীল না দিলে কোন নির্দেশ জারী হবে না, আপনার অনুমোদন ব্যতীত ট্রেজারী থেকে কোন অর্থ বাইরে যাবে না। তিনি এ পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাঁকে আটক করা হয়। চাবুক মারার ভয় দেখান হয়। অন্যান্য ফকীহরা ইমাম সাহেবকে পরামর্শ দেন, নিজের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমরাও পদ গ্রহণে রাযী নই ; কিন্তু বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছি। আপনিও গ্রহণ করুন। তিনি জবাবে বলেন, "সে কোন ব্যক্তির হত্যার নির্দেশ দেবে, আর আমি তা অনুমোদন করবো, এটা দূরের কথা, সে যদি আমাকে ওয়াসেতের মসজিদের দরজা গণনার নির্দেশ দেয়, আমি তা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নই। আল্লার কসম, এ দায়িত্বে আমি অংশ নেবো না।" এ প্রসঙ্গে ইবনে হোবায়রা তাঁর সামনে অন্যান্য পদও পেশ করে, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তিনি তাঁকে কুফার কাযী নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কসম করে বলে যে, এবার আবু হানীফা অস্বীকার করলে তাঁকে চাবুক মারবো। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)ও কসম করে বলেন, দুনিয়ায় তার চাবুকের ঘা সহ্য করা আমার জন্য আখেরাতের শাস্তি ভোগ করার চেয়ে আনেক সহজ। আল্লার কসম, সে আমায় হত্যা করলেও আমি তা গ্রহণ করবো না। শেষ পর্যন্ত সে তাঁর মাথায় ২০ বা ৩০ চাবুক মারে। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী দশ-এগার দিন ধরে দৈনিক দশটি করে চাবুক মারা হয়। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতিতে অটল। শেষ পর্যন্ত তাকে জানান হয় যে, লোকটি মারাই যাবে। তিনি বলেন, আমার কাছ থেকে অবকাশ চেয়ে নেয়ার জন্য তাঁকে পরামর্শ দেয়ার মতও কি কেউ নেই? ইবনে হোবায়রার এ উক্তি ইমাম আবু হানীফাকে জানান হলে তিনি বলেন, বন্ধুদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার জন্য আমাকে মুক্তি দাও। এ কথা শোনেই ইবনে হোবায়রা তাঁকে ছেড়ে দেয়। তিনি কুফা ছেড়ে মক্কা চলে যান। বনী-উমাইয়াদের সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বে সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি।[২৩]

২৩. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১, ২৪। ইবনে খাল্লেকান,৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪১। ইবনুল আবদিল বার্ আল-ইন্তেকা, পৃষ্ঠা—১৭১।

এরপর আব্বাসীয়দের শাসনকালে আল–মনসুর কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য পীড়া–পীড়ি করতে শুরু করে তাঁর সাথে। এ বিষয় সম্পর্কে আমরা পরে উল্লেখ করবো। মনসুরের বিরুদ্ধে নফসে যাকিয়্যা এবং তাঁর ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহে ইমাম সাহেব প্রকাশ্যে তাদের সহযোগিতা করেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মনসুরের হৃদয়ে তিক্ততা স্থান লাভ করেছিল। ঐতিহাসিক আয্–যাহাবীর ভাষায়, মনসুর তাঁর বিরুদ্ধে ক্রোধে বিনা আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছিল।[২৪] কিন্তু তাঁর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর হস্তক্ষেপ করা মনসুরের জন্য সহজ ছিল না। এক ইমাম হুসাইন (রাঃ)–এর হত্যা বনী–উমাইয়াদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে কতটা ঘৃণার সঞ্চার করেছিল এবং এর ফলে শেষ পর্যন্ত কতো সহজে তাদের ক্ষমতার মুলোৎপাটন হয়েছিল, সে কথা মনসুরের জানা ছিল। তাই, মনসুর তাঁকে না মেরে বরং স্বর্ণের পিঞ্জীরে আবদ্ধ রেখে নিজের উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করাকে শ্রেয় মনে করে। এ উদ্দেশ্যেই মনসুর তাঁর সামনে বারবার কাযীর পদ পেশ করেছে, এমনকি, তাঁকে গোটা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের কাযী–উল–কোযাত—প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন টাল–বাহানা করে তা এড়িয়ে যান।[২৫] শেষ পর্যন্ত মনসুর আরও বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করলে ইমাম সাহেব তাকে উক্ত পদ গ্রহণ না করার কারণ জানিয়ে দেন। একদা আলোচনা প্রসঙ্গে একান্ত নরম সুরে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন ঃ আপনার, আপনার শাহজাদা এবং সিপাহশালারদের ওপর আইন জারী করার মতো সাহস যার নাই, সে ব্যক্তি এ পদের জন্য যোগ্য হতে পারে না। এমন সাহস আমার নেই। আপনি যখন আমাকে ডাকেন তখন ফিরে এসেই তো আমার প্রাণ বেরুবার উপক্রম।[২৬] আর একবার কড়া কথাবার্তা বলে। এতে তিনি খলীফাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আল্লার কসম, সন্তুষ্ট হয়ে আমি এ পদ গ্রহণ করলেও আপনার আস্থাভাজন হতে পারবো না। সুতরাং অসন্তুষ্ট হয়ে দায়ে পড়ে এ পদ গ্রহণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কোন ব্যাপারে যদি আমার ফায়সালা আপনার বিরুদ্ধে যায়, আর আপনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেন যে, তোমার ফায়সালা পরিবর্তন না করলে আমি তোমাকে ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে মারবো, তখন আমি নদীতে ডুবে মরা কবুল করবো কিন্তু ফায়সালা পরিবর্তন করবো না। এ ছাড়াও আপনার তো অনেক সভাসদ রয়েছে। তাদের এমন একজন বিচারক দরকার, যিনি আপনার খাতিরে তাদের কথাও বিবেচনা করবেন।[২৭] এ সব কথা শুনে মনসুর যখন নিশ্চিত হলো যে, এ লোকটিকে সোনার পিঞ্জীরায় আবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তখন সে প্রকাশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হয়। তাঁকে চাবুক মারা হয়, কারাগারে নিক্ষেপ করে খাওয়া–দাওয়ার ভীষণ কষ্ট দেয়, একটি গৃহে নযর বন্দী করে রাখে, কারো মতে স্বাভাবিক মৃত্যু, কারো মতে বিষ প্রয়োগে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।[২৮]

ছয় ঃ মত প্রকাশের অধিকার

তাঁর মতে, মুসলিম সমাজ তথা ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্বও ছিল বিরাট। কুরআন এবং সুন্নায় এ জন্য ন্যায়ের নির্দেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ

২৪. মানাকিবুল ইমাম, পৃষ্ঠা—৩০।
২৫. আল–মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭২, ১৭৩, ১৭৮।
২৬. আল–মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১৫।
২৭. আল–মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭০। আল–খতীব, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩২০।
২৮. আল–মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭৩, ১৭৪, ১৮২। ইবনে খাল্লেকান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৬। আল–ইয়াফেয়ী, মিরাআতুল জানান, পৃষ্ঠা—৩১০।

পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নিছক মত প্রকাশ একান্ত অন্যায়ও হতে পারে, হতে পারে বিপর্যয়াত্মক, নীতি-নৈতিকতা এবং মানবতা বিরোধী, যা কোন আইনই বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু অন্যায় কার্য থেকে নিবৃত্ত করা এবং ন্যায়ের নির্দেশ দেয়া সত্যিকার অর্থেই মত প্রকাশ। ইসলাম এ পরিভাষা গ্রহণ করে মত প্রকাশের সকল খাতের মধ্যে কেবল এটিকে বিশেষ করে জনগণের অধিকারই প্রতিপন্ন করেনি, বরং এটাকে জনগণের কর্তব্য বলেও চিহ্নিত করেছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এ অধিকার এবং কর্তব্যের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। কারণ তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের এ অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। এর ফরয হওয়া সম্পর্কেও মানুষের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে তখন মুর্জিয়ারা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার দ্বারা জনগণকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করছিল, অপর দিকে 'হাশবিয়া' নামে আর একটি ফেরকা মনে করতো যে, সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের নির্দেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ আর একটি ফেতনা। এ ছাড়া বনী-উমাইয়া এবং বনী-আব্বাসীয়দের সরকার শাসক শ্রেণীর ফিসক-ফুজুর এবং অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মুসলমানদের প্রাণ শক্তিকে নিশ্চিত করছিল। তাই ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর কথা এবং কার্য দ্বারা এ প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন এর সীমা চিহ্নিত করতে। আল-জাস্সাস-এর বর্ণনা মতে, ইবরাহীম আস-সায়েগ (খোরাসানের প্রসিদ্ধ এবং প্রভাবশালী ফকীহ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে ইমাম সাহেব বলেনঃ 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহই আনিল মুনকার' ফরয। ইকরামা হতে ইবনে আব্বাসের সনদে তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসটিও স্মরণ করিয়ে দেন ঃ হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব শহীদদের মধ্যে সকলের চেয়ে উত্তম। অতঃপর সে ব্যক্তি উত্তম যে যালেম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলে, অন্যায় কার্য থেকে তাকে নিবৃত্ত করে এবং এ অপরাধে প্রাণ হারায়। ইবরাহীমের ওপর তাঁর এ দীক্ষার এতটা বিরাট প্রভাব পড়েছিল যে, তিনি খোরাসান প্রত্যাবর্তন করে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবু মুসলিম খোরাসানীকে (মৃত্যু ঃ ১৩৬ হিজরী-৭৫৪ ঈসায়ী) তার যুলুম-নির্যাতন এবং নির্বিচারে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আপত্তি জানান। বারবার বাধা দান করেন। শেষ পর্যন্ত আবু মুসমিল তাঁকে হত্যা করে।[২৯]

নাফসে যাকিয়্যার ভাই ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (১৪৫ হিজরী—৭৬৩ ঈসায়ী)-এর বিদ্রোহকালে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, তিনি প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি সমর্থন জানাতেন, আর আল-মনসুরের বিরোধিতা করতেন। অথচ আল-মনসুর তখন কুফায় অবস্থান করতো। ইবরাহীমের সেনাবাহিনী বসরার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, শহরে সারা রাত কারফিউ থাকতো। তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদ যুফর ইবনুল হোযাইল এর বর্ণনা ঃ এ নাজুক সময়ে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) অত্যন্ত জোরে শোরে প্রকাশ্যে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। এমনকি এক দিন আমি তাঁকে বললাম আমাদের সকলের গলায় রজ্জু আঁটকে না যাওয়া পর্যন্ত আপনি নিবৃত্ত হবেন না।[৩০]

হিজরী ১৪৮ সাল তথা ৭৬৫ ঈসায়ীতে মুছেল-এর অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। এর আগের এক বিদ্রোহের পর মানসুর তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ করে যে, আগামীতে তারা পুনরায় বিদ্রোহ

২৯. আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮১।
৩০. আল-খাতিব, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৩০। আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭১।

করলে তাদের জান-মাল তার জন্য হালাল হবে। তারা পুনরায় বিদ্রোহ করলে মনসুর বড় বড় ফকীহদেরকে-তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-ও ছিলেন—ডেকে জিজ্ঞেস করেন ঃ চুক্তি অনুযায়ী তাদের জান-মাল আমার জন্য হালাল হবে কিনা? অন্যান্য ফকীহরা চুক্তির আশ্রয় নিয়ে বলেন, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলে তা আপনার মর্যদার যোগ্য, অন্যথায় যে শাস্তি খুশী, আপনি তাদেরকে দিতে পারেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ) চুপ। মনসুর জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কি মত? তিনি জবাব দেন ঃ মুছেল-এর অধিবাসীরা আপনার জন্য এমন বস্তু বৈধ করেছিল যা তাদের নিজের নয় (অর্থাৎ তাদের রক্ত)। আর আপনি তাদের দ্বারা এমন এক শর্ত মানিয়ে নিয়েছেন, যার অধিকার আপনার ছিল না। বলুন, কোন স্ত্রী যদি বিবাহ ছাড়াই নিজেকে কারো জন্য হালাল করে দেয়, তাহলে কি তা হালাল হবে? কোন ব্যক্তি যদি কাউকে বলে,আমায় হত্যা করো, তবে কি তাকে হত্যা করা সে ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে? মনসুর জবাব দেয় ঃ না। ইমাম সাহেব বলেনঃ তা হলে আপনি মুছেলবাসীদের ওপর থেকে হস্ত সংকুচিত করুন। তাদেরকে হত্যা করা আপনার জন্য হালাল নয়। তাঁর এ জবাব শুনে মনসুর অসন্তুষ্ট হয়ে ফকীহদের মজলিস ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর আবু হানীফা (রঃ)-কে একান্তে ডেকে বলে ঃ আপনি যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। কিন্তু এমন কোন ফতোয়া দেবেন না, যাতে আপনার মহত্বে আচড় লাগে এবং বিদ্রোহীদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।[৩১]

আদালতের বিরুদ্ধেও তিনি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতেন। কোন আদালত ভুল ফায়সালা দান করলে তিনি আইন বা বিধির যে কোন ভুল স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন। তাঁর মতে, আদালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে, আদালতকে ভুল ফায়সালা করতে দেয়া হবে। এ অপরাধে একবার তাঁকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফায়সালা দান থেকে বিরত রাখা হয়।[৩২]

মতামতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি এতটা অগ্রসর ছিলেন যে, বৈধ নেতৃত্ব এবং ন্যায়পরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধেও কেউ যদি কোন কথা বলে, সমকালীন নেতাকে গালমন্দ দেয়, এমনকি তাকে হত্যার মত প্রকাশও করে, তাহলেও তাকে শাস্তি দান এবং আটক করাও তাঁর মতে বৈধ নয়; যতক্ষণ না সে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে । এ ব্যাপারে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। ঘটনাটি এই ঃ তাঁর শাসনকালে ৫ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তারা কুফায় তাঁকে প্রকাশ্যে গালি দিচ্ছিল। তাদের এক ব্যক্তি বলছিল যে, আমি তাঁকে হত্যা করবো। হযরত আলী (রাঃ) তাদের মুক্তির নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রাঃ)-কে বলা হয়, লোকটি তো আপনাকে হত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন ঃ এ ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য আমি কি তাকে হত্যা করবো? বলা হলো ঃ এরা তো আপনাকে গালিও দিচ্ছিল। তিনি জবাব দেন ঃ ইচ্ছা করলে তোমরাও তাকে গালি দিতে পারো। এমনিভাবে তিনি সরকার বিরোধীদের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)-এর সে ঘোষণাকেও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, যা তিনি খারেজীদের সম্পর্কে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি খারেজীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ আমি

৩১. ইবনুল আসীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫। আল-কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭। আল-সারাখসী ঃ কিতাবুল মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৯।

৩২. আল-কারদারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬০, ১৬৫, ১৬৬। ইবনে আবদুল বার্ ঃ আল-ইন্তিকা, পৃষ্ঠা—১২৫, ১৫৩। আল-খতীব, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫১।

তোমাদেরকে মসজিদে আসা থেকে বারণ করব না, বিজিত সম্পদ থেকেও নিবৃত্ত করবো না ; যতক্ষণ না তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করো।[৩৩]

সাত ঃ অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসঙ্গ

মুসলমানদের নেতা যালেম-ফাসেক হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (Revolt) করা যায় কিনা? –এটা ছিল সে সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। স্বয়ং আহলুস-সুন্নাহর মধ্যেও এ বিষয়ে মত দ্বৈততা ছিল। আহলুল হাদীস (হাদীস অনুসারীদের) এক বিরাট দলের মতে, কেবল মুখের দ্বারা এমন নেতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, তুলে ধরতে হবে সত্য কথা ; কিন্তু বিদ্রোহ করা যাবে না। নেতা অন্যায় খুন-খারাবী করলে, অন্যায়ভাবে জনগণের অধিকার হরণ করলে এমনকি স্পষ্ট ফিস্‌ক-পাপাচার করলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।[৩৪]

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মত ছিল এই যে, যালেমের নেতৃত্ব কেবল বাতেলই নয়, বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করা যাবে। কেবল করা যাবে না, বরং করতে হবে। অবশ্য এ জন্য শর্ত এই যে, সফল স্বার্থক বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকতে হবে, যালেম-ফাসেকের পরিবর্তে সৎ-ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন করতে হবে ; বিদ্রোহের ফল কেবল প্রাণ হানি এবং শক্তি ক্ষয় হবে না। আবুবকর আল-জাস্‌সাস তাঁর মতের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন ঃ

'যালেম-অত্যাচারী নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর মাযহাব প্রসিদ্ধ। এ কারণে আওযাঈ বলেছেন, আমরা আবু হানীফা (রঃ)-এর সকল কথা সহ্য করেছি, এমন কি তিনি তরবারীর সাথেও একমত হয়েছেন অর্থাৎ যালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থক হয়েছেন। আর এটা ছিল আমাদের জন্য অসহ্য। আবু হানীফা (রঃ) বলতেন, 'আমর বিল মারুফ ও নাহ্ই আনিল মুনকার' প্রথমত মুখের দ্বারা ফরয। কিন্তু এ সোজা পথে কাজ না হলে তরবারী ধারণ করা ওয়াজেব।'[৩৫]

অন্যত্র আবদুল্লা ইবনুল মুবারকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। এটা সে সময়ের কথা, যখন প্রথম আব্বাসীয় খলীফার শাসনামলে আবু মুসলিম খোরাসানী যুলুম-নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করেছিল। সে সময় খোরাসানের ফকীহ ইবরাহীম আস-সায়েগ ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 'আমার বিল মারুফ এবং নাহ্ই আনিল মুনকার' বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে ইমাম নিজে আবদুল্লা ইবনুল মুবারকের নিকট এ আলোচনার বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন ঃ

'আমর বিল মারুফ ও নাহ্ই আনিল মুনকার ফরয—এ বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে উপনীত হলে হঠাৎ ইবরাহীম বলেন, হস্ত সম্প্রসারিত করুন, আপনার বায়আত করি। তাঁর এ কথা শোনে আমার চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। ইবনুল মুবারক বলেন, আমি আরয

৩৩. আস-সারাখসী ঃ কিতাবুল মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৫।
৩৪. আল-আশআরী ঃ মাকালাতুল ইসলামিয়্যান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫।
৩৫. আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮১।

করলাম, এমন হোল কেন? তিনি জানালেন, তিনি আমাকে আল্লার একটি অধিকারের দিকে আহ্বান জানান আর আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। অবশেষে আমি তাকে বললাম,একা কোন ব্যক্তি এ জন্য দাঁড়ালে প্রাণ হারাবে। এ প্রাণ দান মানুষের কোন কাজে আসবে না। অবশ্য সে যদি একজন সৎ সাহায্যকারী ব্যক্তি লাভ করে, নেতৃত্বের জন্যও এমন একজন ব্যক্তি পাওয়া যায়, আল্লার দ্বীনের ব্যাপারে যে নির্ভরযোগ্য, তাহলে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এরপর ইবরাহীম যখনই আমার কাছে এসেছেন, এ কাজের জন্য আমাকে এমন চাপ দিয়েছেন, যেমন কোন মহাজন ঋণ আদায়ের জন্য করে থাকে। আমি তাকে বলতাম, এটা কোন একক ব্যক্তির কাজ নয়। নবীদেরও এ ক্ষমতা ছিল না, যতক্ষণ না এ জন্য আসমান থেকে নির্দেশ না আসে। এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু এটা এমন এক কাজ যে, কোন ব্যক্তি এ জন্য দাঁড়ালে নিজের জান হারাবে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে ব্যক্তি আপন প্রাণ সংহারে সহায়তার অপরাধে অপরাধী হবে। সে ব্যক্তি প্রাণ হারালে এ বিপদ মাথা পেতে নিতে অন্যদের সাহসও লোপ পাবে।"[৩৬]

বিদ্রোহের ব্যাপারে ইমামের নিজের কর্মধারা

ওপরের আলোচনা দ্বারা এ ব্যাপারে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট জানা যায়। কিন্তু তাঁর সময়ে সংঘটিত বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীতে তিনি কি কর্মধারা অবলম্বন করেছেন, তা দেখার আগে তাঁর পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহ

প্রথম ঘটনা যায়েদ ইবনে আলীর। শীআ'দের যায়দিয়া ফেরকা নিজেদেরকে এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করে। ইনি ছিলেন হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর পৌত্র এবং ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকের-এর ভাই। তিনি তাঁর সময়ের বিরাট আলেম, ফকীহ, আল্লাভীরু এবং সত্যাশ্রয়ী বুযুর্গ ব্যক্তি। স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-ও তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন। ১২০ হিজরী তথা ৭৩৮ ঈসায়ীতে হিশাম ইবনে আবদুল মালেক খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কাসরীকে ইরাকের গভর্ণরের পদ হতে বরখাস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালালে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দানের জন্য হযরত যায়েদকেও মদীনা থেকে কূফায় তলব করা হয়। দীর্ঘদিন পরে এ প্রথমবারের মতো হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কূফা আগমন করেন। কূফা ছিল শীআদের কেন্দ্রস্থল। তাই তার আগমনে হঠাৎ আলভী আন্দোলনে প্রাণ স্পন্দন সঞ্চার হয়। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর পাশে জড়ো হতে থাকে। এমনিতে ইরাকের অধিবাসীরা বছরের পর বছর ধরে বনী-উমাইয়াদের যুলুম-নির্যাতন সইতে সইতে অস্থির হয়ে ওঠেছিল। মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য দীর্ঘ দিন থেকে তারা পথ খুঁজছিল। আলীর বংশের একজন সত্যাশ্রয়ী আলেম ফকীহকে পেয়ে তারা ধন্য হলো। নিজেদের জন্য গণীমাত মনে করলো। কূফার অধিবাসীরা তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে জানায় যে, এক লক্ষ লোক আপনার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। ১৫ হাযার লোক বায়আত করে যথারীতি নিজেদের নামও রেজিস্ট্রীভুক্ত করেছে। এ সময় ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলাকালে উমাইয়া গবর্ণরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সরকার অবহিত

---

৩৬. আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩১।

হয়ে পড়েছে দেখে যায়েদ ১২২ হিজরীর সফর মাসে (৭৪০খৃষ্টাব্দ) সময়ের পূর্বেই বিদ্রোহ করে বসেন। সংঘর্ষ দেখা দিলে কূফার শীআরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। যুদ্ধের সময় কেবল ২১৮ ব্যক্তি তাঁর সাথে ছিল। যুদ্ধকালে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।[৩৭]

এ বিদ্রোহে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর সম্পূর্ণ সহানুভূতি তিনি লাভ করেন। তিনি যায়েদকে আর্থিক সাহায্য করেন, জনগণকে তাঁর সহযোগিতা করার দীক্ষা দেন।[৩৮] তিনি যায়েদের বিদ্রোহকে বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বহির্গমনের সাথে তুলনা করেন।[৩৯] এর অর্থ এই যে, তাঁর মতে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যের ওপর থাকা যেমন সন্দেহমুক্ত ছিল, ঠিক তেমনি যায়েদ ইবনে আলীর সত্যের ওপর থাকাও তেমনি সন্দেহমুক্ত। কিন্তু যায়েদের সহযোগিতা করার জন্য তাঁর কাছে যায়েদের পয়গাম পৌঁছলে তিনি বার্তাবাহককে জানান জনগণ তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবে না, সত্য সত্যই তাঁর সহযোগিতা করবে জানলে আমি অবশ্যই তাঁর সাথে শরীক হয়ে জিহাদ করতাম। কারণ, তিনি সত্য-সঠিক ইমাম। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে এরা তার দাদা সাইয়্যেদেনা হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর মতো তাঁর সাথেও বিশ্বাস ঘাতকতা করবে। অবশ্য অর্থ দ্বারা আমি নিশ্চয়ই তাঁর সাহায্য করবো।[৪০] যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে তিনি যে নীতিগত মত ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর এ মত ছিল ঠিক তারই অনুরূপ। কূফার শীআদের ইতিহাস এবং তাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় থেকে এরা ক্রমাগত যে চরিত্র এবং কার্যের পরিচয় দিয়ে আসছিল, তার পূর্ণ ইতিহাস সকলের সামনে ছিল। কূফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যথাসময় অবহিত করে ইবনে আব্বাসের পৌত্র দাউদ ইবনে আলীও বিদ্রোহ থেকে যায়েদকে বারণ করেন।[৪১] ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এও জানতেন যে, এ আন্দোলন কেবল কূফায় চলছে। উমাইয়াদের গোটা সাম্রাজ্যের অপরাপর এলাকায় এর কোন চাপ নেই। অন্য কোন স্থানে এ আন্দোলনের এমন কোন সংগঠনও নেই সেখান থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। আর কূফায়ও কেবল ছ'মাসের মধ্যে এ অপরিপক্ক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেছে। তাই সকল বাহ্যিক লক্ষণ দেখে যায়েদের বিদ্রোহ দ্বারা কোন সফল বিপ্লব সাধিত হবে—এমন আশা তিনি করতে পারেননি। উপরন্তু তাঁর এ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ না করার সম্ভবত এটাও অন্যতম কারণ ছিল যে, তখন পর্যন্ত তাঁর এতটা প্রভাবও হয়নি যে, তাঁর অংশ গ্রহণের ফলে আন্দোলনের দুর্বলতা কিছুটা দূরীভূত হতে পারে। ১২০ হিজরী পর্যন্ত ইরাকের আহলুর রায় মাদ্রাসার নেতৃত্ব ছিল হাম্মাদের হাতে। তখন পর্যন্ত আবু হানীফা (রঃ) ছিলেন নিছক তাঁর একজন শিষ্য মাত্র। যায়েদের বিদ্রোহকালে তাঁর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণের মাত্র দেড়-দুই বছর বা তার চেয়ে কিছু কম বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখনও তিনি প্রাচ্যের ফিকাহবিদ-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হননি, লাভ করেননি এর প্রভাব এবং মর্যাদা।

---

৩৭. আত-তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৮২, ৫০৫।
৩৮. আল-জাস্সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮১।
৩৯. আল-মাক্কী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৬০।
৪০. আল-মাক্কী, ১ম খণ্ড, পষ্ঠা—২৬০।
৪১ আত-তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৮৭, ৪৯১।

নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহ

দ্বিতীয় বিদ্রোহ ছিল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লা (নাফসে যাকিয়্যা) এবং তাঁর ভাই ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লার। ইনি ছিলেন ইমাম হাসান ইবনে আলীর বংশধর। ১৪৫ হিজরী তথা ৭৬২—৬৩ সালের ঘটনা। তখন ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর পুরো প্রভাব-প্রতাপ বিস্তার লাভ করেছে।

তাঁদের গোপন আন্দোলন বনী-উমাইয়াদের শাসনকাল থেকেই চলে আসছে। এমনকি, এক সময় আল-মনসুরও উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সঙ্গে অন্যান্যদের সাথে নাফসে যাকিয়্যার হাতে বায়আত গ্রহণ করে।[৪২] আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর এরা আত্মগোপন করে। আর গোপনে গোপনে তাদের দাওয়াত বিস্তার লাভ করেতে থাকে। খোরাসান, আলজাযিয়া, রায়, তাবারিস্তান, ইয়ামন এবং উত্তর আফ্রিকায় এদের প্রচারক ছড়িয়ে ছিল। নাফসে যাকিয়্যা হেজাযে তাঁর কেন্দ্র স্থাপন করেন। আর তাঁর ভাই ইবরাহীমের কেন্দ্র ছিল ইরাকের বসরায়। ঐতিহাসিক ইবনে আসীরের উক্তি অনুযায়ী কূফায়ও তাঁর সাহায্যে একশত তরবারী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত ছিল।[৪৩] এঁদের গোপন আন্দোলন সম্পর্কে আল-মনসুর পূর্ব হতেই অবহিত ছিল এবং এদের ব্যাপারেই ছিল অত্যন্ত সন্ত্রস্ত। কারণ, আব্বাসীয় দাওয়াতের সমানে সমানে এদের দাওয়াতও চলছিল। আব্বাসীয় দাওয়াতের ফলে শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সংগঠন আব্বাসীয় সংগঠনের চেয়ে কম ছিল না মোটেই এ কারণে মনসুর কয়েক বছর যাবত এ আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে, তাকে প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করে।

হিজরী ১৪৫ সালের রজব মাসে নাফসে যাকিয়্যা মদীনা থেকে কার্যত বিদ্রোহ শুরু করলে মনসুর অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বাগদাদ শহরের নির্মাণ কার্য ছেড়ে দিয়ে কূফায় গমন করে। এ আন্দোলনের মূলোৎপাটন পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য টিকে থাকবে কিনা, সে নিশ্চিত ছিল না। মনসুর অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলতো ঃ "আল্লার শপথ। কি করি কিছুই মাথায় ধরছে না।" বসরা, কায়েস, আহওয়ায, ওয়াসেত, মাদায়েন, সাওয়াদ ইত্যাকার স্থান থেকে পতনের খবর আসছিল। চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল। দীর্ঘ ২ মাস যাবৎ পোশাক পরিবর্তনের সুযোগ হয়নি তার, বিছানায় শোয়ার সুযোগ হয়নি, সারা রাত সালাতের মুসাল্লায় কাটিয়ে দিতো।[৪৪] কূফা থেকে পলায়ন করার জন্য সে প্রতিনিয়ত দ্রুতগামী সওয়ারী প্রস্তুত করে রেখেছিল। সৌভাগ্য তার সহায়ক না হলে এ আন্দোলন তার এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ভিত ওলট-পালট করে ছাড়তো।[৪৫]

এ বিপ্লবকালে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর কর্মধারা প্রথমোক্ত বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে বিদ্রোহের সময় মনসুর কূফায় অবস্থান করছিল,

---

৪২. আত-তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৫, ১৫৬।

৪৩. আল-কামেল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮।

৪৪. আত-তাবারী (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৫ থেকে ১৬৩ পর্যন্ত এ আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। ওপরে আমরা তার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করেছি।

৪৫. আল-ইয়াকেয়ী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৯১।

শহরে রাতের বেলা কারফিউ লেগেই থাকতো। তখন তিনি জোরে শোরে সে আন্দোলনের প্রকাশ্য সহযোগিতা করেন। এমনকি, তাঁর শাগরেদরা আশংকা বোধ করেন যে, আমাদের সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবে। তিনি জনগণকে ইবরাহীমের সহযোগিতার দীক্ষা দিতেন, তাঁর বায়আত করার জন্য উপদেশ দিতেন।[৪৬] ইবরাহীমের সাথে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকে তিনি নফল হজ্জের চেয়ে ৫০ বা ৭০ গুণ বেশী পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করতেন।[৪৭] আবু ইসহাক আল-ফাযারী নামক জনৈক ব্যক্তিকে তিনি এ কথাও বলেন যে, তোমার ভাই ইবরাহীমের সহযোগিতা করেছেন। তোমার কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ করা থেকে তোমার ভাই-এর কাজ অনেক উত্তম।[৪৮] আবুবকর আল-জাস্সাস আল-মুয়াফফাক আল-মাক্কী, ফতাওয়া-ই-বায্যাযিয়ার রচয়িতা ইবনুল বায্যায্ আল-কারদারীর মতো উঁচু মর্তবার ফকীহরা ইমামের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ সব উক্তির স্পষ্ট অর্থ এই যে, তাঁর মতে, মুসলিম সমাজকে আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের গোলযোগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা বাইরের কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে অনেক গুণ অধিক মর্যাদার কাজ।

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্ময়কর পদক্ষেপ ছিল এই যে, তিনি আল-মনসুরের একান্ত বিশ্বাসভাজন জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি হাসান ইবনে কাহ্তোবাকে নাফসে যাকিয়্যা এবং ইবরাহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করেন। তাঁর পিতা কাহতোবা ছিলেন সে ব্যক্তি, যাঁর তরবারী আবু মুসলিম-এর দূরদর্শীতা এবং রাজনীতির সাথে মিশে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সেনাপতিদের মধ্যে আল-মনসুর তাঁকেই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি কূফায় অবস্থান করে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর ভক্তে পরিণত হন। একবার তিনি ইমামকে বলেন, আমি এ পর্যন্ত যত পাপ করেছি (অর্থাৎ মনসুরের চাকরী করতে গিয়ে আমার হাতে যেসব অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে), তা সবই আপনার জানা আছে। এ সব পাপ মোচনের কি কোন উপায় আছে? ইমাম সাহেব বলেন ঃ "আল্লাহ যদি জানেন যে, তোমার কার্যের জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত, ভবিষ্যতে কোন নিরপরাধ মুসলমানদেরকে হত্যার জন্য তোমাকে বলা হলে তাকে হত্যা করার পরিবর্তে নিজে হত্যা হতে যদি প্রস্তুত হও ; অতীত কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি করবে না—আল্লার সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করলে এটা হতো তোমার জন্য তাওবা।" ইমাম সাহেবের এ উক্তি শোনে হাসান তাঁর সামনেই অঙ্গীকার করেন। এর কিছুকাল পরই নাফসে যাকিয়্যা এবং ইবরাহীমের বিদ্রোহের ঘটনা সংঘটিত হয়। মনসুর হাসানকে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তিনি এসে ইমামের নিকট তা জানান। ইমাম বলেন ঃ "এখন তোমার তাওবার পরীক্ষার সময় এসেছে। প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলে তোমার তাওবা ঠিক থাকবে। অন্যথায় অতীতে যা করেছো, তার জন্যও আল্লার কাছে ধরা পড়বে আর এখন যা করবে, তার শাস্তিও পাবে।" হাসান পনুরায় নূতন করে তাওবা করে ইমামকে বলেন, আমার প্রাণ নাশ করা হলেও আমি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো না। তাই তিনি মনসুর এর নিকট গিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন ঃ "আমীরুল মুমিনীন ! আমি এ যুদ্ধে যাবো না। এ পর্যন্ত আমি আপনার আনুগত্যে যা কিছু করেছি তা আল্লার আনুগত্যে হলে আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট আর তা যদি আল্লার অবাধ্যতায় হয়ে থাকে

৪৬. আল-কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭২। আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৪।
৪৭. আল-কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭১। আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৩।
৪৮. আল-জাসসাস ঃ আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড,পৃষ্ঠা—৮১

তাহলে আমি আর পাপ করতে চাই না।" মনসুর এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে হাসানকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়। হাসানের ভাই হামীদ এগিয়ে এসে বললেন ঃ "বছর খানেক থেকে তাকে ভিন্নরূপে দেখছি। সম্ভবত তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমি এ যুদ্ধে গমন করবো। পরে মনসুর তার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের ডেকে জিজ্ঞেস করে, এ সকল ফকীহদের মধ্যে হাসান কার নিকট গমন করতো? বলা হয়, অধিকন্তু আবু হানীফা (রঃ)-এর নিকট তার যাতায়াত ছিল।[৪৯]

সফল এবং সৎ বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকলে অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেবল যায়েজ-বৈধই নয়, বরং ওয়াজেবও। ইমামের এ দর্শনের পুরোপুরি অনুকূলে ছিল তাঁর এ কর্মধারা। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রঃ)-এর কর্মধারাও ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর পরিপন্থী ছিল না। নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আমাদের ঘাড়ে তো মনসুরের বায়আত রয়েছে, এখন আমরা খেলাফতের অপর দাবীদারদের সহযোগিতা করতে পারি কি ভাবে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি ফতোয়া দিয়ে বলেন ঃ আব্বাসীয়দের বায়আত জোর-যবরদস্তীরায়াত আর জোর-যবরদস্তী বায়আত-কসম-তালাক-যাই হোক না কেন-তা বাতেল।[৫০] তাঁর এ ফতোয়ার ফলে অধিকাংশ লোক নাফসে যাকিয়্যার সহযোগী হয়ে পড়ে। পরে ইমাম মালেক (রঃ)-কে ফতোয়ার শস্তি ভোগ করতে হয়। মদীনার আব্বাসীয় শাসনকর্তা জা'ফর ইবনে সুলায়মান তাঁকে চাবুক মারেন, তার হস্তকে স্কন্ধ দেশের সাথে বেঁধে রাখা হয়।[৫১]

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এ ক্ষেত্রে একক নন

বিদ্রোহের ব্যাপারে আহলুস সুন্নার মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) একা, এমন কথা মনে করা ঠিক হবে না। আসল কথা এই যে, হিজরী প্রথম শতকে শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মত তাই ছিল, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর কথা এবং কার্য দ্বারা যা প্রকাশ করেছেন। খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথম যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেনঃ

أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ - فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ -

---

৪৯. আল-কারদারী, ২য় খন্ড ,পৃষ্ঠা-২২

৫০. আব্বাসীয়দের নিয়ম ছিল, বায়আত গ্রহণ কালে তারা জনগণের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন-তারা এ বায়আতের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের স্ত্রী তালাক। তাই ইমাম বায়আতের সাথে কসম এবং জোরপূর্বক তালাকের কথা উল্লেখ করেছেন।

৫১. আত-তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯০। ইবনে খাল্লেকান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫। ইবনেকাসীর ঃ আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৪। ইবনে খাল্লেকান, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৯১।

—যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। কিন্তু আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলে তোমাদের ওপর আমার আনুগত্য যরুরী নয়।[৫২]

হযরত ওমর (রাঃ)বলেন ঃ

مَنْ بَايَعَ رَجُلاً مِنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يُبَايِعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً اَنْ يُقْتَلاَ۔

—মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করে যে কারো বায়আত করে, সে এবং যার বায়আত করা হয়—সে ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকে প্রতারিত করে এবং নিজেকে হত্যার জন্য পেশ করে।[৫৩]

ইয়াযিদ প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে হযরত হুসাইন (রাঃ) যখন বিদ্রোহ করেন, তখন অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। সাহাবীদেরকে দেখেছেন, এমন ফকীহদের তো প্রায় সকলেই বর্তমান ছিলেন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রাঃ) একটা হারাম কাজ করতে যাচ্ছেন—কোন সাহাবী বা তাবেয়ীর এমন উক্তি আমাদের চোখে পড়েনি। যে সকল ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (রাঃ)-কে বারণ করেছিলেন তাঁরা বারণ করেছিলেন এ বলে যে, ইরাকবাসীদের বিশ্বাস নেই। আপনি সফল হতে পারবেন না, এ পদক্ষেপ দ্বারা কেবল নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবেন। অন্য কথায়, এ ব্যাপারে তাঁদের সকলের মত তাই ছিল, পরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যা ব্যক্ত করেছেন, অর্থাৎ অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মূলত কোন অবৈধ কাজ নয়। অবশ্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে দেখতে হবে যে, অসৎ নেতৃত্ব পরিবর্তন করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না। কুফাবাসীদের উপর্যুপুরী পত্রের ভিত্তিতে এ কথা মনে করেছিলেন যে, এত সহযোগী-সমর্থক তিনি লাভ করেছেন, যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটা সফল বিপ্লব করতে সক্ষম হবেন। তাই তিনি মদীনা থেকে রওনা করেন। পক্ষান্তরে যে সকল সাহাবা তাঁকে বারণ করেন, তাঁদের ধারণা ছিল কূফাবাসীরা তাঁর পিতা হযরত আলী (রাঃ)

---

৫২. ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১১। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৮।
৫৩. এটা বুখারী (কিতাবুল মুহারেবীন, বাবু রাজমিল হুবলা মিনায যিনা) -এর বর্ণনার ভাষা।

অপর এক বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ শব্দও উক্ত হয়েছে-পরামর্শ ব্যতিরেকে যাকে এমারাত দেয়া হয়, তা গ্রহণ করা তার জন্য হালাল নয়।—ফতহুলবারী, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫। ইমাম আহমাদ হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ উক্তিও উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করে যে ব্যক্তি কোন আমীরের বায়আত করেছে, তার কোন বায়আত নেই। বায়আত নেই সেব্যক্তিরও যে তার হাতে বায়আত করেছে।—মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, হাদীস সংখ্যা—৩৯১।

১৫—

এবং ভ্রাতা হযরত হাসানের সাথে যেসব বে-ওফায়ী (বিশ্বাসঘাতকতা) করেছে, তাতে তাদের ওপর নির্ভর করা যায় না, তাই সে সকল সাহাবীদের সাথে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর মতবিরোধ বৈধ এবং অবৈধের ব্যাপারে ছিল না, বরং মতভেদ ছিল কৌশল অবলম্বনের ব্যাপারে।

তেমনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্যাতনমূলক শাসনামলে আবদুর রহমান ইবনে আশআস বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তৎকালীন সেরা ফকীহ—সাঈদ ইবনে জুবাইর, আশ-শা'বী ইবনে আবী লায়লা এবং আল-বুহতারী তাঁর পাশে দাঁড়ান। ইবনে কাসীরের বর্ণনা মতে আলেম-ফকীহদের এক বিরাট রেজিমেন্ট তাঁর সাথে ছিল। যেসব আলেম তাঁকে সমর্থন জানাননি, তাঁদের কেউই এ কথা বলেননি যে, এ বিদ্রোহ অবৈধ। এ উপলক্ষে ইবনে আশআস-এর বাহিনীর সম্মুখে এ সকল ফকীহরা যে ভাষণ দান করেছেন, তা তাঁর চিন্তাধারার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে। ইবনে আবি লায়লা বলেন ঃ

"ইমানদারগণ ! যে ব্যক্তি দেখে যে যুলুম-নির্যাতন চলছে, অন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানান হচ্ছে, সে যদি অন্তরে তাকে খারাপ জানে, তাহলে সে রেহাই পেয়েছে, মুক্তি লাভ করেছে। মুখে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে প্রতিদান লাভ করেছে এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি থেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লার কালেমা বুলন্দ করা এবং যালেমদের দাবী পদানত করার নিমিত্ত এ সব লোকের সাথে তরবারী দ্বারা বিরোধিতা করে সে লোকই সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে, বিশ্বাসের আলোয় অন্তরকে আলোকিত করে। সুতরাং, যারা হারামকে হালাল করেছে, উম্মাতের মধ্যে খারাপ পথ উন্মুক্ত করেছে, যারা সত্যচ্যুত, সত্যের পরিচয় যারা রাখে না, যারা অন্যায় মতে কাজ করে, অন্যায়কে যারা অন্যায় বলে স্বীকার করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

আশ-শা'বী বলেন ঃ

"ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা এ কথা মনে করো না যে, ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করা খারাপ কাজ। আল্লার কসম ! আমার জানা মতে আজ দুনিয়ার বুকে তাদের চেয়ে বড় কোন যালেম-অত্যাচারী এবং অন্যায় ফায়সালাকারী আর কেউ নেই। নেই এমন কোন দল। সুতরাং ওদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ যেন কোন প্রকার শৈথিল্য প্রশ্রয় না পায়।"

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন ঃ
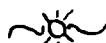
"ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো। কারণ, শাসন কার্যে তারা যালেম। দ্বীনের কার্যে তারা ঔধ্যত্বপরায়ণ। তারা দুর্বলকে হেয় প্রতিপন্ন করে। সালাতকে বরবাদ করে।"[৫৪]

পক্ষান্তরে যেসব বুযুর্গ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে লড়াই-এ ইবনে আশআস-এর সহযোগিতা করেনি, তারাও এ কথা বলেননি যে, এ লড়াই হারাম। বরং তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, এটা করা কৌশলের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ

---

৫৪. আত-তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৩।

'আল্লার শপথ ! আল্লাহ হাজ্জাজকে তোমাদের ওপর শুধু শুধু চাপিয়ে দেননি। বরং হাজ্জাজ একটি শাস্তি বিশেষ। সুতরাং তরবারী দ্বারা আল্লার এ শাস্তি মুকাবিলা করো না। বরং ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নিরবে তা সহ্য করে যাও। আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।'[৫৫]

এ ছিল হিজরী প্রথম শতকের দ্বীনদারদের অভিমত। এ শতকেই ইমাম আবু হনীফা (রঃ) চক্ষু উন্মীলিত করেন। তাই, তাঁর অভিমতও ছিল তাই, যা ছিল তাদের অভিমত। এরপর হিজরী দ্বিতীয় শতকে সে অভিমত প্রকাশ পেতে থাকে, অধুনা যাকে জমহুর আহলুস সুন্নাহর অভিমত বলা হয়। এ অভিমত প্রকাশের কারণ এই ছিল না যে, এর স্বপক্ষে এমন কিছু অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা প্রথম শতকের মনীষীদের নিকট উহ্য ছিল ; বা আল্লাহ না করুক, প্রথম শতকের মনীষীরা কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে মত গ্রহণ করেছিলেন। বরং মূলত এর দু'টি কারণ ছিল। এক ঃ শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনের কোন পথই উন্মুক্ত রাখেনি যালেমরা। দুই ঃ তরবারীর জোরে পরিবর্তনের যে সকল চেষ্টা হয়েছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তার এমন সব পরিণতি প্রকাশ পেতে থাকে, যা দেখে সে পথেও কল্যাণের কোন আশা অবশিষ্ট ছিল না।[৫৬]

৫৫. তাবাকাতে ইবনে সাআদ ৭ম খণ্ড, ১৬৪। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৯ম খণ্ড,—পৃষ্ঠা—১৩৫।

৫৬. এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩০০ থেকে ৩২০ এবং তাফহীমুল কুরআন সূরা হুজুরাতের তাফসীর, ১৭নং টীকা দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর জীবনে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং সরকারের সাথে তাঁর অসহযোগের ফলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য এবং হানাফী চিন্তাধারার সম্পর্ক একান্ত তিক্ত-সংঘাতমুখর হয়ে ওঠে। পরেও দীর্ঘদিন এ ধারা অব্যাহত ছিল। এক দিকে এ চিন্তাধারার সেরা পুরুষরা অসহযোগিতায় অটল থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর অন্যতম খ্যাতনামা শাগরেদ যুফার ইবনুল হোযায়েল (ইন্তেকাল ঃ ১৫৮ হিজরী—৭৭৫ খৃষ্টাব্দ)-কে কাযীর পদ গ্রহণে বাধ্য করা হলে তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে প্রাণ বাঁচাবার জন্য আত্মগোপন করেন।[১] অন্যদিকে আল-মনসুর থেকে শুরু করে হারুনুর রশীদের প্রাথমিক শাসনকাল পর্যন্ত এ চিন্তধারার প্রভাব রোধের দিকেই সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এ কারণে মনসুর এবং তাঁর উত্তরসুরীরা চেষ্টা করছিল যে, দেশে আইন অবস্থার শূন্যতা যে সংকলিত আইন দাবী করছে, অন্য কোন সংকলন দ্বারা তা পূরণ করা হোক। এ উদ্দেশ্যে আল-মুনসুর এবং আল-মাহদীও তাদের শাসনামলে ইমাম মালেক (রঃ)-কে সামনে আনার চেষ্টা করে।[২] হারুনুর রশীদও ১৭৪ হিজরী সালে (৭৯১ খৃষ্টাব্দে) ইমাম মালেক (রঃ)-এর আল-মুয়াত্তাকে দেশের আইন হিসাবে গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৩] কিন্তু পরে এ চিন্তাধারা থেকে এমন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়, যিনি আপন শ্রেষ্ঠতম, যোগ্যতা এবং বিরাট প্রভাব-প্রতাপ বলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের আইনগত শূন্যতার অবসান ঘটান। হানাফী ফিকাহকে দেশের আইনে পরিণত করেন, একটা আইনের ওপর দেশের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর সবচেয়ে বড় শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)।

জীবন কথা

তাঁর আসল নাম ছিল ইয়াকুব। আরবের বাজীলা কবীলায় তাঁর জন্ম। মদীনার আনসারদের সাথে মাতৃকুলের সম্পর্ক এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তাঁর বংশকে আনসারী বংশ বলা হতো। তিনি কূফার বাসিন্দা ছিলেন। ১১৩ হিজরী মুতাবিক ৭৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষার পর ফিকাহকেই তিনি বিশেষ শিক্ষার জন্য পসন্দ করেন এবং আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর দরসে শরীক হন এবং স্থায়ীভাবে তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত হন। তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত গরীব ছিলেন। তাঁরা তার পড়া-লেখা চালাতে চাইতেন না। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর অবস্থা জানতে পেরে কেবল তাঁরই নয়, বরং তাঁর গোটা পরিবারেরও ব্যয়ভারের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের উক্তি, "ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর কাছে কখনো আমার প্রয়োজনের কথা বলার দরকার হয়নি। সময়ে সময়ে তিনি নিজেই আমার গৃহে এ পরিমাণ টাকা পাঠাতেন, যার ফলে আমি সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হয়ে যাই।"[৪] প্রথম থেকেই তিনি এ

---

১. আল-কারদারী, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা—১৮৩। মেফতাহুস সাআদাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১১৪।

২ ইবনে আবদুল বার ঃ আল- ইন্তেকা, পৃঃ—৪০-৪১।

৩. আবু নুয়াইম আল-ইসফাহানী ঃ হুলাইয়াতুল আওলিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৩২। সাআদাত প্রেস, মিসর, ১৩৫৫ হিজরী। মেফতাহুস সাআদাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৭।

৪. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১২।

শাগরেদ সম্পর্কে একান্ত আশাবাদী ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)–এর পিতা তাঁকে মাদ্রাসা থেকে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলেন ঃ আবু ইসহাক ! ইনশাআল্লাহ ছেলেটি একদিন বড়লোক হবে।[৫]

জ্ঞানের রাজ্যে খ্যাতি

তিনি ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ছাড়া সে কালের অন্যান্য খ্যাতনামা শিক্ষকদের কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করেন। হাদীস, তাফসীর, মাগাযী, আরবের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য এবং কালাম শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষ করে হাদীসে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন হাফেযে হাদীস। ইয়াহইয়া ইবনে মুইন, আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং আলী ইবনুল মাদানীর মতো ব্যক্তিরা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করেছেন।[৬] তাঁর সম্পর্কে তাঁর সমকালীন মনীষীদের সর্বসম্মত অভিমত ছিল এই যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর শাগরেদদের মধ্যে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তালহা ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, তিনি তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় ফকীহ (ফিকাহ শাস্ত্রবেত্তা) ছিলেন। তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ আর কেউ ছিল না।[৭] দাউদ ইবনে রশীদের উক্তি ঃ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যদি এ একজন মাত্র শাগরেদও সৃষ্টি করতেন, তা হলে ইনিই তাঁর গৌরবের জন্যযথেষ্ট ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) স্বয়ং তাঁকে অনেক মর্যাদা দিতেন। তাঁর উক্তিঃআমার শাগরেদদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান লাভ করেছে, সে হচ্ছে আবু ইউসুফ।[৯] একবার তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবনের কোন আশাই আর রইলো না। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁকে দেখার জন্য বেরিয়েছেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ এ যদি মারা যায়, তাহলে দুনিয়ায় তাঁর চেয়ে বড় আর কোন ফকীহ অবশিষ্ট থাকবে না।[১০]

হানাফী ফিকাহ সংকলন

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর পরে তিনিও হানাফী চিন্তাধারার ঐতিহ্য অনুযায়ী দীর্ঘ ১৬ বৎছর যাবত রাষ্ট্র সরকার থেকে দূরে থাকেন। এ সময় তিনি তাঁর শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শিক্ষা দান কার্য চালু রাখেন। এর সাথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও তিনি আঞ্জাম দেন। তা এই যে, আইনের অধিকাংশ বিভাগ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। এ সকল গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–এর মজলিসের ফায়সালা এবং তাঁর নিজের উক্তি যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ করেন।[১১] এ সকল গ্রন্থ দেশে

---

৫. আল–মাক্কী, পৃষ্ঠা ২১৪।

৬. ইবনে খাল্লেকান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪২২। ইবনে আবদুল বার্ ঃ আল–ইন্তিকা, পৃষ্ঠা—১৭২।

৭. ইবনে খাল্লেকান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪২৪।

৮. আল মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩২।

৯. আল–কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৬।

১০. ইবনে খাল্লেকান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪২৪। আল–কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৬।

১১. ফিহরিস্তে ইবনে নাদীম, রহমানিয়া প্রেস, মিসর, ১৩৪৮ হিজরী। তালহা ইবনে মুহাম্মাদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে খাল্লেকান লিখেন যে, আবু ইউসুফ (রঃ) প্রথম ব্যক্তি, যিনি ফিকাহ শাস্ত্রের সকল মৌলিক বিভাগের ওপর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আবু হানীফা (রঃ)–এর জ্ঞানকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।—৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪২৪।

ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি কেবল সুধী সমাজকেই প্রভাবিত করেননি ; বরং হানাফী ফিকাহ্-এর অনুকূলে আদালত এবং সরকারী বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মতও গঠন করেন। কারণ, এভাবে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এমন কোন সুসংবদ্ধ সুসংহত আইন ভাণ্ডার তখন ছিল না। অবশ্য ইমাম মালেক (রঃ)-এর আল-মুয়াত্তা তৎক্ষণাৎ জনসমক্ষে উপস্থিত হলেও একটা রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূরণে তা ততটা সর্বব্যাপক ছিল না, ছিল না সংকেলনের বিচারে ততটা স্পষ্ট।[১২] আবু ইউসুফ (রঃ)-এর এহেন কাজের ফল এ হলো যে, তাঁর ক্ষমতায় আসার আগেই মানুষের মন-মগয এবং দৈনন্দিন কার্যে হানাফী ফিকাহ্ প্রভাব বিস্তার করে বসে। কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা তাকে দেশের যথারীতি আইনে পরিণত করাই অবশিষ্ট ছিল।

বিচারকের পদ

সম্ভবত আবু ইউসুফ (রঃ)-ও সারা জীবন আপন ওস্তাদের মতো সরকারের সাথে অসহযোগিতা করেই অতিবাহিত করতেন—যদি তাঁর আর্থিক অবস্থা কিছুটাও ভাল হতো। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর ওফাতের পর একজন দানশীল পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যান। দৈন্যের চাপে পড়ে একদা স্ত্রীর গৃহের একখানা কড়িকাঠ বিক্রি করতেও তিনি বাধ্য হন। এতে তাঁর শাশুড়ি তাঁকে এমন কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন, তাঁর আত্মমর্যাদা তা বরদাস্ত করতে পারেনি। এ কারণে তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এ ঘটনার পর হিজরী ১৬৬ সালে (৭৮২ খৃষ্টাব্দে) তিনি বাগদাদ গমন করে খলীফা মাহ্দীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মাহ্দী তাঁকে পূর্ব বাগদাদের বিচারপতি (কাযী) নিযুক্ত করেন। আল-হাদীর শাসনামলেও তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। হারুনুর রশীদের শাসনকাল পর্যন্ত ক্রমশ খলীফা তাঁকে গোটা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের কাযীউল কোযাত (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত করেন। মুসলিম রাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো এ পদের সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে খেলাফতে রাশেদা বা উমাইয়া-আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে কাউকে চীপ জাস্টিস করা হয়নি।[১৩] বর্তমান যুগের ধারণা অনুযায়ী এ পদটি নিছক উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ-ই ছিল না ; বরং আইন মন্ত্রীর দায়িত্ব এ পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কেবল মামলার রায় দান ও নিম্ন আদালতসমূহের বিচারপতি নিয়োগ পর্যন্তই তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিষয়ে আইনগত পথ-নির্দেশ দান করাও ছিল তার কাজ।

কাযী আবু ইউসুফ (রঃ)-এর প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফল দেখা দেয় ঃ

এক ঃ নিছক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে গ্রন্থ প্রণয়ন কার্যে নিয়োজিত থাকার তুলনায় আরও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন তিনি। সেখানে তিনি তৎকালের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের কাজ-কারবারের সাথে কার্যত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। এ

১২. প্রকাশ থাকে যে, মালেকী মাযহাব অনুসারে একটা রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত ফিকাহ শাস্ত্র সংকলণ পরবর্তীকালে ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর কিতাবের অনুকরণেই করা হয়েছে।

১৩. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২১১, ২৩৯। ইবনে খল্লেকান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪২১।

পরিস্থিতিতে হানাফী ফিকাহকে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে তাকে অধিকতর একটি বাস্তব আইন ব্যবস্থায় পরিণত করার সুযোগ ঘটে।

দুই ঃ সারা দেশে বিচারপতিদের নিয়োগ ও বদলির কাজ যেহেতু তাঁর হাতে ছিল ; ফলে হানাফী চিন্তাধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় বিচারকের পদে নিয়োজিত হয়। এবং তাঁর মাধ্যমে হানাফী ফিকাহ্ আপনা আপনি দেশের আইনে পরিণত হয়।

তিন ঃ উমাইয়াদের শাসনামল থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে এক ধরনের আইনের শূন্যতা এবং বাদশাহদের উচ্ছৃংখলতা বিরাজ করছিল, তিনি তাঁর বিরাট নৈতিক এবং পাণ্ডিত্য সুলভ প্রভাব দ্বারা তাকে আইনের অনুবর্তী করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যকে একটি আইন গ্রন্থও সংকেলিত করে উপহার দেন। সৌভাগ্য বশত এ গ্রন্থটি 'কিতাবুল খারাজ' নামে আজও আমাদের নিকট বর্তমান রয়েছে।

চরিত্রের দৃঢ়তা

তাঁর প্রণীত আইন-গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে একটা সাধারণ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন অপরিহার্য। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর জীবনী রচয়িতারা তাঁর সম্পর্কে এমন সব কল্প-কাহিনীর অবতারণা করেছে, যা পাঠ করে পাঠকের সামনে তাঁর জীবন-চিত্র অনেকটা এমনভাবে উদ্ভাসিত হয় যে, তিনি বাদশাহদের তোষামোদ করতেন, তাদের মনস্কামনা অনুযায়ী আইনের অপব্যাখ্যা করতেন। এটাই ছিল তাঁর বাদশাহদের নৈকট্য লাভের মাধ্যম। অথচ তোষামোদ দ্বারা যে ব্যক্তি বাদশাহদের নৈকট্য লাভ করে, তাদের মনোবাসনা অনুযায়ী শরীয়াতের ব্যাপারে কাট-ছাট করে, সে ব্যক্তি যতই সান্নিধ্য লাভ করুক না কেন, বাদশাহদের ওপর কখনো তার নৈতিক প্রভাব পড়তে পারে না—একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এ কথা উপলব্ধি করতে পারে। খলীফা তাঁদের মন্ত্রীবর্গ এবং সেনাপতিদের সাথে তাঁর আচরণের যেসব কাহিনী আমরা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে দেখতে পাই, তা পর্যালোচনা করলে একজন তোষামোদ প্রিয় এবং ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি কখনো এহেন আচরণের সাহস করতে পারে, তা বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে হয়।

খলীফা আল-হাদীর শাসনামলের কথা। তখন তিনি শুধু পূর্ব বাগদাদের বিচারপতি। এ সময় এক মামলায় তিনি স্বয়ং খলীফার বিরুদ্ধে রায় দান করেন।[১৪]

হারুনুর রশীদের শাসনামলে জনৈক বৃদ্ধ খৃষ্টান খলীফার বিরুদ্ধে একটি বাগানের দাবী উত্থাপন করে। কাযী আবু ইউসুফ (রঃ) খলীফার মুখোমুখী কেবল বৃদ্ধের আর্জীই শুনেননি, বরং এ দাবীর বিরুদ্ধে খলীফাকে শপথ নিতে বাধ্য করেন। এরপরও তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনুতাপ করেছিলেন যে, আমি তাকে কেন খলীফার বরাবর দাঁড় করাইনি।[১৫]

---

১৪. আল-কারদারী,২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৮।

১৫. আস-সারাখসী ঃ কিতাবুল মাবসুত, ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬১। আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা—২৪৩-২৪৪।

হারুনুর রশীদের উযীরে আযম আলী ইবনে ঈসার সাক্ষ্য তিনি অগ্রাহ্য করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আমি তাকে 'খলীফার গোলাম' বলতে শুনেছি। সত্যিই যদি সে গোলাম হয়ে থাকে, তাহলে তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। আর যদি খোশামোদী করে এমন উক্তি করে থাকে, তাহলেও তার সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।[১৬] এমন তোষামোদের জন্য এ রকম খোশামোদদেরকে এমন নৈতিক শাস্তি হারুনের সিপাহসালা (প্রধান সেনাপতি)কেও দিয়েছেন।[১৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, তিনি এমন মর্যাদার সাথে হারুনুর রশীদের দরবারে হাযির হতেন যে, সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে পর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন (যেখানে উযীরে আযমকেও পায়ে হেঁটে যেতে হতো)। খলীফা এগিয়ে এসে তাঁকে প্রথমে সালাম জানাতো।[১৮]

একদা হারুনকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ আপনি আবু ইউসুফ (রঃ)-কে এত বড় মর্যাদা কেন দিয়েছেন? জবাবে তিনি বলেনঃ জ্ঞানের যে ক্ষেত্রেই আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি, সবক্ষেত্রেই তাঁকে পূর্ণ পেয়েছি। উপরন্তু তিনি একজন সত্যাশ্রয়ী এবং কঠোর চরিত্রের লোক তাঁর মতো অপর কোন ব্যক্তি থাকলে নিয়ে এসো দেখি।[১৯]

১৮২ হিজরী তথা ৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর ইন্তেকাল হলে হারুনুর রশীদ নিজে পায়ে হেঁটে তাঁর জানাযার অনুগমন করেন। নিজে তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করেন এবং বলেনঃ এটা এমন এক শোকাবহ ঘটনা যে, গোটা মুসলিম জাহানের সকলে একে অপরকে সমবেদনা জানানো উচিত।[২০]

তাঁর 'কিতাবুল খারাজ' আমাদের নিকট সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কোন তোষামুদে ব্যক্তি বাদশাহকে যে কোন সম্বোধন করে এ সব কথা লিখতে পারেন—এ গ্রন্থের ভূমিকা পড়ে যে কোন ব্যক্তি এ কথা উপলব্ধি করতে পারে।

কিতাবুল খারাজ

কাযী আবু ইউসুফ (রঃ) হারুনুর রশীদের সত্ত্বায় এমন এক খলীফা লাভ করেছিলেন, যিনি ছিলেন পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে কড়া মেজাযের সৈনিক, আরাম প্রিয় বাদশা এবং একজন আল্লাভীরু দ্বীনদার। আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী এক কথায় তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ করেন—ওয়ায-নসীহতের ক্ষেত্রে তিনি সকলের চেয়ে বেশী কাঁদেন, আর

---

১৬. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২২৬-২২৭।
১৭. আল-মাক্কী, পৃষ্ঠা—২৪০।
১৮. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৪০। মোল্লা আলী ক্বারী ঃ যায়লুল জাওয়াহেরিল মুযিয়্যাহ, পৃষ্ঠা—৫২৬।
১৯. আল-মাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩২।
২০. আল-কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২০।

ক্রোধকালে সবচেয়ে বেশী অত্যাচারী ছিলেন তিনি।[২১] ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) একান্ত প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শীতা বলে তার দুর্বল দিকগুলোকে উত্যক্ত না করেই তার প্রকৃতির দ্বীনী দিকসমূহকে আপন জ্ঞান এবং নৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন তিনি নিজেই রাষ্ট্রের জন্য একটি আইন গ্রন্থ প্রণয়নের অনুরোধ জানান। যে গ্রন্থের আলোকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র-শাসন কার্য পরিচালনা করা যায়। 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থ রচনার এটাই ছিল কারণ। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন ঃ

'আমীরুল মু'মিনীনের ইচ্ছা—আল্লাহ তায়ালা তাঁর সহায় হোন—আমি তাঁর জন্য এমন একটি সর্বাত্মক গ্রন্থ প্রণয়ন করি, যে গ্রন্থ অনুযায়ী কর, ওশর, ছদকা এবং জিযিয়া উসুল ও অন্যান্য ব্যাপারে আমল করা যায়, যেসব বিষয়ে দায়িত্ব পালনের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত।........তিনি কোন কোন ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করেছেন। তিনি এ সব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব চান, যাতে ভবিষ্যতে তদনুযায়ী কাজ করতে পারেন।'

উক্ত গ্রন্থের স্থানে স্থানে তিনি হারুনুর রশীদ প্রেরিত প্রশ্নমালায় যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা দৃষ্টে মনে হয় যে, সেক্রেটারীয়েটের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক, আইনগত, প্রশাসনিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির আলোকে এ প্রশ্নমালা প্রণীত হয়েছিল, যাতে আইন বিভাগ থেকে এ সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব পেয়ে রাষ্ট্রের একটা স্বতন্ত্র নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। গ্রন্থের নাম থেকে বাহ্যত ধোঁকা হয়ে থাকে যে, নিছক রাজস্বই (Revenue) এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু আসলে এতে রাষ্ট্রের প্রায় সকল বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

এখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে কেবল এ দৃষ্টিকোণ থেকেই-এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে দেখাবো যে, এতে রাষ্ট্রের কি মৌল দর্শন এবং ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

খেলাফতে রাশেদার দিকে প্রত্যাবর্তন

গোটা গ্রন্থটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে যে বিষয়টি মানুষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে এই যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) খলীফাকে বনী-উমাইয়া ও বনী-আব্বাসীয়দের কাইজার-কেসরা সুলভ ঐতিহ্য থেকে সরিয়ে সর্বতভাবে খিলাফতে রাশেদার ঐতিহ্যের অনুসরণের দিকে নিয়ে যেতে চান। অবশ্য তিনি গ্রন্থের কোথাও পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ত্যাগ করতে বলেননি, কিন্তু বনী-উমাইয়া তো দূরের কথা, গ্রন্থের কোথাও তিনি স্বয়ং হারুনুর রশীদের পূর্বপুরুষদের কোন কর্মধারা এবং ফায়সালাকে নযীর হিসেবে পেশ করেননি ভুলেও। প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি হয় কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, অথবা আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী (রাঃ)-এর শাসনামলের নযীর পেশ করেছেন। পরবর্তী কালের খলীফাদের কারো কর্মধারাকে নযীর হিসেবে পেশ করে থাকলে তিনি আল-মনসুর, আল-মাহদী নন, বরং তিনি হচ্ছেন বনী-উমাইয়্যাদের খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয। এর স্পষ্ট তাৎপর্য এই যে, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের এ আইন গ্রন্থ

২১. কিতাবুল আগানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭৮।

প্রণয়নকালে তিনি ওমর ইবনে আবদুল আযীযের আড়াই বছরকে বাদ দিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর ওফাত থেকে শুরু করে হারুনুর রশীদের শাসনামল পর্যন্ত প্রায় ১৩২ বছরের শাসনকালের গোটা ঐতিহ্য এবং কার্যধারাকে এড়িয়ে যান। কোন সত্যভাষী ফিকাহ্ শাস্ত্রবেত্তা নিছক ওয়ায-নসীহত হিসেবে একান্ত বেসরকারীভাবে এ কাজটি করলে তার বিশেষ কোন গুরুত্ব হতো না। কিন্তু একজন প্রধান বিচারপতি এবং আইন মন্ত্রী সম্পূর্ণ সরকারীভাবে তদানীন্তন খলীফার ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ কাজ করেছেন, তা দেখে এর গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়ে যায়।

এক ঃ রাষ্ট্র-সরকারের ধারণা

গ্রন্থের শুরুতেই খলীফার সামনে তিনি রাষ্ট্র-সরকারের যে ধারণা পেশ করেন, তাঁর নিজের ভাষায় তা এই ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন। আল্লাহ্ তাআ'লা—যিনি সকল প্রশংসা-স্তুতির অধিকারী—আপনার ওপর এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার ন্যস্ত করেছেন। এ কাজের সওয়াব সবচেয়ে বড় এবং শাস্তি সবচেয়ে কঠোর। তিনি উম্মাতের নেতৃত্ব আপনার ওপর সোপর্দ করেছেন। আর আপনি প্রতিনিয়ত এক বিশাল জনতার নির্মাণ কাজে নিয়োজিত। তিনি আপনাকে জনগণের রক্ষক করেছেন। তাদের নেতৃত্ব আপনাকে দান করেছেন। তাদের দ্বারা আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। তাদের কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লার ভয় বাদ দিয়ে অন্য কিছুর ওপর যে প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপিত, তা খুব বেশীদিন স্থায়ী হয় না। আল্লাহ্ তাকে সমূলে উৎপাটিত করে নির্মাতা এবং নির্মাণ কার্যে তার সহযোগিতা দানকারীর ওপর নিক্ষেপ করেন।............দুনিয়ায় রাখাল যেমন মেষ পালের আসল মালিকের সামনে হিসেব দেয়, রক্ষককে আপন প্রভুর সামনে ঠিক তেমনি হিসেব দিতে হবে।...........বাঁকা পথে চলবেন না, তাহলে আপনার মেষ-পালও বাকা পথে চলতে শুরু করবে।..........সকল ব্যক্তিকে—আপনার নিকট-দূর যাই হোক না কেন—আল্লার বিধানে সমান রাখবেন।.............কাল যেন আপনাকে আল্লার সামনে অত্যাচারী হিসেবে হাযির হতে না হয়। কারণ, শেষ দিবসের বিচারক কার্যধারার ভিত্তিতে মানুষের বিচার করবেন—পদ-মর্যাদার ভিত্তিতে নয়।..........মেষ পালের ক্ষতি সাধনে ভয় করুন। মেষ পালের মালিক আপনার নিকট থেকে পুরো প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।"[২২]

এরপর গোটা গ্রন্থের স্থানে স্থানে তিনি হারুনুর রশীদকে এ অনুভূতি দিয়েছেন যে, তিনি দেশের মালিক নন, বরং আসল মালিকের খলীফা মাত্র।[২৩] তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হলে সুফল দেখতে পাবেন আর অত্যাচারী শাসক হলে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হবেন।[২৪] এক স্থানে তিনি তাকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্তি শুনিয়েছেন ঃ আল্লার অবাধ্যতায় তার আনুগত্য করতে হবে—কোন অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিরই দুনিয়ায় এ মর্যাদা নেই।[২৫]

---

২২. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—৩, ৪, ৫। সালফিয়া প্রেস, মিসর, ২য় সংস্করণ ১৩৫২ হিজরী।
২৩. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—৫।
২৪. আল-খারাজ, পষ্ঠা—৮।
২৫. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১১৭।

দুই ঃ গণতন্ত্রের প্রাণ-শক্তি

কেবল স্রষ্টার সম্মুখেই নয়, বরং সৃষ্টির সম্মুখেও খলীফার জবাবদিহির ধারণা পেশ করেন তিনি। এ জন্য তিনি স্থানে স্থানে হাদীস এবং সাহাবীদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ সকল হাদীস এবং সাহাবীদের উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাসকবর্গের সামনে স্বাধীনভাবে সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে মুসলমানদের। আর এ সমালোচনার স্বাধীনতার মধ্যেই সরকার এবং জনগণের কল্যাণ নিহিত।[২৬]

ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ মুসলমানদের অধিকার এবং কর্তব্য উভয়ই। এর দ্বার রুদ্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে জনগণ শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাসী ধ্বংসে নিমজ্জিত হবে।[২৭] সত্য কথা শোনার মতো ধৈর্য শাসক শ্রেণীর থাকা উচিত। তাদের কটুভাষী এবং অসহিষ্ণু, হওয়ার চেয়ে ক্ষতিকর কিছু নেই। শরীয়াতের দৃষ্টিতে শাসক শ্রেণীর ওপর প্রজাদের যে অধিকার অর্পিত হয়, জনগণের সম্পদের যে আমানত তাদের ওপর ন্যস্ত, এ ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে হিসেব নেয়ার এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে।[২৯]

তিন ঃ খলীফার দায়িত্ব-কর্তব্য

খলীফার যেসব দায়িত্ব-কর্তব্য তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তা এই ঃ আল্লার সীমা-রেখা প্রতিষ্ঠা, সঠিক অনুসন্ধান করে হকদারদেরকে তাদের অধিকার দান।

সৎ-ন্যায়পরায়ণ শাসকদের কার্যধারা (অতীতের যালেম শাসকরা যা ত্যাগ করেছে) পুনরুজ্জীবিত করণ।[৩০]

অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ এবং অনুসন্ধান করে জনগণের অভিযোগ বিদূরীত করণ।[৩১]

আল্লার বিধান অনুযায়ী জনগণকে আনুগত্যের নির্দেশ দান এবং পাপাচার থেকে বারণ।

আপন পর সকলের ওপর সমভাবে আল্লার বিধান কার্যকরী করণ। কার ওপর এর আঘাত পড়ে, এ ব্যাপারে তার পরওয়া না করা।[৩২]

বৈধ-সঙ্গতভাবে জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় এবং বৈধ খাতে তা ব্যয় করা।[৩৩]

চার ঃ মুসলিম নাগরিকদের কর্তব্য

অপরদিকে সরকারের ব্যাপারে তিনি মুসলমানদের যে কর্তব্যের উল্লেখ করেছেন, তা এই ঃ

তারা সরকারের আনুগত্য করবে, নাফরমানী করবে না।

তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না।

---

২৬. আল-খারাজ, পষ্ঠা—১২।
২৭. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১০-১১।
২৮. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১২।
২৯. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১১৭।
৩০. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—৫।
৩১. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—৬।
৩২. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১৩।
৩৩. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১০৮।

তাদেরকে গালমন্দ দেবে না।
তাদের কঠোরতায় ধৈর্য ধারণ করবে।
তাদেরকে প্রতারিত করবে না।
আন্তরিকভাবে তাদের কল্যাণ কামনা করার চেষ্টা করবে।
মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করবে।
ভাল কাজে তাদের সহযোগিতা করবে।[৩৪]

পাঁচ ঃ বায়তুল মাল

বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার)-কে তিনি বাদশাহের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে স্রষ্টা এবং জনগণের আমানত বলে অভিহিত করেন। বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি খলীফাকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্তি স্মরণ করিয়ে দেন। এ সকল উক্তিতে খলীফা ওমর (রাঃ) বলেছেন ; খলীফার জন্য রাষ্ট্রীয় ধন-ভাণ্ডার, যেমন ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষকের জন্য ইয়াতীমের সম্পদের অনুরূপ। সে যদি বিত্তবান হয়, তাহলে কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী এতীমের সম্পদ থেকে তার কিছুই খরচ করা উচিত নয়। বরং আল্লার পথে তার সম্পদ দেখাশুনা করা উচিত। আর যদি সে অভাবী হয়, তাহলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অতটুকু সেবার বিনিময়ে সে গ্রহণ করতে পারে, যতটুকু গ্রহণ করাকে সকল ব্যক্তি বৈধ বলে মনে করেন।[৩৫]

তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ কার্যধারাকেও খলীফার সামনে নমুনা স্বরূপ তুলে ধরেন। কোন ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে ব্যয় করার ব্যাপারে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে, বায়তুলমাল থেকে ব্যয়ের ব্যাপারে খলীফা ওমর (রাঃ) তার চেয়েও বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করেন। ঘটনাটি এই যে, খলীফা ওমর (রাঃ) কুফার কাযী, আমীর এবং অর্থমন্ত্রী নিয়োগ কালে এদের সকলের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য দৈনিক একটি বকরী দানের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে দেন যে, যে দেশ থেকে অফিসারদেরকে দৈনিক একটি বকরী দেয়া হয়, সে দেশ অনতিবিলম্বে ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩৬]

তিনি খলীফাকে এ নির্দেশও দান করেন যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা থেকে শাসকদেরকে বারণ করতে হবে।[৩৭]

ছয় ঃ কর ধার্যের নীতি

কর আরোপের ব্যাপারে তিনি যেসব মূলনীতির উল্লেখ করেন, তা এই ঃ
কেবল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের ওপরই কর ধার্য করা হবে।
সম্মতিক্রমে তাদের ওপর বোঝা চাপাবে।

---

৩৪. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—৯, ১২।
৩৫. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—৩৬, ১১৭।
৩৬. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—৩৬।
৩৭. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১৮৬।

কারো ওপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না।
বিত্তবানদের কাছ থেকে উসুল করে বিত্তহীনদের জন্য তা ব্যয় করতে হবে।[৩৮]

রাজস্ব নির্ধারণ এবং তার নিরূপণে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যে, সরকার যেন জনগণের রক্ত চুষে না নেয়।

কর আদায়ের ব্যাপারে যেন অন্যায় পন্থা অবলম্বন না করা হয়।[৩৯]

আইনানুগ উপায়ে আরোপিত কর ব্যতীত সরকার যেন অন্য কোন অবৈধ কর আদায় না করে, ভূমির মালিক এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও যাতে এ ধরনের কোন কর আদায় না করতে পারে, সে দিকেও সরকারকে কড়া নযর রাখতে হবে।[৪০]

যেসব যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে, তাদের নিকট থেকে যেন জিযিয়া আদায় না করা হয়।[৪১]

এ প্রসঙ্গে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারাকে নযীর হিসেবে তুলে ধরেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত আলী (রাঃ)–এর এ ঘটনা ঃ গভর্ণরদের হেদায়াত দান কালে জনসমক্ষে তিনি বলতেন, তাদের কাছ থেকে পুরোপুরি ব্যয়ভার আদায় করতে, বিন্দুমাত্র অবহেলা করবে না। কিন্তু তাদেরকে একান্তে ডেকে বলতেন ঃ সাবধান ! কাউকে মারপিট করে বা রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে রাজস্ব আদায় করবে না। তাদের সাথে এমন কঠোরতা করবে না, যাতে সরকারের দায়–দায়িত্ব শোধ করতে গিয়ে জামা-কাপড়, বাসন–কোসন বা গবাদি পশু বিক্রি করতে তারা বাধ্য হয়।[৪২] হযরত ওমর (রাঃ)–এর এ নিয়মের কথাও তিনি উল্লেখ করেন যে, বন্দোবস্ত দানকারী কর্মকর্তাদেরকে জেরা করে তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন যে, কৃষকদের ওপর কর আরোপে হাড় ভাঙ্গার কারণ ঘটাননি। কোন অঞ্চলের উসূলকৃত সম্পদ আসার পর গণ–প্রতিনিধিদের ডেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন যে, কোন মুসলমান বা যিম্মী কৃষকের ওপর অত্যাচার করে এসব উসুল করা হয়নি।[৪৩]

সাত ঃ অমুসলিম প্রজার অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে ৩টি মূলনীতি বারবার এ গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ

---

৩৮. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১৪।
৩৯. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১৬, ৩৭, ১০৯, ১১৪।
৪০. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১০, ১৩২।
৪১. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১২২, ১৩১।
৪২. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১৫, ১৬।
৪৩. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—৩৭, ১১৪।

এক ঃ তাদের সাথে যে অঙ্গীকারই করা হোক না কেন, তা পূরণ করতে হবে।

দুই ঃ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তাদের নয়, বরং মুসলমানদের।

তিন ঃ সাধ্যের চাইতে তাদের ওপর জিযিয়া এবং আয়করের বোঝা আরোপ করা যাবে না।[৪৪]

অতঃপর তিনি লিখেন যে, মিসকিন, অন্ধ, বৃদ্ধ, ধর্মযাজক, উপসানালয়ের কর্মচারী, স্ত্রী এবং শিশুদেরকে জিযিয়া কর থেকে রেহাই দিতে হবে। এদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। যিম্মীদের সম্পত্তি এবং পশুপালের ওপর কোন যাকাত ধার্য করা যাবে না। যিম্মীদের নিকট থেকে জিযিয়া উসুল করার ব্যাপারে মারপিট এবং দৈহিক নির্যাতন জায়েয নেই। জিযিয়া দানে অস্বীকৃতির শাস্তি হিসেবে বড় জোর শুধু আটক করা যেতে পারে। নির্ধারিত জিযিয়ার অতিরিক্ত কিছু তাদের কাছ থেকে আদায় করা হারাম। অচল–অক্ষম এবং অভাবী যিম্মীদের লালন–পালন সরকারী ভাণ্ডার থেকে করা উচিত।[৪৫]

ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি হারুনুর রশীদকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, যিম্মীদের সাথে উদার এবং ভদ্রোচিত আচরণ করা স্বয়ং রাষ্ট্রের জন্যই কল্যাণকর। এ ধরনের ব্যবহারের ফলে হযরত ওমর (রাঃ)–এর শাসনামলে সিরিয়ার খৃষ্টানরা স্বধর্মী রোমকদের মুকাবিলায় মুসলমানদের কৃতজ্ঞ এবং কল্যাণকামী হয়ে যায়।[৪৬]

আট ঃ ভূমি বন্দোবস্ত

ভূমি বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) সে ধরনের জমিদারীকে হারাম প্রতিপন্ন করেন, যাতে কৃষকদের নিকট থেকে কর আদায়ের জন্য সরকার এক ব্যক্তিকে তাদের ওপর ভূস্বামী হিসেবে বসিয়ে দেয় এবং তাকে কার্যত এ ক্ষমতা দান করে যে, সরকারের কর পরিশোধের পর কৃষকদের নিকট থেকে যতো খুশী উসুল করা যাবে। তিনি বলেন, এটা প্রজাদের প্রতি জঘন্য অত্যাচার এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ। এহেন পন্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের জন্য কখনো উচিত নয়।[৪৭]

অনুরূপ সরকার কোন ভূমি দখল করে তা কাউকে জায়গীর হিসেবে দান করাকেও তিনি হারাম প্রতিপন্ন করেন। তিনি লিখেছেন ঃ "কোন আইনানুগ বা সুবিহিত অধিকার ব্যতিরেকে কোন মুসলিম বা যিম্মীর অধিকার থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়ার কোন অধিকারই নেই ইমাম বা রাষ্ট্র–নেতার।" আপন খুশীমতে জনগণের মালিকানা ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্য কাউকে দেয়া, তাঁর মতে ডাকাতি করে আদায়কৃত অর্থ অপরকে দান করার সমার্থক।[৪৮]

---

৪৪. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১৪, ৩৭, ১২৫।

৪৫. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১২২—১২৬।

৪৬. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১২৯।

৪৭. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—১০৫।

৪৮. আল–খারাজ, পৃষ্ঠা—৫৮, ৬০, ৬৬।

তিনি বলেন, ভূমি প্রদানের কেবল একটি মাত্র পন্থাই আইন সিদ্ধ। তা হচ্ছে এই যে, অনাবাদী বা মালিকানা বিহীন ভূমি বা লাওয়ারিস পরিত্যক্ত ভূমি চাষাবাদের উদ্দেশ্যে, বা সত্যিকার সমাজ-সেবার জন্য পুরস্কার হিসেবে যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে দান। যে ব্যক্তিকে এ ধরনের দান হিসেবে দেয়া হবে, সে যদি তিন বছর যাবৎ তা অনাবাদী ফেলে রাখে তা হলে তাও তার নিকট থেকে ফেরত নিতে হবে।[৪৯]

নয় ঃ অত্যাচার-অনাচারের মূলোৎপাটন

অতঃপর তিনি হারুনুর রশীদের উদ্দেশ্যে বলেন, অত্যাচারী—খেয়ানতকারী লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত করা, তাদেরকে মহকুমা প্রশাসক বা আঞ্চলিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা আপনার জন্য হারাম। এমতাবস্থায় তারা যেসব অত্যাচার চালাবে, তার পরিণতি আপনাকে বহন করতে হবে।[৫০]

তিনি বারবার বলেন, সৎ, আল্লাভীরু, এবং আমানতদার ব্যক্তিদেরকে আপনি রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োজিত করুন। সরকারী কাজের জন্য যাদেরকে বাছাই করা হবে, যোগ্যতার সাথে সাথে তাদের চরিত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। এরপরও তাদের পিছনে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা নিয়োগ করুন। যাতে তারা বিকৃত হয়ে অত্যাচার-অনাচার শুরু করলে খলীফা যথাসময়ে সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং চুলচেরা হিসেব নিতে সক্ষম হন।[৫১]

তিনি হারুনকে আরও বলেন যে, খলীফাকে সরাসরি জনগণের অভিযোগ শোনাতে হবে। তিনি যদি মাসে একবারও গণসমাবেশের ব্যবস্থা করেন, যেখানে প্রতিটি নির্যাতিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে নিজের অভিযোগ পেশ করতে পারে, আর সরকারী কর্মকর্তারা জানতে পারে যে, তাদের কর্মকাণ্ডের খবর সরাসরি খলীফার কাছে পৌঁছায়, তবেই অত্যাচার-অনাচারের মূলোৎপাটন হবে।[৫২]

দশ ঃ বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইনসাফ-সুবিচার এবং কেবল পক্ষপাতমুক্ত ইনসাফ বা সুবিচারই হচ্ছে বিচার বিভাগের দায়িত্ব। শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি না দেয়া, আর শাস্তির অযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া—উভয়ই হারাম। সন্দেহ-সংশয়ের ব্যাপারে শাস্তি না দেয়া উচিত। ভুল করে শাস্তি দানের চেয়ে ভুল করে ক্ষমা করা শ্রেয়। ইনসাফের ব্যাপারে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ এবং সুপারিশের দরজা বন্ধ করা উচিত। কোন ব্যক্তির পদ-মর্যাদা বা পজিশনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করা যাবে না।[৫৩]

---

৪৯. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—৫৯-৬৬।
৫০. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১১১।
৫১. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১০৬, ১০৭, ১১১, ১৩২, ১৮৮।
৫২. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১১১, ২১২।
৫৩. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১৫২, ১৫৩।

এগার ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ

তিনি এ-ও বলেন যে, নিছক অপবাদের ভিত্তিতে কাউকে আটক করা যাবে না। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হ'লে যথারীতি মামলা দায়ের করা উচিত। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেয়া হবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে আটক করা হবে, অন্যথায় ছেড়ে দেয়া হবে। তিনি খলীফাকে পরামর্শ দেন, কারাগারে যেসব লোক আটক রয়েছে, তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো উচিত। কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত যাদেরকে আটক করা হয়েছে, তাদেরকে মুক্তি দেয়া উচিত। নিছক অভিযোগ এবং অপবাদের ভিত্তিতে মামলা দায়ের না করে ভবিষ্যতে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না এ মর্মে সকল গভর্ণরকে নির্দেশ পাঠাতে হবে।[৫৪]

তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে নিছক অপবাদের ভিত্তিতে মারপিট করা আইন বিরুদ্ধ। আদালতের কাছ থেকে দণ্ডযোগ্য বলে প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শরীয়াতের দৃষ্টিতে প্রতিটি নাগরিকের পৃষ্ঠদেশ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।[৫৫]

বার ঃ কারাগারের সংস্কার

কারাগার সম্পর্কে তিনি সংস্কারের যে পরামর্শ দান করেন, তাতে তিনি বলেন,আটককৃত ব্যক্তি সরকারী ভাণ্ডার থেকে আহার্য এবং পরিধেয় বস্ত্র পাওয়ার যোগ্য। এটা তার অধিকার। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনামলের প্রচলিত পন্থার কঠোর নিন্দা করে তিনি বলেন, তাদের শাসনামলে কয়েদীদেরকে হাতে-পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কয়েদখানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তারা ভিক্ষা করে নিজেদের জন্য আহার্য এবং পরিধেয় সংগ্রহ করতো। তিনি খলীফাকে বলেন, এ প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে শীত-গ্রীষ্মের বস্ত্র এবং পেটপুরে খাবার দেয়া অপরিহার্য।

তিনি কঠোর নিন্দা করে বলেন, লা-ওয়ারেসি কয়েদী মারা গেলে গোসল, কাফন এবং সালাতের জানাযা ছাড়াই তাদেরকে পুঁতে ফেলা হতো। তিনি বলেন, মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের কয়েদীদের দাফন-কাফন এবং সালাতে জানাযার ব্যবস্থা করা উচিত।

তিনি এ সুপারিশও করেন যে, হত্যার অপরাধে আটক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন কয়েদীকে কারাগারে বেঁধে রাখা যাবে না।[৫৬]

তাঁর কাজের সঠিক মূল্যায়ণ
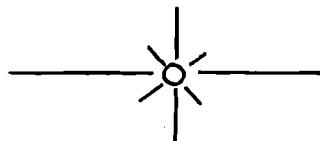
আজ থেকে ১২ শত বছর পূর্বে একজন যথেচ্ছাচারী নৃপতির সামনে তাঁর আইনমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি হিসেবে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) যেসব আইনগত সুপারিশ করেছেন, ওপরে তার সংক্ষিপ্তসার পেশ করা হলো। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল নীতি, খেলাফতে রাশেদার কর্মনীতি এবং জুলুম

---

৫৪. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১৭৫, ১৭৬।

৫৫. আল-খারাজ, পৃষ্ঠা—১৫১।

৫৬. আল-খরাজ, পৃষ্ঠা–১৫১।

তাঁর ওস্তাদ ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর শিক্ষার সাথে তুলনা করে দেখলে তাঁর এ সকল সুপারিশকে অনেকটা ন্যূনতম বলেই প্রতীয়মান হবে। এতে নির্বাচন ভিত্তিক খেলাফতের ধারণার বিন্দুমাত্র লক্ষণও উপস্থিত পাওয়া যায় না। শুরা বা পরামর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার কোন উল্লেখ এতে নেই। যালেম-অত্যাচারী শাসকের শাসনকার্য চালাবার কোন অধিকার নেই, অত্যাচারী শাসকের স্থলে উন্নততর শাসক নিয়োগের চেষ্টা করার ক্ষমতা জনগণের রয়েছে—এমন ধারণাও তাঁর পরামর্শে অনুপস্থিত। এমনি করে আরও অনেক দিক থেকেই তাঁর এ সকল প্রস্তাব সত্যিকার ইসলামী দর্শনের তুলনায় অনেক অসম্পূর্ণ। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, কিতাবুল খারাজ-এ উল্লেখিত প্রস্তাবাবলি পর্যন্তই ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর রাষ্ট্র দর্শনের ব্যাপকতা সীমাবদ্ধ ছিল। এ গ্রন্থে তিনি যা উল্লেখ করেছেন, মূলত তার চেয়ে বেশী কিছু তিনি কামনা করতেন না—এমন ধারণাও ঠিক নয়। বরং সে কালে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের নিকট একজন বাস্তববাদী দার্শনিক যা আশা করতে পারে, মূলতঃ এটা তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু ছিল। সেকালের বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটা নিছক কাল্পনিক চিত্র অংকনই—নিছক ধারণা-কল্পনা পর্যন্তই যা সীমাবদ্ধ, যার বাস্তবায়নের কোন সম্ভাবনাই নেই—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তিনি এমন একটি আইনানুগ স্কীম তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে নিহিত থাকবে ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যূনতম প্রাণ শক্তি, সাথে সাথে তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাকে কার্যে রূপায়িতও করা যাবে।

পরিশিষ্ট

সমালোচনার জবাবে——

[এ গ্রন্থের কোন কোন অধ্যায় 'তারজামানুল কুরআন-এ প্রকাশিত হলে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন কোন বন্ধু তাঁদের পত্রে এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কঠোর সমালোচনা করেন। আর কোন কোন বন্ধু এর বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। আমি এ সব কিছু বিশেষ মনোযোগের সাথে দেখেছি। এ সব আপত্তির যা লক্ষণীয়, এখানে তার সামগ্রিক জবাব সন্নিবিষ্ট করা হচ্ছে।]

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব

এ আলোচনায় যেসব ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করা হয়েছে, তা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজি থেকে সংগৃহীত। যতোসব ঘটনা আমি উল্লেখ করেছি, তার পূর্ণ উদ্ধৃতিও নির্দেশ করেছি। উদ্ধৃতি ছাড়া কোন একটি কথাও লিপিবদ্ধ করিনি। বিজ্ঞ পাঠকরা নিজে মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এ সব ইতিহাস কোথাও গোপনে সংরক্ষিত ছিল না, যা হঠাৎ বের করে আমি জনসমক্ষে উপস্থিত করেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ সব দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিল এবং প্রকাশনা-প্রচারণার আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছে। এবং কাফের-মু'মিন, দোস্ত-দুশমন সকলেই তা পাঠ করেছেন। কেবল আরবী ভাষা-ভাষীদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রাচ্যবিদরা পাশ্চাত্যের সকল ভাষায় এবং আমাদের নিজেদের ভাষায় অনুবাদক-সংকলকরা তা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন। এখন আমরা তা গোপন করতে পারি না ; জনগণকে এ কথাও বলতে পারি না যে, তোমরা ইসলামের ইতিহাসের এ অধ্যায়টি পাঠ করো না। আল্লার সৃষ্টিকূলকে এ নিয়ে কথা বলা থেকে বারণও করতে পারি না। বিশুদ্ধ উদ্ধৃতি এবং যুক্তিনির্ভর, প্রমাণসিদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে আমরা নিজেরা এ ইতিহাস বর্ণনা না করলে এবং তা থেকে সত্যিকার ফলাফল আহরণ করে সুবিন্যস্তভাবে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন না করলে পাশ্চাত্যের মনীষী এবং অসামঞ্জস্যশীল মন-মানসের অধিকারী মুসলিম লেখকরা—যারা ইসলামের ইতিহাসকে অত্যন্ত বিকৃতরূপে উপস্থাপন করে আসছেন এবং এখনও করছেন—মুসলমানদের নয়া বংশধরদের মনমগযে কেবল ইসলামের ইতিহাসের নয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থারও বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করবে। বর্তমান পাকিস্তানে সকল স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইসলামের ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের দর্শন অধ্যয়ন করছে। কিছুদিন আগে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় ঃ রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কুরআন কি মূলনীতি বিবৃত করেছে রাসূলুল্লার শাসনাকালে কিভাবে সে সকল নীতি বাস্তবায়িত করা হয়েছে, খেলাফত কি, কেন এবং কিভাবে খেলাফত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে? পাশ্চাত্যের লেখকরা এসব প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন, সমালোচক বন্ধুরা কি চান যে, মুসলমান ছাত্ররাও সে সব জবাবই দিক? অথবা অপর্যাপ্ত অধ্যয়নের ফলে স্বয়ং নিজেরাই উল্টা-সিধা অভিমত ব্যক্ত করুক? অথবা তাদের দ্বারা প্রতারিত হোক, যারা ইতিহাসকেই নয়, বরং খেলাফত দর্শনকেই বিকৃত করছে? আমরা কেন সাহসিকতার সাথে আমাদের ইতিহাসের এ সব ঘটনার মুকাবিলা করবো না? নিরপেক্ষভাবে তা পর্যালোচনা করে

সুষ্ঠু ভাবে কেন এ কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করবো না যে, খেলাফত মূলত কি, কি তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, রাজতন্ত্রের সাথে তার নীতিগত পার্থক্য কি, আমাদের মধ্যে খেলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের উত্তরণ কেন এবং কিভাবে হয়েছে, খেলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের সামাজিক জীবনে কার্যতঃ কি পার্থক্য সূচীত হয়েছে, এ পার্থক্যের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য, বা তা হ্রাস করার জন্য উম্মাতের স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? আমারা যতক্ষণ এ সকল প্রশ্নের স্পষ্ট, প্রমাণসিদ্ধ এবং সুসংগঠিত জবাব না দেবো, ততক্ষণ মন-মানসের অস্থিরতা দূর হবে না।

আজ যাঁহারাই রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ইসলামের রাষ্ট্র দর্শন অধ্যয়ন করে, তাদের সামনে একদিকে সে রাষ্ট্রনীতি ফুটে ওঠে,যা রাসূলুল্লাহ(সঃ)ও খোলাফ য়ে রাশেদীনের শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল, অপরদিকে পরবর্তী কালের রাজতন্ত্রের স্বরূপও তাদের সামনে প্রতিভাত হয়। তা উভয়ের মধ্যকার নীতি,আদর্শ,উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা এবং প্রাণশক্তি ও মন-মানসের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুধাবন করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা দেখতে পান যে, মুসলমানরা দু'টি শাসন ব্যবস্থারই সমান আনুগত্য করেছে, উভয় ব্যবস্থার অধীনেই জেহাদ অব্যাহত ছিল, কাযী শরীয়াতের বিধান জারী করেছেন, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিভাগই স্ব-স্ব ধারায় অব্যাহত ছিল। এ থেকে প্রতিটি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রের মনে স্বতই এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র দর্শন কি? এ দু'টোই কি যুগপৎ এবং সমভাবে ইসলামী নীতির না ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দু'টোর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? পার্থক্য থাকলে মুসলমানরা এ দু'টোর অধীনে বাহ্যত একই ধরনের যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে তার ব্যাখ্যা কি? আমি বুঝি না, মন-মানসকে এ সকল প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা থেকে কি করে নিবৃত্ত করা যায়? আর কেনই বা এ সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে না?

ইসলামের ইতিহাসের পাঠকের সামনে ঘটনা পরম্পরার এ চিত্র পরিস্ফুট হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য নিয়ে খেলাফতে রাশেদা হিজরী ৩৩—৩৪ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। অতঃপর তার পতন শুরু হয়। অবশেষে হিজরী ৬০ সাল পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সে সকল বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটে এবং তার স্থলে পার্থিব শাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য উজ্জল হয়ে দেখা দেয়। জোরপূর্বক বায়আ'ত, বংশানুক্রমিক রাজত্ব, কাইজার-কিসরার অনুরূপ জীবনধারা, শাসক-শাসিতের মধ্যে ব্যবধান, বায়তুল মালের ব্যাপারে দায়িত্বানুভূতির বিলুপ্তি, শরীয়াত অনুসরণ থেকে রাজনীতির মুক্তি লাভ, আমর বিল মা'রুফ নাহ্ই আনিল মুনকার—ন্যায়ের নির্দেশ এবং অন্যায় থেকে নিবৃত্তি—এর আযাদী থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত হওয়া, শুরা ব্যবস্থার অবসান, এক কথায় যেসব বিষয় পার্থিব রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র করে, হিজরী ৬০ সালের পর হতে তার সবকিছুই একটি স্বতন্ত্র ব্যাধি হিসেবে মুসলমানদের পেয়ে বসেছিল বলে দেখা যায়। এ বিরাট এবং স্পষ্ট পরিবর্তন সম্পর্কে এখন আমরা কি বলবো? অথবা আমরা কি বলবো যে, সে যুগের ইতিহাস তো বর্তমান রয়েছে, কিন্তু সে ইতিহাসের যেসব ঘটনা এ পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করে, তা নির্ভরযোগ্য নয়। যদিও সে সকল ঐতিহাসিকদের বর্নণা তৎপূর্ববর্তী এবং তৎপরবর্তী যুগের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য? অথবা আমরা কি বলবো যে,সে সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করে নেয়া উচিত ও এ সকল বিষয় চিন্তা-ভাবনা এবং আলোচনা-পর্যলোচনা কিছুই করা যাবে না। কারণ, এ ২৬—২৭ বছরে যে সকল পরিস্থিতি এ

সকল পরিণতির জন্য দায়ী, কোন কোন সাহাবীর ওপর তার দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অবশেষে এ সবের কোন্ কথাটি আমরা বিশুদ্ধতা এবং যৌক্তিকতার সাথে বলতে পারি, যা ইতিহাসের একজন সাধারণ পাঠককে আশ্বস্ত নিশ্চিন্ত করতে পারে?

সন্দেহ নেই, হাদীসের ব্যাপারে যেসব যাঁচাই-বাছাই, সনদ বর্ণনা এবং গবেষণা করা হয়েছে, ইতিহাসের ব্যাপারে তা হয়নি। কিন্তু, ইবনে সাআদ, ইবনে আবদুল বার, ইবনে জারীর, ইবনে হাজার, ইবনে কাসীর এবং ইবনে আসীরের মতো ঐতিহাসিকরা বিরোধকালের অবস্থা বর্ণনায় এতটুকু শৈথিল্য এবং অসাবধানতা অবলম্বন করেছেন যে, সাহাবীদের সম্পর্কে তাঁদের গ্রন্থে একেবারেই ভিত্তিহীন কথা লিপিবদ্ধ করেছেন—এমন কথা বলাও তো কঠিন। এ সকল বিষয় বর্ণনাকালে তারা কি এ ব্যাপারে একেবারেই বেখবর ছিলেন যে কোন্ সব বুযুর্গ সম্পর্কে আমরা এ সকল কথা বলছি?

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُم عَدُولٌ-এর সঠিক তাৎপর্য

আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের আলোচনা দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, তাঁদের প্রতি মুসলমানদের যে আস্থা থাকা উচিত, তা ব্যাহত হয়, এ ব্যাপারেও কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন মনে করি।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমার বিশ্বাস তাই, যা সাধারণ মুহাদ্দেসীন, ফোকাহা এবং উম্মাতের আলেম সমাজের আকীদা ঃ كلهم عدول। স্পষ্ট যে, আমাদের নিকট দ্বীন পৌঁছার মাধ্যম তাঁরাই। তাদের ন্যায়পরায়ণতার বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দিলে দ্বীনই সংশয়যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু الصحابة كلهم عدول। –সাহাবীরা সকলেই সত্যাশ্রয়ী ছিলেন–আমার মতে এর অর্থ এ নয় যে, সকল সাহাবীই দোষ-ক্রটি মুক্ত ছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন মানবীয় দুর্বলতার উর্ধে ; তাদের কেউ কখনো কোন ভুল করেননি। বরং আমার মতে এর অর্থ হচ্ছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করা বা তাঁর প্রতি কোন বিষয়ের উল্লেখে কোন সাহাবী কখনো সততা ন্যায়পরায়ণতা লংঘন করেননি। প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হলে কেবল ইতিহাসই নয়, হাদীসের নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাও তার সমর্থন করবে না। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ সিদ্ধ ; কোন ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। এমনকি, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পারস্পরিক যুদ্ধ–যখন তাঁদের মধ্যে ব্যাপক রক্তপাত ঘটে–তখনও কোন পক্ষ নিজের উদ্দেশ্যে কোন হাদীস গড়ে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বলে চালিয়ে দেয়নি, স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় বলে কোন নির্ভুল হাদীসকে অস্বীকার করেনি। তাই সাহাবায়ে কেরামের বিরোধের বিষয় আলোচনাকালে এ মানসিক বিভ্রান্তি দেখা দেয়া উচিত নয় যে, কাউকে ন্যায়ের পক্ষে এবং কাউকে অন্যায়ের পক্ষে বলে স্বীকার করে নিলে তাতে দ্বীন ক্ষুণ্ন হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনার ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহে সকল সাহাবীকেই বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য দেখতে পাই, সকলের বর্ণনাকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করি।

সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর আদালতের যদি এ অর্থ করা হয় যে, সকল সাহাবীই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিপূর্ণ ওফাদার ছিলেন, তাদের সকলেরই অনুভূতি ছিল যে, হুযুরের সুন্নাহ এবং

হেদায়াত উম্মাতের নিকট পৌঁছাবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত : এ জন্য তাদের কেউই ভুল কোন বিষয় আরোপ করেননি। তাহলে الصحابة كلهم عدول-এর এ ব্যাখ্যা তাদের সকলের ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি এর ব্যাখ্যা করা হয় যে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল সাহাবী তাঁদের জীবনের সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আদালত— ন্যায়পরায়ণতার— গুণে বিভূষিত ছিলেন, তাদের কারো থেকে কখনো আদালতের পরিপন্থী কোন কাজ সম্পন্ন হয়নি, তাহলে এ ব্যাখ্যা তাদের সকলের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় না। সন্দেহ নেই যে, তাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য 'আদালতের' সর্বোচ্চ আসনে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, তাদের খুব কম সংখ্যক এমনও ছিলেন যাদের কোন কোন কাজ 'আদালতের' পরিপন্থী ছিল। তাই الصحابة كلهم عدول-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকে নীতি হিসেবে উল্লেখ করা যায় না। কিন্তু এর মূলনীতি না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হাদীসের বর্ণনার ব্যাপারে তাদের কেউই নির্ভরযোগ্য নন। কারণ, এর প্রথম ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে মূলনীতির মর্যাদা পায় এবং কখনো এর বিরুদ্ধে কিছুই পাওয়া যায়নি।

এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় কোন ব্যক্তি দ্বারা 'আদালত' পরিপন্থী কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার ফল কি এই হতে পারে যে, আদালতের বৈশিষ্ট্য তার থেকে সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে, আমরা আদপেই তার 'আদেল' হওয়াকে অস্বীকার করবো, হাদীস বর্ণনায় সে কি অবিশ্বাস্য প্রতিপন্ন হবে? আমার জবাব এই ঃ কোন ব্যক্তি আদালতের পরিপন্থী দু একটি বা কয়েকটি কাজ করে বসলে তার আদালত সর্বতোভাবে তিরোহিত হয় না, হয় না সে আদেল-এর স্থলে ফাসেক প্রতিপন্ন, যদি তার জীবনে সামগ্রিকভাবে আদালত পাওয়া যায়। হযরত মায়েয আসলামী দ্বারা ব্যভিচারের মতো মারাত্মক পাপ সংঘটিত হয়। এটা নিঃসন্দেহে আদালতের পরিপন্থী কাজ ছিল। কিন্তু তিনি কথায় এবং কাজে তাওবা করেছিলেন নিজেকে শাস্তির জন্য পেশ করেছেন, তাঁর ওপর ব্যভিচারের দণ্ড আরোপ করা হয়েছে। আদালতের পরিপন্থী একটা কাজ করায় তাঁর আদালত তিরোহিত হয়ে যায়নি। তাই মুহাদ্দেসীনরা তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে মাফ করেছেন, তখন এ সব ঘটনা উল্লেখ করা উচিত নয়—এ উদাহরণ থেকে এ কথার জবাবও পাওয়া যায়। হযরত মায়েয-এর ক্ষমায় কোন সন্দেহ করা যায় না। তিনি এমন এক তাওবা করেছেন, যা দুনিয়ায় কেউ খুব কমই করে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং তাঁর ক্ষমার কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু, তাঁর দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছিল—এ বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা কি নিষিদ্ধ? নিছক পেশা হিসেবে এ সব ঘটনা উল্লেখ করা নিঃসন্দেহে খুব খারাপ। কিন্তু, যেখানে সত্যিসত্যি এ ধরনের ঘটনা বর্ণনা করার প্রয়োজন দাঁড়ায়, সেখানে ঘটনার বর্ণনা হিসেবে তা উল্লেখ করতে ইতিপূর্বেও জ্ঞানীরা নিবৃত্ত থাকেননি, এখনও নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দেয়া যায় না। অবশ্য এ সকল ঘটনা বর্ণনা কালে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে কেবল ঘটনার বর্ণনা পর্যন্ত বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে, সামগ্রিকভাবে যাতে কোন সাহাবীর অবজ্ঞা না করা হয়। আমি আমার সাধ্য পরিমাণ এ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। যদি কোথাও এর চেয়ে বেশী কিছু পাওয়া যায়, তবে আমাকে অবহিত করা হলে ইনশাআল্লাহ আমি তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করে নেবো।

কোন কোন বন্ধু এ ব্যাপারে বিরল মূলনীতি পেশ করেন যে, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আমরা কেবল সে সব বর্ণনা গ্রহণ করবো, যা তাঁদের মর্যাদার অনুকূল ; তাঁদের মর্যাদায় আঁচড় লাগে, এমন যে কোন বিষয়কে আমরা প্রত্যাখ্যান করবো।—কোন বিশুদ্ধ হাদীসে তার উল্লেখ থাকলেও আমরা তা গ্রহণ করবো না। কিন্তু আমি জানিনা, মুহাদ্দেসীন, মুফাসসেরীন এবং ফকীহদের কে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, কোন ফকীহ মুহাদ্দেস বা মুফাসসের কখনো এ নীতি মেনে চলেছেন, তাও আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ)–'ঈলা' এবং 'তাখয়ীর'–এর ঘটনা কি হাদীস, তাফসীর এবং ফিকাহ–এর গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি? অথচ এ থেকে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের বিরুদ্ধে এলযাম আরোপিত হয় যে, তাঁরা ভরণ পোষণের জন্য হুযুরকে উত্যক্ত করেছিলেন। ইফ্‌ক এর ঘটনায় কোন কোন সাহাবী (রাঃ)–এর লিপ্ত হওয়া এবং তাদের ওপর অপবাদের দণ্ড আরোপের ঘটনা কি সে সব গ্রন্থে উক্ত হয়নি? অথচ এ অপরাধ যে কতো মারাত্মক তা স্পষ্ট। মায়েয আসলামী এবং গামেদিয়ার ঘটনাবলী কি সে সব গ্রন্থে উক্ত হয়নি? অথচ সাহাবী হওয়ার মর্যাদা তো তাঁরাও লাভ করেছেন এবং এতে মনগড়া রীতি অনুযায়ী মুহাদ্দেসীনকে সে সব বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করতে হয়, যাতে কোন সাহাবী পুরুষ বা স্ত্রীর দ্বারা ব্যভিচারের মতো জঘন্য কার্য সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এটা যদি কোন স্বীকৃত বিধান হয়ে থাকে, তাহলে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদে সাক্ষী তলব করে এ বিধান লংঘন করেছিলেন। কারণ এ বিধান অনুযায়ী এক জন সাহাবী এ ধরনের কাজ করতে পারেন, তা কল্পনা করাও আদৌ গ্রাহ্য নয়, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য তলব করা তো দূরের কথা। এমন কি,যেসব বন্ধুরা আজ এ মূলনীতি পেশ করেছেন, তারা নিজেরাও তা পুরোপুরি মেনে চলেন না। সত্যি তারা এ মূলনীতি স্বীকার করলে বলতেন জামাল–সিফ্‌ফীন যুদ্ধ আদৌ সংঘটিতই হয়নি। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করবেন, তাঁদের হাতে ঈমানদারদের রক্ত প্রবাহিত হবে—এ থেকে তাঁদের মর্যাদা উর্ধে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ভুল–ভ্রান্তি দ্বারা বুযুর্গী ব্যাহত হয় না

আসল কথা এই যে, সাহাবাসহ কোন অ–নবী মানুষ মাসুম বা নিষ্পাপ নয় ; কেবল নবী–রাসূলরাই নিষ্পাপ নিষ্কলুষ। এটা শুধু তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য। অ–নবীদের মধ্যে কোন মানুষ এ অর্থে বুযুর্গ হতে পারে না যে, তার দ্বারা ভুল করা অসম্ভব, বা তিনি কখনো কার্যত ভুল করেননি। বরং তাঁরা বুযুর্গ এ অর্থে যে, জ্ঞান এবং কর্মের দিক থেকে তাদের জীবনে কল্যাণ–মঙ্গল প্রবল। অতঃপর যার মধ্যে ভাল যতটুকু প্রবল, তিনি ততবড়ো বুযুর্গ। তাঁর কোন কাজ ভুল বলে বুযুর্গীতে কোন পার্থক্য দেখা দেয় না।

এ ব্যাপারে আমার এবং অন্যান্যদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, যার ফলে আমার পজিশন উপলব্ধি করার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। লোকেরা মনে করেন যে, যিনি বুযুর্গ তিনি ভুল করেন না, আর যিনি ভুল করেন, তিনি বুযুর্গ হতে পারেন না। এ মতবাদের ভিত্তিতে তাঁরা চান, কোন বুযুর্গের কোন কাজকে ভুল আখ্যায়িত না করা হোক। উপরন্তু তারা এ–ও মনে করেন যে, যারা তাঁদের কোন কাজকে ভুল বলেন, তারা তাঁকে বুযুর্গ বলে স্বীকার করেন না। আমার নীতি এর বিপরীত। আমার মতে একজন অ–নবী বুযুর্গের কোন কাজ

ভুল হতে পারে এবং তা সত্ত্বেও তিনি বুযুর্গ থাকতে পারেন। কোন বুযুর্গের কোন কাজকে আমি তখন ভুল বলি, যখন তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয় এবং কোন যুক্তি সিদ্ধ দলীল দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা চলে না। কিন্তু এ শর্তের সাথে আমি যখন জানতে পারি যে, কোন কাজ ভুল তখন আমি তাকে ভুল বলে স্বীকার করি। অতঃপর সে কাজ পর্যন্তই আমার সমালোচনা সীমিত রাখি। সে ভুলের কারণে আমার দৃষ্টিতে সে বুযুর্গের বুযুর্গীতে ও তার মর্যাদায় কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমি যাদেরকে বুযুর্গ মনে করি, তাদের প্রকাশ্য ভ্রান্তি অস্বীকার করা, প্রলেপ দিয়ে তা ঢেকে রাখা বা অযৌক্তিক ব্যাখ্যা করে তাকে সঠিক প্রমাণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করিনি কখনো। ভুলকে শুদ্ধ বলার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এ দাঁড়াবে যে, আমাদের মানদণ্ড বিগড়ে যাবে এবং বিভিন্ন বুযুর্গরা স্ব- স্ব স্থানে যেসব ভুল করেছেন, তা সব এক সাথে আমাদের মধ্যে সমবেত হবে। প্রলেপ দেয়া বা প্রকাশ্য দৃষ্টিগোচর হয় এমন কাজের ওপর আচ্ছাদন টেনে দেয়ার ফলে কাজের চেয়ে অকাজ বেশী হয়। এতে লোকেরা সংশয়ে পড়বে যে, আমারা আমাদের বুযুর্গের যেসব মাহাত্ম্য বর্ণনা করি, সম্ভবত তাও বানোয়াট।

সাহাবা (রাঃ)-দের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধান

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে হাদীস এবং জীবন চরিত পাঠে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তাঁরা সাহাবীর মর্যাদায় সমান ছিলেন ; কিন্তু জ্ঞান-মাহাত্ম্য, মহানবীর নিকট থেকে ফয়েয হাসিল এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে মর্যাদার ব্যবধান ছিল। যে পরিবেশে নবুয়াতের আলো বিকশিত হয়েছিল, তা অবশ্য মানুষের সমাজ ছিল ; সে সমাজের সকল মানুষ আলোর মশাল থেকে আলো গ্রহণ করতে পারেনি, সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা পায়নি। তাছাড়া প্রত্যেকের প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র, মন-মানস ছিল ভিন্ন, সকলের যোগ্যতা-প্রতিভা সমান ছিল না। তাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী হুযুরের শিক্ষা ও সান্নিধ্যের প্রভাব কম-বেশী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকতে পারেন এবং ছিলেনও, আত্মশুদ্ধির এ উত্তম দীক্ষার পরও যাদের মধ্যে কোন না কোন দিক থেকে দুর্বলতা রয়ে যায়। এটা এমন এক বাস্তবতা, যা অস্বীকার করা যায় না, আর তা অস্বীকার করা সাহাবায়ে কেরামের আদবের কোন অনিবার্য দাবীও নয় যে, তাকে অস্বীকার করতে হবে।

বুযুর্গদের কাজের সমালোচনার সঠিক পন্থা

সাধারণতঃ সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে এবং বিশেষত সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আমার কর্মধারা এই যে, কোন যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা বা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনার সাহায্যে যতক্ষণ তাদের কোন কথা এবং কাজের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব, তাকেই গ্রহণ করতে হবে ; তাকে ভুল বলে আখ্যায়িত করার ঔদ্ধত্য ততক্ষণ পরিত্যাগ করতে হবে, যতক্ষণ তা ছাড়া উপায় না থাকে। কিন্তু অপর দিকে, আমার মতে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যার সীমালংঘন করে এবং প্রলেপ দিয়ে ভুলকে গোপন করা বা অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করার চেষ্টা কেবল ইনসাফ এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চারই পরিপন্থী নয়, বরং আমি তাকে ক্ষতিকরও মনে করি, কারণ এ ধরনের দুর্বল ওকালতি কাউকে আশ্বস্ত করতে পারে না আর এর ফল দাঁড়ায় এই যে, সাহাবা এবং অন্যান্য বুযুর্গদের সত্যিকার গুণাবলীর ব্যাপারে আমরা যা কিছু বলি তাও সংশয়ের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। এ কারণে যেখানে দিবালোকের মতো স্পষ্ট আলোকে একটি

জিনিসকে ভুল বা অন্যায় বলে দেখা যাচ্ছে, সেখানে কথা কাটাকাটি না করে আমার মতে সরাসরি এটা বলে দেয়াই ভাল যে, অমুক বুযুর্গের অমুক কথা বা কাজ ভুল। মহা মানবদেরও ভুল হয়, তাতে তাদের মহত্ব খাটো হয় না, সূচিত হয় না কোন পার্থক্য। কারণ, তাদের মহান কীর্তির ওপরই তাদের মর্যাদা নির্ণীত হয়, দু একটি ভুলের ওপর নয়।

উৎস সম্পর্কে

"খেলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য"-এর শেষাংশ এবং "খেলাফত থেকে রাজতন্ত্র পর্যন্ত" গোটা আলোচনায় যে সকল গ্রন্থ থেকে আমি উপকরণ সংগ্রহ করেছি, কোন কোন বন্ধু সেসব গ্রন্থ সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মূলতঃ এ সকল উপকরণ দু ধরনের। এক ধরনের উপকরণ থেকে আমি প্রাসঙ্গিক কোন ঘটনা গ্রহণ করেছি, যেমন ঃ ইবনে আবিল হাদীদ, ইবনে কোতায়বা এবং আল-মাসউদী। আর দ্বিতীয় ধরনের উপকরণের ওপর আমার আলোচনা অনেকাংশে নির্ভরশীল, যেমন ঃ মুহাম্মাদ ইবনে সা'আদ, ইবনে আবদুল বার, ইবনুল আসীর, ইবনে জরীর, তাবারী এবং ইবনে কাসীর।

ইবনে আবিল হাদীদ

প্রথম ধরনের উৎসের মধ্যে ইবনে আবিল হাদীদের শীআ হওয়াটা স্পষ্ট। কিন্তু তা থেকে আমি শুধু এ ঘটনাটি গ্রহণ করেছি যে, সাইয়্যেদেনা আলী (রাঃ) তাঁর ভাই আকীল ইবনে আবুতালিবকেও অধিকারের চেয়ে বেশী কিছু দিতে অস্বীকার করেন । এমনিতেই এটা সত্য ঘটনা, অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও বলেন যে, এ কারণে অকীল ভাইকে ত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে যোগ দেন। উদাহরণস্বরূপ এসাবা এবং আল-ইস্তীআব-এ হযরত আকীলের বর্ণনা দ্রষ্টব্য। এ কারণে ইবনে আবিল হাদীদ শীআ বলেই এ সত্য ঘটনা অস্বীকার করা যায় না।

ইবনে কোতায়বা

ইবনে কোতায়বা শীআ ছিল—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি ছিলেন আবু হাতেম আস-সিজিস্তানী এবং ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্-এর মতো ইমামদের শাগরেদ এবং দিনাওয়ার-এর কাযী। ইবনে কাসীর তাঁর সম্পর্কে লিখেন ঃ كان ثقة نبيلا তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য এবং মর্যাদা ও যোগ্যতার অধিকারী। হাফেয ইবনে হাজার বলেন ঃ صدوق তিনি ছিলেন অতি সত্যবাদী। খতীব বাগদাদী বলেন ঃ كان ثقة دينا فاضلا তিনি নির্ভরযোগ্য, দ্বীনদার এবং মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মাসলামা ইবনে কাসেম বলেন ঃ

كَانَ صَدُوقًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يُقَالُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَقْوَالِ
إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ -

—"তিনি ছিলেন একান্ত সত্যভাষী। আহলুস সুন্নার পর্যায়ভুক্ত। বলা হয়ে থাকে, তিনি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইর অনুসারী ছিলেন।" ইবনে হাযম্ বলেন ثقة في دينه وعلمه : "দ্বীন এবং জ্ঞানের ব্যাপারে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন।" ইবনে হাজার তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

قَالَ السِّلَفِيُّ كَانَ ابْنُ قُتَيْبَةَ مِنَ الثِّقَاتِ - وَاَهْلِ السُّنَّةِ وَلٰكِنِ الْحَاكِمُ كَانَ يُبْغِضُهُ مِنْ اَجْلِ الْمَذْهَبِ ... ... وَالَّذِيْ يَظْهَرُ لِيْ اَنْ مُرَادَ السِّلَفِيِّ بِالْمَذْهَبِ النَّصْبُ - فَاِنَّ فِي ابْنِ قُتَيْبَةَ اِنْحِرَافًا عَنْ اَهْلِ الْبَيْتِ وَالْحَاكِمُ عَلٰى ضِدٍّ مِنْ ذٰلِكَ -

—"আস-সালাফী বলেন ঃ ইবনে কোতায়বা ছিলেন নির্ভরযোগ্য এবং সুন্নার অধিকারী। কিন্তু ধর্মমতের কারণে হাকেম তাঁর বিরোধী ছিলেন। ....আমার মনে হয়, ধর্মমত দ্বারা সালাফীর উদ্দেশ্য নাসিবিয়্যাত। কারণ, ইবনে কোতায়বার মধ্যে আহলে বায়তের প্রতি অনীহা ছিল। আর হাকেম ছিলেন তার বিপরীত।"১ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শীআ' হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর বিরুদ্ধে তো নাসেবী হওয়ার অভিযোগ ছিল।

বাকী থাকে তদীয় গ্রন্থ 'আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা'—নেতৃত্ব ও রাজনীতি। এ গ্রন্থটি তাঁর নয়—নিশ্চয়তার সাথে এমন কথা কেউই বলেনি। কেবল সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। কারণ, এতে কোন কোন বর্ণনা এমন পাওয়া যায়, ইবনে কোতায়বার বিজ্ঞতা এবং অন্যান্য গ্রন্থের সাথে যার কোন তুলনা পরিদৃষ্ট হয় না। আমি আদ্যোপান্ত গ্রন্থটি পাঠ করেছি, এর কতিপয় বর্ণনাকে আমিও অন্যের সংযোজন বলে মনে করি। কিন্তু সে জন্য গোটা গ্রন্থটি প্রত্যাখ্যান করা আমার মতে বাড়াবাড়ি। এতে অনেক কাজের কথা আছে। এবং সে সবের মধ্যে এমন কোন লক্ষণ নেই, যার জন্য তা অগ্রাহ্য হবে। উপরন্তু এ গ্রন্থ থেকে আমি এমন কোন বর্ণনা গ্রহণ করিনি, অর্থের দিক থেকে যার সমর্থক বর্ণনা অন্যান্য গ্রন্থে নেই। আমার দেয়া উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট।

আল-মাসউদী

সন্দেহ নেই, আল-মাসউদী শীআ' ছিলেন। কিন্তু তিনি চরমপন্থী ছিলেন, এমন কথা বলা ঠিক নয়। তিনি 'মুরুজুয্ যাহাব'-এ হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তা পড়ে দেখুন। কোন চরমপন্থী শীআ' এদের সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করতে পারে না। তা

১. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৮, ৫৭। লিসানুল মীযান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫৭-৩৫৯।

হলেও শীআদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। কিন্তু আমি তাঁর এমন কোন কথা উল্লেখও করিনি, যার সমর্থনে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ঘটনাবলী উদ্ধৃতি পেশ করিনি।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করছি। আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু এ পর্যায়ের ওপর নির্ভরশীল।

ইবনে সাআ'দ

এ সবের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে সাআ'দ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আমি তাঁর বর্ণনাকে অন্যান্য বর্ণনার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। তাঁর বর্ণনার পরিপন্থী কোন বর্ণনা অপর কোন গ্রন্থ থেকে গ্রহণ না করারও যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। এর কারণ এই যে, তিনি খেলাফতে রাশেদার নিকটতর যুগের লেখক। হিজরী ১৬৮ সালে তাঁর জন্ম আর ২৩০ সালে ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অতি বিস্তৃত। সিয়ার-মাগাযীর ব্যাপারে তাঁর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দীসীন-মুফাস্সিরীন সকলেই ছিলেন আস্থাবান। আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে শীআ বলে সন্দেহও প্রকাশ করেননি। খতীব বাগদাদী বলেন ঃ

محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته -

—"আমার মতে মুহাম্মাদ ইবনে সাআ'দ ছিলেন ন্যায়পরায়ণদের অন্যতম। তাঁর হাদীসই এ কথার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কারণ, আপন অধিকাংশ বর্ণনায় তিনি যাচাই-বাছাই করেছেন।" হাফেয ইবনে হাজার বলেন ঃ

أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين

—"তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং সংযত হাফেযে হাদীসের অন্যতম।" ইবনে খাল্লেকান বলেন كان صدوقا ثقة "তিনি সত্যভাষী এবং নির্ভরযোগ্য।" হাফেয সাখাবী বলেন ঃ

ثقة مع أن أستاذه (أي الواقدي) ضعيف

—"তাঁর ওস্তাদ (ওয়াকেদী) দুর্বল ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য। ইবনে তাগরী বেরদী বলেন ঃ

وثقه جميع الحفاظ ما عدا يحيى بن معين

—"ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন ব্যতীত সমস্ত হাফেযে হাদীসই তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করেন।"

—তাঁর ওস্তাদ ওয়াকেদীকে হাদীস সম্পর্কে যঈফ বলা হলেও সিয়ার–মাগাযীর ব্যাপারে সকল হাদীসবেত্তা তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইবনে সাআ'দের অন্যান্য শিক্ষক যথা হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েব আল–কালবী এবং মা'শারের অবস্থাও তাই। অর্থাৎ

إنهم جميعا موثقون في السيرة والمغازي

—"সিয়ার–মাগাযীর ব্যাপারে তাঁরা সকলেই তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করেন।" উপরন্তু ইবনে সাআ'দ সম্পর্কে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই এ কথা স্বীকার করেন যে, তিনি ভাল–মন্দ বিচার–বিশ্লেষণ না করে শিক্ষকদের নিকট থেকে নির্বিচারে সবকিছু উল্লেখ করেননি, বরং অনেক যাচাই–বাছাই করে তিনি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইবনে জারীর তাবারী

দ্বিতীয় হচ্ছে ইবনে জারীর তাবারী। মুহাদ্দেস–মুফাসসির ফকীহ এবং ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর মহান মর্যাদা স্বীকৃত। এলম ও তাকওয়া—জ্ঞান এবং আল্লাভীতি হিসেবে তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চে। তাঁকে কাযীর পদ দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অপরাধ দমন বিভাগের কর্তৃত্ব পেশ করা হলে তিনি তা–ও অস্বীকার করেন। ইমাম ইবনে খোযায়মা তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير -

—"বর্তমান বিশ্বে তাঁর চেয়ে বড় কোন আলেম (জ্ঞানী) আছে বলে আমার জানা নেই। ইবনে কাসীর বলেন ঃ

كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله -

—"কিতাব–সুন্নার জ্ঞান এবং তদনুযায়ী আমলের বিচারে তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম ইমাম।" ইবনে হাজার বলেন ঃ

من كبار أئمة الإسلام المعتمدين -

—"তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম বড় নির্ভরযোগ্য ইমাম।" খতীব বাগদাদী বলেন ঃ

احد ائمة العلماء يحكم بقوله ويرجع الى رأيه لمعرفته وفضله وقد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه احد من اهل عصره -

—"তিনি ছিলেন আলেম সমাজের ইমাম। তাঁর উক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তাঁর মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। কারণ, জ্ঞান এবং মর্যাদার বিচারে তিনি ছিলেন এর যোগ্য ব্যক্তি। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অধিকার এত ব্যাপক ছিল যে, তাঁর সমকালীন অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না।" ইবনুল আসীর বলেন ঃ

ابو جعفر اوثق من نقل التاريخ

—"ঐতিহাসিকদের মধ্যে আবু জাফর ছিলেন সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য।" হাদীসে তাঁকে মুহাদ্দিস বলে স্বীকার করা হয়। ফিক্‌হে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র মুজতাহিদ। আর তাঁর মাযহাব আহ্‌লে সুন্নার মাযহাবের মধ্যে শুমার হতো। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এমন কে আছে, যে তাঁর ওপর নির্ভর করেনি? বিশেষ করে বিপর্যের কালের ইতিহাসের ব্যাপারে তো বিশেষজ্ঞরা তাঁর মতামতের ওপরই সবযেয়ে বেশী নির্ভর করেন। ইবনুল আসীর তাঁর 'তারিখুল কামেল' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের বিরোধের ব্যাপারে অন্যান্য ঐতিহাসিকের তুলনায় তাঁর ওপরই আমি সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছি। কারণ ঃ

هو الامام المتقن حقا - الجامع علما وصحة اعتقاد وصدقا -

—"সত্যিই তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম। জ্ঞান বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা এবং সত্যাশ্রয়ীতায় তিনি ছিলেন, সর্বব্যাপী।" সমকালীন ইতিহাসের ব্যাপারে ইবনে কাসীরও তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। তিনি লিখেন ঃ শিআদের বর্ণনা থেকে দূরে সরে আমি ইবনে জারীরের ওপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছি। কারণ,

فانه من ائمة هذا الشان -

—"তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে যোগ্য ইমামদের অন্যতম।" ইবনে খালদুনও জামাল যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বাদ দিয়ে তাবারীর ইতিহাস থেকেই ঘটনাবলীর এ সংক্ষিপ্তসার আমি বের করেছি। কারণ, তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। ইবনে কোতায়বা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়, ইবনে জারীর তা থেকে মুক্ত ছিল। ইবনে খালদুনের ভাষায় ঃ

اعتمدناه للوثوق به ولسلامته من الاهواء

الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من المورخين -

—"কোন কোন ফিকহী মাসআলা এবং 'গাদীরে খোম' এর হাদীসের ব্যাপারে শীআ চিন্তা ধারার সাথে ঐক্যমতের কারণে কেউ কেউ তাঁকে শুধু শুধু শীআ বলে চিহ্নিত করেছেন।" এক বুযুর্গতো তাকে। امام من ائمة الامامية —শীআদের ইমামিয়া ফেরকার ইমাম বলেও অভিহিত করেছেন।" অথচ আহলুস সুন্নার অন্যতম এমন কোন ইমাম আছেন, কোন ফিকাহী মাসাআলা বা কোন হাদীসের সত্যাসত্য নিরূপণের ব্যাপারে যাঁর কোন না কোন উক্তি শীআদের সাথে মিলে যায়নি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে তো সকলেই জানেন যে, যার মধ্যে শীআর সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যায়, তিনি তাকে ক্ষমা করতেন না। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারীর তাফসীর সম্পর্কে তিনি তার ফতোয়ায় বলেন ঃ প্রচলিত পরিচিত সকল তাফসীরের মধ্যে তাঁর তাফসীর বিশুদ্ধতম। তিনি বলেন ঃ وليس فيه بدعة —"তাতে কোন বেদয়াত নেই, নেই সুন্নার পরিপন্থী কিছু।"[২] আসলে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে কেবল মুহাদ্দিস বলে স্বীকার করতেন, ফকীহ বলে স্বীকার করতেন না—এ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হাম্বলীরা সর্বপ্রথম তাঁর ওপর রাফেজী হওয়ার ইলযাম আরোপ করে। এ কারণে হাম্বলীরা তাঁর জীবদ্দশায়ই তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তারা তাঁর কাছে যাওয়া থেকে জনগণকে বারণ করতো। তাঁর ইন্তেকালের পর তারা মুসলমানদের কবরস্থানে তাঁকে দাফন পর্যন্ত করতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে তার গৃহেই দাফন করা হয়।[৩] এ বাড়াবাড়ি দেখে ইমাম ইবনে খোযায়মা বলেন ঃ

لقد ظلمته الحنابلة —

—"হাম্বলীরা তাঁর ওপর যুলুম করেছে।" এ ছাড়া তাঁর দুর্নামের ভাগি হওয়ার আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ছিলেন শীআ। কিন্তু যে ব্যক্তি চক্ষু উন্মীলিত করে নিজে তাফসীরে ইবনে জারীর এবং তারীখে তাবারী অধ্যয়ন করেছে, এর রচয়িতা শীআ ছিল বা এ গ্রন্থদ্বয় শীআ মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী—এমন ভুল ধারণায় সে পড়তে পারে না।[৪]

---

২. ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৯২। কুর্দিস্তান আল-এলমিয়্যা প্রেস, মিসর, ১৩২৬ হিজরী।

৩. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৪৬।

৪. সুন্নী ইবনে জারীর আর শীআ ইবনে জারীর উভয়ের জীবন বৃত্তান্ত জানার জন্য ইবনে হাজারের লিসানুল মীযান-এর ১০০ থেকে ১০৩ পৃষ্ঠা—দ্রষ্টব্য। অধুনা কেউ কেউ

ইবনে আবদুল বার্

তৃতীয় হচ্ছেন হাফেয আবু ওমর ইবনে আবদুল বার্। হাফেয যাহাবী তাযকেরাতুল হোফ্ফায গ্রন্থে তাঁকে শায়খুল ইসলাম বলে উল্লেখ করেছেন। আবদুল ওয়ালীদ আল–বাজ্রী বলেন ঃ

لم يكن بالاندلس مثل ابي عمر في الحديث

—"আন্দালুসে আবু ওমরের সমকক্ষ কোন হাদীস বিশারদ ছিলো না।" ইবনে হাযম বলেন ঃ

لا اعلم في الكلام على فقه الحديث مثله اصلا

فكيف احسن منه

—"আমার জানামতে হাদীস অনুধাবনের ব্যাপারে কথা বলার মতো তার চেয়ে উত্তম দূরের কথা তাঁর সমকক্ষও কেউ ছিল না।" ইবনে হাজার বলেন ঃ

له تواليف لا مثل لها منها كتاب الاستيعاب في

الصحابة ليس لاحد مثله

—"তাঁর রচিত গ্রন্থরাজীর কোন তুলনা নেই। এ সবের অন্যতম হচ্ছে আল–ইস্তীআ'ব। সাহাবীদের জীবন চরিত বিষয়ে এর সমকক্ষ কোন গ্রন্থ নেই।" এমন কে আছেন, সাহাবীদের জীবন চরিত সম্পর্কে যিনি তাঁর আল–ইস্তীআব–এর ওপর নির্ভর করেননি? শীআদের প্রতি তার ঝোঁক ছিল এমন সন্দেহ প্রকাশ করেছে বা তিনি যা–তা নকল করতেন—এমন অভিযোগ করার মতো কে আছে?

ইবনুল আসীর

৪র্থ হচ্ছেন ইবনুল আসীর। তাঁর তারীখুল কামেল এবং উসুদুল গাবাহ্ ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উৎস বলে পরিগণিত। পরবর্তী কালের এমন কোন লেখক নেই, যিনি তাঁর ওপর নির্ভর করেননি। তাঁর সমসাময়িক কাযী ইবনে খাল্লেকান লিখেছেন ঃ

كان اماما في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق

পাইকারীভাবে তারীখ–ই–তাবারীর লেখককে শীআ ঐতিহাসিক এমনকি গোঁড়া–চরমপন্থী শীআ বলেও চিত্রিত করেছেন। সম্ভবত তাদের ধারণা, বেচারা উর্দুভাষীরা মূল গ্রন্থ পাঠ করে সত্যিকার অবস্থা জানার সুযোগ পাবে কোথায়?

بـه ، حافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة - وخبيرا بانساب العرب وايامهم ووقائعهم -

—"হাদীস হেফযকরণ, তার জ্ঞান এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদীতে তিনি ইমাম ছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক এবং প্রাচীন ইতিহাসের হাফেয। আরবদের বংশ পরম্পরা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সুবিদিত ছিলেন।"[৫] শীআদের প্রতি তাঁর সামান্যতম আকর্ষণ সম্পর্কে কেউ সন্দেহও করেনি। তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় তিনি নিজে অতি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, সাহাবীদের মতবিরোধের বর্ণনায় আমি অতি সতর্কতার সাথে দেখে শুনে পা বাড়িয়েছি।

ইবনে কাসীর

পঞ্চম হচ্ছেন হাফেয ইবনে কাসীর। মুহাদ্দিস মুফাসসির এবং ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর স্থান সমগ্র উম্মাতের নিকট স্বীকৃত। তাঁর 'আল–বেদায়া ওয়ান নেহায়া' ইতিহাস গ্রন্থ ইসলামের উৎকৃষ্টতম উৎস বলে পরিগণিত। কাসফুয্যুনুন–এর রচয়িতার উক্তি অনুযায়ী এর সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এই যে ঃ

يميز بين الصحيح والسقيم -

—"তিনি বিশুদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করেন।" হাফেয যাহাবী তাঁর প্রশংসায় বলেন ঃ

الامام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن محدث متقن مفسر نقال -

—"তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম মুফতী বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, বিচক্ষণ ফকীহ, বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস–মুফাসসির। উক্তি উদ্ধৃত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। দু'টি কারণে আমি তাঁর ইতিহাসের ওপর বেশী নির্ভর করেছি। এক ঃ শীআ' মতবাদের প্রতি আকর্ষণ তো দূরের কথা, বরং তিনি ছিলেন তার কঠোর বিরোধী। শীআদের বর্ণনার কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে কারো ওপর যথাসাধ্য আঁচড় লাগতেও দেননি। বিপর্যয়কালের ইতিহাস বর্ণনায় তিনি হযরত মুআবিয়ারই নয়, ইয়াযীদেরও সাফাই গাইতে কসুর করেননি। এতদসত্ত্বেও তিনি এতটা ন্যায়পরায়ণ যে, ইতিহাস বর্ণনায় কোন বিষয় গোপন করার চেষ্টা করেননি। দুই ঃ কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী এবং ইবনে

৫. ওয়াফায়াতুল আয়ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৩–৩৪।

তাইমিয়া—উভয়েরই পরবর্তী কালের লোক ছিলেন তিনি। কাযী আবুবকর-এর আল-আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম' এবং ইবনে তাইমিয়ার 'মিনহাজুস সুন্না' সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি ইবনে তাইমিয়ার কেবল শাগরেদই ছিলেন না, তাঁর ভক্তও ছিলেন। এ জন্য তাঁকে বিপদও সইতে হয়েছে প্রচুর।[৬] তাই শীআ' বর্ণনা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে পারেন, এমন কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। শীআ'দের বর্ণনার ব্যাপারে তিনি শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারেন বা কাযী আবুবকর এবং ইবনে তাইমিয়া যে সকল বিষয় আলোচনা করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না, এমন কথাও আমি ভাবতে পারি না।

এ ছাড়া যাদের কাছ থেকে আনুষঙ্গিক ভাবে অল্প-বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাঁরা হচ্ছে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে খাল্লেকান, ইবনে খালদুন আবুবকর জাস্সাস, কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী, মোল্লা আলী ক্বারী, মুহেব্বুদ্দীন আত-তাবারী এবং বদরুদ্দীন আইনীর মতো ব্যক্তিত্ব। এঁদের সম্পর্কে সম্ভবত কেউই এমন কথা বলতে সাহস পাবে না যে, তাঁরা নির্ভরযোগ্য নন, বা শীআ' মতবাদে কলংকিত, বা সাহাবীদের ব্যাপারে কোন কথা বলার ব্যাপারে তাঁরা শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারেন, বা তাঁরা অলীক কাহিনী বর্ণনা করার মতো ব্যক্তি ছিলেন। কোন কোন ঘটনার প্রমাণে আমি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য বর্ণনারও উল্লেখ করেছি। কিন্তু কোন ব্যক্তির খাহেশের পরিপন্থী কথা হলেও তাকে ভুল বলবে—যদিও হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে—এ হঠকারিতার কোন চিকিৎসা নেই, নেই এর কোন ওষুধ। এ হঠকারিতারও কোন চিকিৎসা নেই যে, মর্জী মতো হলেই তাকে নির্ভুল বলবে—যদিও সে যাকে দুর্বল বলছে, তার তুলনায় এর সনদ আরও দুর্বল।

এ সকল ইতিহাস কি নির্ভরযোগ্য নয়

এখন চিন্তা করে দেখুন। এ হচ্ছে সেসব উৎস, যার থেকে আমি গোটা আলোচনায় উপকরণ গ্রহণ করেছি। সে কালের ইতিহাসের ব্যাপারে এ সব যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, তাহলে ঘোষণা করুন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগ থেকে নিয়ে ৮ম শতক পর্যন্ত ইসলামের কোন ইতিহাস দুনিয়ায় বর্তমান নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরবর্তী যুগের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস—হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং ওমর ফারুক (রাঃ)-এর ইতিহাস সহ—এঁদের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌছেছে। এগুলো যদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য না হয়, তাহলে তাঁদের বর্ণিত খেলাফতে রাশেদার ইতিহাস, ইসলামের স্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনেতিহাস এবং তাঁদের কীর্তি গাঁথা সবকিছুই মিথ্যার ভাণ্ডার, যা কারো সামনেই আমরা তুলে ধরতে পারি না আস্থার সাথে। বিশ্ব এ নীতি কখনো মানতে পারে না, বিশ্ব কেন, স্বয়ং মুসলমানদের বর্তমান বংশধরেরাও এ কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, আমাদের বুযর্গদের যে সকল গুণাবলী এ সকল ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তা সবই সত্য। আর এ সকল গ্রন্থে তাঁদের যেসব দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই মিথ্যা। কারো যদি এ ধারণা হয়ে থাকে যে, শীআ'দের ষড়যন্ত্র এতই শক্তিশালী ছিল যে, তাদের প্ররোচনা থেকে আহলে সুন্নার এসব লোকেরাও

---

৬. আদ-দুরারুল কামেনা; ইবনে হাজার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৭৪, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৪৮।

বাঁচতে পারেনি, শীআদের বর্ণনা তাঁদের গ্রন্থরাজীতেও প্রবিষ্ট হয়ে সে যুগের গোটা ইতিহাসকেই বিকৃত করে ছেড়েছে। তাহলে আমি বিস্মিত যে, তাদের এ অনুপ্রবেশ থেকে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)–এর জীবনেতিহাস এবং তাঁদের যুগের ইতিহাস কি করে সংরক্ষিত রয়ে গেছে।

তা সত্ত্বেও যেসব বন্ধু যিদ ধরে বসে আছেন যে, এ সকল ঐতিহাসিকদের সে সকল বর্ণনা থেকে আমি উপকরণ সংগ্রহ করেছি, তা নির্ভরযোগ্য নয়, তাঁদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন, তাঁরা যেন দয়া করে বলেন যে, তাঁদের এ সকল বর্ণনা শেষ পর্যন্ত কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ পর্যন্ত অবিশ্বাস্য। সে তারিখের পূর্বের বা পরের যে সকল ঘটনা এ ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন, তা কেন নির্ভরযোগ্য? আর এ ঐতিহাসিকরা এ অন্তরবর্তীকালীন সময়ের ব্যাপারেই কেবল এতটুকু অসতর্ক হয়ে পড়েন যে, তাঁরা বিভিন্ন সাহাবী সম্পর্কে এত মিথ্যা উপকরণ তাঁদের গ্রন্থে কেনইবা সংগৃহীত করেছিলেন?

হাদীস এবং ইতিহাসের পার্থক্য

কোন কোন বন্ধু ঐতিহাসিক বর্ণনা যাঁচাই এর জন্য আসমাউর রেজাল বা চরিত শাস্ত্র খুলে বসে যান এবং বলেন, অমুক অমুক বর্ণনাকারীকে চরিত শাস্ত্রের ইমামরা ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। আর অমুক বর্ণনাকারী যে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সে সময় তিনি তো শিশু ছিলেন অথবা তাঁর জন্মই হয়নি। আর অমুক বর্ণনাকারী একটি বর্ণনা যে উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, তার সাথে তিনি সাক্ষাতই করেননি। এমনি তাঁরা ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর হাদীস যাঁচাই–বাছাইয়ে এ নীতি প্রয়োগ করেন। আর এ কারণে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, অমুক ঘটনা সনদ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে, আর অমুক ঘটনার সনদে বিচ্যুতি ঘটেছে। এ সকল কথা বলার সময় তাঁরা ভুলে যান যে, মুহাদ্দিসরা হাদীস যাঁচাই–বাছাই এর এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন মূলত বিধি–বিধানের হাদীসের ব্যাপারে। কারণ, হালাল–হারাম, ফরয ওয়াযেব এবং মাকরূহ-মোবাহর মতো গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াত সংক্রান্ত বিষয়াদীর ফায়সালা হয় এরই ওপর। দ্বীনে কোন্‌টি সুন্না আর কোন্‌টি সুন্না নয়, তাও জানা যায় এরই দ্বারা। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাপারেও যদি এ সকল শর্ত আরোপ করা হয়, তবে ইসলামের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ের তো প্রশ্নই উঠে না, বরং প্রথম যুগের ইতিহাসের ন্যূন পক্ষে এক–দশমাংশ অনির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে যাবে। আর আমাদের বিরোধীরা যে সকল শাস্ত্রের শর্ত সামনে রেখেই সে সকল কীর্তিকে প্রনিধানের অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করবে, যা নিয়ে আমরা গর্ব করি। কারণ, হাদীসের মূলনীতি এবং আসমাউর রেজাল বা চরিত শাস্ত্র যাঁচাই–বাছাই এর মানদণ্ডে তার অধিকাংশই উত্তীর্ণ হয় না। এমনকি এক একটি বর্ণনা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে—পরিপূর্ণ এ শর্তে রাসূলুল্লার পূত–পবিত্র জীবন চরিতও সংগ্রহ করা যায় না।

বিশেষ করে ওয়াকেদী এবং সাইফ ইবনে ওমর এঁদের মতো অন্যান্য রাবীদের যাঁচাই–বাছাই শাস্ত্রের সেরা মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করে জোর দিয়ে এ দাবী করা যায় যে, কেবল হাদীসের ক্ষেত্রেই নয়, বরং ইতিহাসের ব্যাপারেও এদের কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সে সকল ইমামের

গ্রন্থ থেকে যাঁচাই-বাছাই এর ইমামদের এ সকল উক্তি উদ্ধৃত করা হয়, তাঁরা কেবল হাদীসের ব্যাপারে এদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী এবং জীবন চরিতের ব্যাপারে এ সকল আলেম তাঁদের গ্রন্থে সেখানেই যা কিছু লিখেছেন, তারা এদের উদ্ধৃতি দিয়ে অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ হাফেয ইবনে হাজারের কথাই ধরুন। তাঁর তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থ থেকে চরিত শাস্ত্রের ইমামদের এ সকল সমালোচনা উল্লেখ করা হয়। কেবল ঐতিহাসিক গ্রন্থাদীতেই নয়, বরং বুখারীর ভাষ্য ফতহুল বারীতেও তিনি যখন যুদ্ধের কাহিনী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেন, তখন তাতে স্থানে স্থানে ওয়াকেদী, সাইফ ইবনে ওমর এমন করে অন্যান্য দুর্বল বর্ণনাকারীদের উক্তি দেদার উদ্ধৃত করেছেন। এমনিভাবে হাফেয ইবনে কাসীর তাঁর আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়ায় আবুমেহনাফ-এর কঠোর নিন্দা করেছেন আর তিনি নিজেই ইবনে জারীর তাবারীর ইতিহাস থেকে বহুবার সে সকল ঘটনার উল্লেখও করেছেন, যা তিনি বর্ণনা করেছেন এদেরই উদ্ধৃতি দিয়ে। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, হাদীস শাস্ত্রের মহান ওলামায়ে কেরাম সর্বদা হাদীস এবং ইতিহাসের সুস্পষ্ট পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তাঁরা এ দুটি বিষয়কে একাকার করে একটির সমালোচনার সে নীতি প্রয়োগ করতেন না, মূলত যা রচিত হয়েছে অপর জিনিসের জন্য। এ পন্থা কেবল মুহাদ্দিসীনরাই মেনে চলতেন না, বরং বড় বড় ফকীহ্রাও— রেওয়ায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে যারা আরও কঠোরতা অবলম্বন করতেন এ নীতি মেনে চলতেন। উদাহারণ স্বরূপ ইমাম শাফেয়ী এক দিকে ওয়াকেদীকে কট্টর মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেন—অপরদিকে কিতাবুল উম্ম এ তিনি যুদ্ধ অধ্যায়ে তার বর্ণনা থেকে দলীল উপস্থাপন করেছেন।

এর অর্থও এ নয় যে, এ'রা চক্ষু বন্ধ করে এ সকল দুর্বল বর্ণনাকারীদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আসলে তাঁরা এদের সমস্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যানও করেননি। আবার সবটুকু গ্রহণও করেননি। আসলে তাঁরা এ সবের মধ্য থেকে যাঁচাই বাছাই করে কেবল তাই গ্রহণ করতেন, যা তাঁদের নিকট গ্রহণ করার যোগ্য। যার সমর্থনের আরও অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও তাঁদের সামনে থাকতো, যার মধ্যে ঘটনা পরম্পরার সাথে সামঞ্জস্যও পাওয়া যেতো। এ কারণে ইবনে সাআ'দ ইবনে আবদুল বার, ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর, ইবনে আসীর, ইবনে হাজার এবং এদের মতো অন্যান্য নির্ভরযোগ্য আলেমরা তাঁদের গ্রন্থে দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে সে সকল বিষয় বর্ণনা করেছেন, তা প্রত্যাখান করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাঁরা দুর্বল এবং ধারাবাহিকতা বহির্ভূত সনদে যেসব বিষয় গ্রহণ করেছেন, বা বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন, সে সব নিছক ভিত্তিহীন, কল্প কাহিনী মাত্র, তাই তা ছুড়ে ফেলে দিতে হবে—এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণেও কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই।

অধুনা এমন ধারণাও বড় জোরেশোরে পেশ করা হচ্ছে যে, যেহেতু আব্বাসীয়দের আমলেই মুসলমানদের ইতিহাস রচনা শুরু হয়েছে, আর বনী উমাইয়্যাদের সাথে আব্বাসীয়দের যে দুশমনী ছিল তা কারো কাছে গোপন নয়; তাই সে সময়ে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে সে সবই ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের প্রোপগাণ্ডায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এ দাবী সত্য হলে এ কথার কি ব্যাখ্যা করা হবে যে, এ সকল ইতিহাসেই বনী উমাইয়াদের সে সব স্বরণীয় কীর্তিমালাও বর্ণিত হয়েছে, এ সকল বন্ধুরা যা গর্বের সাথে বলে বেড়ান, আর এ সব ইতিহাসই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের উৎকৃষ্টতম জীবনেতিহাসের বিস্তারিত আলোচনায়ও দেখতে পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন বনী উমাইয়াদেরই

অন্যতম। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এ সব ইতিহাসেই আব্বাসীয়াদের অনেক দোষ-ত্রুটি এবং যুলুম-নির্যাতনের বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। এ সব কিছুও কি আব্বাসীয়ারা নিজেরাই প্রচার করেছেন?

ওকালতীর মৌলিক দুর্বলতা

উৎস সম্পর্কে এ আলোচনা শেষ করার আগে আমি এ কথাও প্রকাশ করে দিতে চাই যে, কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবীর আল-আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মিনহাজুস সুন্নাহ এবং শাহ আবদুল আজীজের তোহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাকে কেন্দ্র করেই আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিনি কেন। আমি এ সকল বুযুর্গের একান্ত ভক্ত। সততা বিশ্বস্ততা এবং চিন্তা-গবেষণার বিশুদ্ধতার বিচারে এরা নির্ভরযোগ্য নন, এমন কথা আমার মনের কোণেও উদয় হয়নি। কিন্তু যে কারণে এ ব্যাপারে আমি তাঁদের ওপরই সীমাবদ্ধ না থেকে মূল উৎস থেকে নিজে অনুসন্ধান চালিয়ে স্বাধীন মতামত গ্রহণ করার পথ অবলম্বন করেছি, তা হলো এই যে, মূলতঃ এরা তিন জনেই ইতিহাস হিসেবে ঘটনাবলীর বর্ণনার জন্য তাদের গ্রন্থ রচনা করেননি, বরং তাঁরা তা লিখেছেন শীআদের কড়া অভিযোগ এবং তাঁদের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে। এ কারণে কার্যত তাঁদের স্থান হয়েছে প্রতিপক্ষের উকিলের অনুরূপ। আর ওকালতী—তা বাদীপক্ষের হোক বা বিবাদীপক্ষের-তার স্বভাব হচ্ছে এই যে, মানুষ তাতে সে সব তথ্যের দিকেই ফিরে যায়, যাতে তার মামলা যুৎসই হয়, আর সে সব তথ্য এড়িয়ে যায়, যাতে তার মামলা দুর্বল হয়। সাধারণত এটাই হচ্ছে মানুষের স্বভাব। বিশেষ করে এ ব্যাপারে কাযী আবুবকর তো সীমাতিক্রম করে গেছেন। ইতিহাস অধ্যয়ন করেছে এমন কোন ব্যক্তি তো এ থেকে কোন শুভ প্রতিক্রিয়া লাভ করতে পারে না। এ কারণে আমি তাদেরকে বাদ দিয়ে মূল ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি, এবং সে সব ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

এবার আমি সে সব মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করবো, যা নিয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কর্মধারা ব্যাখ্যা

সাইয়্যেদেনা হযরত ওসমান (রাঃ) নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে যে কর্মধারা অবলম্বন করেছেন, তা কোন অসদুদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করেছেন, আমার মনে (নাউযুবিল্লাহি) এমন কোন ধারণার উদ্রেকও হয়নি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লার একনিষ্ঠ এবং প্রিয়তম সাহাবীদের অন্যতম। ঈমান আনয়নের পর থেকে শাহাদাত লাভ পর্যন্ত তাঁর গোটা জীবন এ কথারই প্রমাণ বহন করে। সত্য দ্বীনের জন্য তাঁর ত্যাগ কুরবানী, একান্ত পূত-পবিত্র চরিত্র এবং তাকওয়া-তাহারাত—আল্লাভীতি এবং নির্মলতা দৃষ্টে কোন বুদ্ধিমান লোক কি এমন কথা ভাবতেও পারে যে,এমন নির্মল-পূত-পবিত্র স্বভাবের লোক অসদুদ্দেশ্যে তেমন কর্মধারা অবলম্বন করতে পারেন, বর্তমান কালের রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) বলা হয়। বস্তুত তাঁর এহেন কর্মধারার ভিত্তি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি এটাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের দাবী বলে মনে করতেন।[৭]

---

৭. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস সংখ্যা—২৩২৪। তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪।

তাঁর ধারণা ছিল কুরআন সুন্নায় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার দাবী পূর্ণ হতে পারে কেবল এভাবে যে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যতটুকু ভাল ব্যবহার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, তা করতে সে বিন্দুমাত্রই কুণ্ঠাবোধ করবে না। এটা নিয়াত বা উদ্দেশ্যের ত্রুটি নয়, বরং সিদ্ধান্তের ত্রুটি বা অন্য কথায় ইজতিহাদের ত্রুটি ছিল। উদ্দেশ্যের ত্রুটি হতো তিনি যদি এ কাজকে না জায়েয মনে করেও নিছক সার্থে বা আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থে তা করতেন। কিন্তু এটাকে ইজতিহাদের ত্রুটি বলা ছাড়া কোন উপায় নেই; কারণ, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারের নির্দেশ ছিল তাঁর নিজের, খেলাফতের পদের নয়। তিনি সারা জীবন নিজে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যে উদার সদাচার করেছেন সন্দেহ নেই, তা ছিল এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর নিজের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি এবং টাকা-কড়ি সবই আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছেন এবং পুত্র-পরিজনকেও তাদের সমান করে রেখেছেন। তাঁর এ কাজের যতই প্রশংসা করা হোক তা বেশী হবে না। কিন্তু খেলাফতের পদের সাথে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন সম্পর্ক ছিল না। খলীফা হিসেবে আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণ সাধন ছিল না এ নির্দেশের সত্যিকার দাবী।

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারের জন্য শরীয়াতের বিধানের ব্যাখ্যা করে হযরত ওসমান (রাঃ) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার কোন অংশকেও না-জায়েয বা অন্যায় বলা যায় না। স্পষ্ট যে, খলীফা তাঁর বংশ-গোত্রের কোন লোককে কোন পদ দেবেন না—শরীয়াতের এমন কোন বিধান নেই। গণীমাতের মাল বন্টন বা বায়তুল মাল থেকে সাহায্যের ব্যাপারেও শরীয়াতের এমন কোন বিধান ছিল না, যা তিনি ভঙ্গ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর যে ওসিয়্যাতের কথা উল্লেখ করেছি, তাও কোন শরীয়াত ছিল না যে, তা মেনে চলা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল, আর তার বিরুদ্ধাচরণ ছিল তার জন্য না-জায়েয। তাই, তিনি বৈধ সীমালংঘন করেছেন—এ ব্যাপারে তাঁর ওপর এমন আরো কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না কিছুতেই। কিন্তু এ কথাও কি অস্বীকার করা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, হযরত ওমর তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসূরীদেরকে যে নীতি মেনে চলার উপদেশ দান করেছেন, শাসন ব্যবস্থার বিচারে তা-ই সবচেয়ে বিশুদ্ধ নীতি। সাইয়্যেদেনা হযরত ওসমান (রাঃ) এ নীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেন, প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা ছিল অসমীচীন এবং কার্যত তা অত্যন্ত ক্ষতিকরও প্রমাণিত হয়েছে—এ কথা স্বীকার করতেও কি কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ রয়েছে? সন্দেহ নেই, এ সব ক্ষতি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না, পরে এর যে পরিণতি দেখা দিয়েছে, তার জন্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি তা করেছেন, এমন কথা কেবল বোকা-ই কল্পনা করতে পারে। কিন্তু প্রশাসনিক ভুলকে অবশ্যই ভুল স্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর বংশেরই এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের চীফ সেক্রেটারী করেন।৮ এবং জাযিরাতুল আরবের বাইরের সমস্ত মুসলিম অধিকৃত এলাকায় তাঁর বংশেরই গভর্ণর নিয়োগ করবেন—কোন ব্যাখ্যা করেই এটাকে সঠিক বলে চিহ্নিত করা যাবে না।

---

৮. দাবী করা হয় যে, বর্তমান যুগের মতো সেকালে খেলাফতের কোন দফতর ছিল না, ছিল না তার কোন আমলা, সেক্রেটারী বা চীফ সেক্রেটারী। তখন খলীফা কোন ব্যক্তিকে দিয়ে মামুলী পত্র যোগাযোগের কাজ চালাতেন । এমনি করে আমাদের সামনে খেলাফতে রাশেদার শাসন

এখানে জেনে রাখা ভাল যে, সে কালের শাসন-শৃংখলার দৃষ্টিতে আফ্রিকার সমস্ত বিজীত অঞ্চল ছিল মিসরের গভর্ণরের অধীনে, শাম-এর সমস্ত অঞ্চল ছিল দামেশ্‌কের গভর্ণরের অধীনে, ইরাক আযার-বাইজান, আর্মেনিয়া এবং খোরাসান ও পারস্যের সমস্ত এলাকা ছিল কূফা এবং বসরার গভর্ণরের অধীনে। সাইয়্যেদেনা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনকালে এমন এক সময় এসেছিল, যখন এ সকল প্রদেশেরই গভর্ণর (বরং প্রকৃত প্রস্তাবে গভর্ণর জেনারেল) ছিল তাঁরই আত্মীয়-স্বজন। এটা এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক ঘটনা, বাস্তবতার দৃষ্টিতে স্বপক্ষের সকলেই তা স্বীকার করেছেন। এমন কথা কেউ বলেনি যে, মূলত এ ধরনের কোন ঘটনাই ঘটেনি।

তাঁর এ কার্যকে সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত করার জন্য অনেক বুযুর্গ যুক্তি উপস্থিত করে বলেছেন যে, নিজ বংশের যাদেরকে হযরত ওসমান (রাঃ) পদ দান করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়েও পদ লাভ করেছেন। কিন্তু এ যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। প্রথমত, এরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নয়, বরং হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন। আর এটা কারো জন্যই অভিযোগের কারণ ছিল না। রাষ্ট্র প্রধান যখন তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে বড় বড় পদ দিতে লাগলেন, জনগণ তখন অভিযোগের সুযোগ লাভ করে। দ্বিতীয়, হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে তাদেরকে এত বড় পদ দেয়া হয়নি কখনো, যা পরে তাদেরকে দেয়া হয়েছে। আবদুল্লা ইবনে সা'আদ ইবনে আবি সারাহ্ তাঁর শাসনকালে নিছক একজন সামরিক অফিসার ছিলেন, পরে তাঁকে মিসরের সাঈদ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ছিলেন কেবল দামেশ্‌ক এলাকার গভর্ণর।৯ আল-জাযিরার আরব এলাকার যেখানে বনু তাগলীবরা বাস করতো, ওয়ালীদ ইবনে

কালের এক অদ্ভুত চিত্র অংকিত হয় যে, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত যে সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল, কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছাড়াই তা শাসিত হতো। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রিপোর্ট আসতো, কিন্তু তার কোন রেকর্ড রাখাই হতো না। সাম্রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে জিযিয়া, খারাজ, যাকাত, মালে গণীমাত, খোমস ইত্যাকার অসংখ্য আর্থিক লেনদেন হতো, কিন্তু কোন কিছুরই কোন হিসেব-নিকেশ ছিল না। গভর্ণর এবং সেনাবাহিনীর কমাণ্ডারদেরকে প্রতিদিন নির্দেশ দেয়া হতো, কিন্তু এ সব কিছুরই রেকর্ড থাকতো একজন লোকের মস্তিষ্কে ; আর তিনি প্রয়োজন পড়লে কোন ব্যক্তিকে ডেকে তার দ্বারা মামুলী পত্র যোগাযোগের কাজ সারাতেন ! যেন এটা যুগের সেরা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা নয়, বরং তা ১৫/২০ জন তালেবে এলম-এর একটা মাদ্রাসা, যা পরিচালনা করতেন একজন মৌলভী সাহেব।

দামেশ্‌ক মানে কেবল দামেশ্‌ক শহর নয়, বরং শাম-এর সে অংশ যার রাজধানী ছিল দামেশ্‌ক। তাবারী স্পষ্ট করে বলেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের সময় হযরত মুআবিয়া (রাঃ) দামেশ্‌ক এবং জর্ডানের গভর্ণর ছিলেন—(৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৩৯) হফেয ইবনে কাসীর বলেন ঃ

والصواب ان الذى جمع لمعاوية الشام كلها عثمان

ওকবা ছিলেন কেবল সে এলাকার গভর্ণর। সাঈদ ইবনুল আস এবং আবদুল্লা ইবনে আমেরও নিয়োজিত ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে। জাযিরাতুল আরবের বাইরের গোটা মুসলিম অধিকৃত অঞ্চল একই বংশের গভর্ণরদের অধীনে থাকবে, আর সে গভর্ণরও হবে সেকালের খলীফার আপন বংশের লোক[৮০]—তাঁর শাসনকালে এমন পরিস্থিতির উদ্ভবও হয়নি কখনো।

এ কথাও অনস্বীকার্য যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনামলের শেষের দিকে যারা এত বড় গুরুত্ব লাভ করে, তাদের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সান্নিধ্য এবং দীক্ষা দ্বারা তাদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়েছে খুব কমই। এদের বয়কট করা হোক বা ইসলামী রাষ্ট্রে কাজ করার সকল সুযোগ সুবিধা থেকে দূরে রাখা হোক—এমন নীতি হুযুর (সঃ)-এর ছিল না। হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-ও এমন কিছু করেননি। হুযুর (সঃ) এবং তাঁর পরে প্রথম খলীফাদ্বয় তাদের হৃদয় জয় করে এবং তাদেরকে দীক্ষা দিয়ে সমাজে তাদেরকে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা তাদেরকে নিজেদের সমর্থ অনুযায়ী কাজেও নিয়োজিত করেন। কিন্তু প্রাথমিক যুগের লোকদেরকে বাদ দিয়ে এদেরকেই সম্মুখে ঠেলে দেয়ার নীতি হুযুর (সঃ)-এরও ছিল না, ছিল না প্রথম খলীফাদ্বয়েরও। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের আসনে তাদের অধিষ্ঠিত হওয়ারও কোন অবকাশ ছিল না। হুযুর (সঃ) এবং প্রথম খলীফাদ্বয়ের

---

[৮০] بن عفان، وأما عمر فإنما ولاه بعض أعمالها

(البداية ج ٨-ص ١٢٤)

—বরং আসল কথা হচ্ছে এই যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-ই মুআবিয়া (রাঃ)-কে গোটা এলাকার গভর্ণর নিয়োগ করেন। অবশ্য হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কেবল শাম এর অংশ বিশেষের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

১০. কোন কোন মহল এখানে যুক্তি পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো কুরাইশের লোকদেরকে বড় বড় পদে নিয়োগ করেছেন, এমনকি খেলাফতের ব্যাপারেও তিনি তাদেরকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এ যুক্তি ঠিক নয়। কুরাইশ তাঁর বংশের লোক বলে তিনি তাদেরকে প্রাধান্য দেননি, বরং তিনি নিজে এর কারণ এ বর্ণনা করেন ঃ আরবে হেম্‌ইয়ার গোত্রের সর্দারীর অবসানের পর কুরাইশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রে তারাই ছিল দীর্ঘ দিন ধরে আরবদের নেতা। আরবরাও তাদের নেতৃত্বই স্বীকার করতো। এ কারণে তাদেরকেই সামনে রাখতে হবে ; কারণ, তাদের মুকাবিলায় অন্যদের নেতৃত্ব চলতে পারে না। এ ব্যাপারে হুযুরের এরশাদ আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪-৬৯ এবং তাফহীমাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৯-১৪২-এ। আত্মীয়তার ভিত্তিতে তিনি কাউকে সামনে বাড়ালে বনী হাশেমকে সকলের চেয়ে বেশী আগে বাড়াতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল হযরত আলী (রাঃ)-কে তিনি সময়ে সময়ে কোন কোন পদে নিয়োগ করেন। অথচ বনী হাশেমের মধ্যে যোগ্য লোকের অভাব ছিল, এমন কেউ কথা বলতে পারে

শাসনামলে প্রথমতঃ এরা কঠোর নিয়ম-শৃংখলায় বাঁধা ছিলেন, এ শৃংখলায় কোন ঢিলেমি ছিল না, ছিল না কোন শৈথিল্য। তাছাড়া একই সাথে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদেরকে নিয়োগ করে ভারসাম্য বিনষ্ট করাও হয়নি তাঁদের শাসনামলে। উপরন্তু রাষ্ট্র প্রধানের নৈকট্যও তাদের পক্ষে কোন শৈথিল্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। তাই, সে সময়ে তাদেরকে কাজে নিয়োগ করা সে সকল দোষ-ত্রুটির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি, যা পরবর্তীকালে তাদেরকে কাজে নিয়োগের ফলে দেখা দেয়। পরবর্তীকালে বনী উমাইয়াদের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ কার্যত এ কথা প্রমাণ করে যে, এরা অনৈসলামিক রাষ্ট্রের যোগ্য শাসক এবং প্রাশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে সর্বোত্তম যোগ্যতার অধিকারী হলেও মুসলিম মিল্লাতের নৈতিক এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের যোগ্য ছিল না। এ বাস্তব সত্য ইতিহাসে এতই স্পষ্ট যে, প্রতিপক্ষের কোন সাফাই এর ওপর পর্দা টানার কাজে সফলতা লাভ করতে পারে না।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে একটানা ১৬-১৭ বছর একই প্রদেশের গভর্ণর থাকতে দেয়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে না জায়েয ছিল না ; অবশ্য রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে তা অসমীচীন ছিল অবশ্যই। বিনা অপরাধে শুধু শুধু তাঁকে অপসারণ করা উচিত ছিল এমন কথা আমি বলি না। কয়েক বছর পর পর এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে তাঁকে বদলী করাই যথেষ্ট ছিল। ফলে তিনি কোন একটি প্রদেশেও এতটা শক্তিশালী হতে পারতেন না এবং কখনো কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না।

বায়তুল মাল থেকে আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য প্রসঙ্গে

বায়তুল মাল থেকে আত্মীয় স্বজনদের সাহয্যের ব্যাপারে হযরত ওসমান (রাঃ) যা কিছু করেছেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে সে সম্পর্কে আপত্তি করার কোন অবকাশ নেই। মাআযাল্লাহ । আল্লাহ এবং মুসলমানদের সম্পদে তিনি কোন প্রকার খেয়ানত করেননি কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁর কর্মনীতি প্রশাসনের দৃষ্টিতে এমন ছিল, যা অন্যদের জন্য অভিযোগ আপত্তির কারণ না হয়ে পারেনি।

মুহাম্মদ ইবনে সাআদ 'তাবাকাতে' ইমাম যুহরীর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وَاسْتَعْمَلَ أَقْرِبَاءَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فِي السِّتِّ الْأَوَاخِرِ - وَكَتَبَ لِمَرْوَانَ خُمُسَ مِصْرَ وَأَعْطَى أَقْرِبَائَهُ الْمَالَ - وَتَأَوَّلَ فِي ذَالِكَ الصِّلَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا ، وَاتَّخَذَ الْأَمْوَالَ وَاسْتَسْلَفَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَرَكَا مِنْ ذَالِكَ

ما هو لهما و انى اخذته فقسمته من اقربائى فنا انكر

الناس عليه -

হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর শাসনের শেষ ৬ বছরে আত্মীয়-স্বজন এবং খান্দানের লোকজনকে সরকারী পদে নিয়োগ করেন। তিনি মারওয়ানকে মিসরের মালে গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ (অর্থাৎ আফ্রিকার মালে গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ, যা মিসরের পক্ষ থেকে আসতো) লিখে দেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনকে অর্থও দান করেন। এ ব্যাপারে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এটা হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচার, আল্লাহ্ যার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বায়তুল মাল থেকে টাকাও গ্রহণ করেন, ঋণও দেন। তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) বায়তুল মালে তাঁদের অধিকার ত্যাগ করেন, আর আমি তা গ্রহণ করে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করেছি। লোকেরা এটাকেই না-পছন্দ করেছে।[১১]

এটা ইমাম যুহ্রীর বর্ণনা, যিনি ছিলেন সাইয়্যেদেনা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময়ের অনেক নিকটবর্তী কালের লোক। আর মুহাম্মাদ ইবনে সাআ'দের সময় ইমাম যুহ্রীর সময়ের অতি নিকটবর্তী। ইবনে সাআ'দ কেবল দু'টি মাধ্যমে তাঁর এ উক্তি উদ্ধৃত করেন। এ কথাটি ইবনে সাআ'দ ইমাম যুহ্রীর প্রতি বা ইমাম যুহ্রী হযরত ওসমান (রাঃ)-এর প্রতি ভুল আরোপ করে থাকলে মুহাদ্দেসীন অবশ্যই এর প্রতিবাদ জানাতেন। তাই এ বর্ণনাকে সত্য বলে স্বীকার করতেই হবে।

ইবনে জারীর তাবারীর একটি বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন মেলে। তিনি বললেন, অফ্রিকায় আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'আদ ইবনে আবি সারাহ্ সেখানকার বাতরীক এর সাথে ৩শ' কিনতার স্বর্ণের ওপর সমঝোতা করেন।

فامر بها عثمان لآل الحكم

—অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) এ মুদ্রা আল-হাকাম অর্থাৎ মারওয়ান ইবনে হাকামের পিতার বংশকে দান করার নির্দেশ দেন।[১২]

---

১১. তাবাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪। কেউ কেউ বলেন, ইবনে খালদুন মারওয়ানকে আফ্রিকার মালে গণীমাতের $\frac{1}{5}$ অংশ দেয়ার প্রতিবাদ করেছেন। অথচ ইবনে খালদুন লিখেছেন ঃ

و الصحيح انه اشتراه بخمس مائة الف فوضعها عنه

— আসলে কথা হচ্ছে এই যে, মারওয়ান এ এক-পঞ্চমাংশ ৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন, আর হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে এ মূল্য মাফ করে দেন। তারীখে ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৩৯-১৪০ দ্রষ্টব্য।

১২. আত-তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩১৪।

হযরত ওসমান (রাঃ) নিজেও একদা এক অনুষ্ঠানে—যেখানে হযরত আলী (রাঃ), হযরত সাআ'দ (রাঃ) ইবনে আবু ওয়াক্কাস, হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন, সে অনুষ্ঠানে তাঁর অর্থ সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা চলছিল—তাঁর কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

"আমার পূর্বসূরীদ্বয় তাঁদের নিজেদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ দান করতেন। আমি এমন এক খান্দানের লোক, যারা দরিদ্র। এ কারণে আমি রাষ্ট্রের যে খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছি, তার বিনিময়ে বায়তুল মাল থেকে টাকা গ্রহণ করেছি, এবং আমি মনে করি, এটা গ্রহণ করার অধিকার আমার আছে। আপনারা এটাকে ভুল বা অন্যায় মনে করলে এ টাকা ফেরত দানের সিদ্ধান্ত নিন। আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেব। সকলেই বলেন, আপনি অত্যন্ত নির্ভুল কথা বলেছেন। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিরা বলেন ঃ আপনি আবদুল্লাহ ইবনে খালেদ ইবনে আসীদ এবং মারওয়ানকে টাকা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এ টাকার পরিমাণ ঃ মারওয়ানকে ১৫ হাজার টাকা এবং ইবনে আসীদকে ৫০ হাজার টাকা। তদানুযায়ী তাদের নিকট থেকে উসুল করে বায়তুল মালে ফেরত দেয়া হয় এবং সকলে সন্তুষ্ট হয়ে অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন।"[১৩]

এ সকল বর্ণনা থেকে যে কথাটি জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত ওসমান (রাঃ) আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ সাহায্য দানের ব্যাপারে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তা কিছুতেই শরীয়াত সম্মত সীমা লঙ্ঘন করেনি। তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন, তা রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের খেদমতের বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করে নিজে ব্যবহার না করে প্রিয় জনদের দান করেছেন, অথবা বায়তুল মাল থেকে ঋণ নিয়ে দিয়েছেন যা আদায় করতে তিনি বাধ্য ছিলেন, অথবা নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী তিনি মালে গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করেন, যার জন্য শরীয়াতের কোন বিস্তারিত বিধান ছিল না। স্পষ্ট যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর মতো তিনি আপন আত্মীয়-স্বজনদের পরিবর্তে অন্যান্যদের সাথে এ ধরনের দানশীলতা প্রদর্শন করলে কারোই কিছু করার ছিল না। কিন্তু খলিফা তাঁর বংশের লোকদের ব্যাপারে এহেন দানশীলতা প্রদর্শন অপবাদের কারণ হয়েছে। এ কারণেই হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) নিজেকে সকল সংশয়ের উর্ধে রাখার খাতিরে নিজের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন ; আন্যান্যদের সাথে যে বদান্যতা দেখাতেন আপনজনদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এ সতর্কতা অবলম্বন করতে পরেননি , তাই তিনি অভিযোগের শিকার হয়েছেন।

সন্ত্রাসের কারণ

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাস দেখা দেয়, কোন কারণ ব্যতীতই নিছক সাবাঈদের ষড়যন্ত্রের ফলে তা দেখা দিয়েছে, অথবা তা ছিল ইরাকের অধিবাসীদের সন্ত্রাসবাদিতারই ফল—এমন কথা বলা ইতিহাসের সঠিক অধ্যয়ন নয়। জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির সত্যিই কোন কারণ বিদ্যমান না থাকলে, এবং সত্যিসত্যিই অসন্তুষ্টি বিদ্যমান না থাকলে কোন ষড়যন্ত্রকারীর দল

---

১৩. আত-তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৮২। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭৯। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৪৪।

সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে এবং সাহাবী ও সাহাবী তনয়দেরকে তাদের দলে ভিড়াতে সকল হতো না। আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে হযরত ওসমান (রাঃ) যে কর্মনীতি গ্রহণ করেন, তাতে কেবল সাধারণ লোকদের মধ্যেই নয়, বরং বড় বড় সাহাবীদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেয়—কেবল এ কারণেই তারা দুষ্টামীতে সাফল্য লাভ করেছে। এ থেকেই তারা সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং যে দুর্বল দলটি তারা লাভ করে, তাঁকে নিজেদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত করে। এ কথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা এ ছিদ্র থেকেই তাদের দুষ্টামীর পথ বের করার সুযোগ লাভ করেছে। ইবনে সাআদের বর্ণনা ঃ

وَكَانَ النَّاسُ يَنْقِمُونَ عَلَى عُثْمَانَ تَقْرِيبَهُ مَرْوَانَ وَطَاعَتَهُ لَهُ وَيَرَوْنَ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى عُثْمَانَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَأَنَّ ذَالِكَ عَنْ رَأْيِ مَرْوَانَ دُونَ عُثْمَانَ فَكَانَ النَّاسُ قَدْ شَنِفُوا لِعُثْمَانَ لِمَا كَانَ يَصْنَعُ مَرْوَانَ وَيُقَرِّبُهُ -

—জনগণ হযরত ওসমান (রাঃ)—এর ওপর এ জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি মারওয়ানকে তার আশির্বাদপুষ্ট করে রেখেছিলেন এবং তার কথা মেনে চলতেন. তাদের ধারণা ছিল যে, হযরত ওসমান (রাঃ)—এর বলে যে সকল কাজ চালিয়ে দেয়া হতো হযরত ওসমান (রাঃ) তার অধিকাংশেরই নির্দেশ দেন নি। বরং মারওয়ান তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই নিজের পক্ষ থেকে তা করতেন। এ কারণে মারওয়ানকে আশির্বাদপুষ্ট করায় এবং তাকে এ মর্যাদা দেয়ায় জনগণ আপত্তি করে।[১৪]

ইবনে কাসীর বলেন, কূফা থেকে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধীদের যে প্রতিনিধি দলটি তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ করার জন্য আগমন করে তারা যে বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়, তা ছিল এই ঃ

بَعَثُوا إِلَى عُثْمَانَ مَنْ يُنَاظِرُهُ فِيمَا فَعَلَ وَفِيمَا اعْتَمَدَ مِنْ عَزْلِ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتَوْلِيَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مِنْ أَقْرِبَائِهِ وَأَغْلَظُوا لَهُ فِي الْقَوْلِ وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ

১৪. তাবাকাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৬।

يَعْزِلُ عُمَّالَهُ وَيَسْتَعْمِلُ أَئِمَّةً غَيْرَهُمْ -

—তারা এ ব্যাপারে ওসমান (রাঃ)–এর সাথে বহস করার জন্য কিছু লোককে প্রেরণ করে যে, আপনি অনেক সাহাবীকে পদচ্যুত করে তাদের স্থলে বনী উমাইয়া থেকে আপনার আত্মীয়দেরকে গভর্ণর করেছেন। এ ব্যাপারে তারা হযরত ওসমান (রাঃ)–এর সাথে অত্যন্ত কটূক্তি করে এবং এদেরকে পদচ্যুত করে অন্যদেরকে নিয়োগ করার দাবী জানায়।[১৫]

হাফেয ইবনে কাসীর সামনে অগ্রসর হয়ে আরও লিখেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য তাঁর বিরোধীদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল এই যে ঃ

مَا يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ تَوْلِيَتِهِ أَقْرِبَائَهُ وَذَوِي رَحِمِهِ

وَعَزْلِهِ كِبَارَ الصَّحَابَةِ ، فَدَخَلَ هٰذَا فِي قُلُوبِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ -

—হযরত ওসমান (রাঃ) বড় বড় সাহাবীদেরকে পদচ্যুত করে তার আত্মীয় স্বজনকে গভর্ণর নিয়োগ করায় জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে। অনেক লোকের মনেই এ বিষয়টি স্থান লাভ করেছিল।[১৬]

এ বিপর্যয়কালে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)–এর মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে, তাবারী, ইবনে আসীর, ইবনে কাসীর এবং ইবনে খালদুন তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, মদীনায় যখন সকল দিক থেকে হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে সমালোচনা শুরু হয়, যখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, কতিপয় সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত, আবু আসীদ আস–সায়েদী, কাআব ইবনে মালেক এবং হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রাঃ) ব্যতীত অপর কোন সাহাবী তাঁর সমর্থনে মুখ খোলার মতো ছিল না।[১৭] তখন লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)–কে বলেন, আপনি হযরত ওসমান (রাঃ)–এর সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে আলাপ করুন। তিনি তাঁর খেদমতে উপস্থিত

---

১৫. আল–বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৮।

১৬. আল–বেদায়া, পৃষ্ঠা—১৬৮।

১৭. এ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, মদীনায় যদি এমনি পরিস্থিতি দাঁড়ায় তখন মিসর থেকে আগত সন্ত্রাসীদেরকে বুঝাবার জন্য এবং বিপর্যয় থেকে নিবৃত্ত করার জন্য হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)–কে প্রেরণ করে থাকলে তখন মুহাজের আনসারদের মধ্যে ৩০ জন লোক কি করে তার সাথে চলে যায় ? কিন্তু এ অভিযোগ ঠিক নয়। কারণ, জাতীয় আস্থাভাজন ব্যক্তিদের খলীফার কোন বিশেষ নীতিকে পছন্দ না করা এক কথা আর খলীফার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে দেখে তা প্রতিরোধের চেষ্টা করা ভিন্ন কথা। সমালোচকরা সমালোচনা করতেন সংস্কার–সংশোধনের উদ্দেশ্যে। হযরত ওসমান (রাঃ)–এর সাথে তাদের কোন শত্রুতা ছিল না যে, একটি ষড়যন্ত্রীদলকে তার বিরুদ্ধে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে দেখেও তারা চুপচাপ বসে থাকবে এবং তাদেরকে যা খুশী, করতে দেবে।

হয়ে আপত্তিকর নীতিসমূহ পরিবর্তন করার পরামর্শ দেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি যাদেরকে পদ-মর্যাদা দিয়েছি, ওমর ইবনুল খাত্তাবও তো তাদেরকে নিয়োগ করেছিলেন। তবে লোকেরা আমার ওপর কেন আপত্তি করছে? হযরত আলী (রাঃ) জবাবে বলেন ঃ "ওমর (রাঃ) যাকে কোন স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন, তার সম্পর্কে কোন আপত্তিকর বিষয় তার কানে পৌঁছলে ভালভাবেই তার খবর নিয়ে ছাড়তেন, কিন্তু আপনি তা করেন না। আপনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন।" জবাবে হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন ঃ "তারাতো আপনারও আত্মীয়।" হযরত আলী (রাঃ) জবাব দেন—

إن رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم -

—"সন্দেহ নেই, তাদের সাথে নিকটাত্মীয়র সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু অন্যরা তাদের চেয়েও উত্তম।" হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন ঃ ওমর (রাঃ) কি মুআবিয়া (রাঃ)-কে গভর্ণর নিযুক্ত করেননি? হযরত আলী (রাঃ) জবাব দেন ঃ ওমর (রাঃ)-এর গোলাম ইয়ারফা-ও তাকে ততটা ভয় করতো না, যতটা ভয় করতো মুআবিয়া। আর এখন অবস্থা এই যে, মুআবিয়া আপনাকে জিজ্ঞেস না করেই যা খুশী তা করে বেড়ান, এবং বলে বেড়ান এটা ওসমান (রাঃ)-এর হুকুম। কিন্তু আপনি কিছুই বলেন না।[১৮]

অপর এক উপলক্ষে হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর গৃহে গমন করে আত্মীয়তা নৈকট্যের দোহাই দিয়ে তাঁকে বলেন, আপনি এ বিপর্যয় নিরসনে আমায় সাহায্য করুন। জবাবে তিনি বলেন ঃ "এ সব কিছুই হচ্ছে মারওয়ান ইবনুল হাকাম, সাঈদ ইবনুল আ'স, আবদুল্লাহ ইবনে আমের এবং মুআবিয়া (রাঃ)-এর বদৌলতেই। আপনি এদের কথা শুনেন, আমার কথা শুনেন না।" হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন ঃ "আচ্ছা, এখন আমি তোমার কথা শুনবো।" অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) আনসার মুহাজেরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে ফিরে যেতে রাযী করান।[১৯]

এ বিপর্যয়কালে আর এক উপলক্ষে হযরত আলী (রাঃ) কঠোর অভিযোগ করেন যে, আমি বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করি, কিন্তু মারওয়ান তা পণ্ড করে দেয়। আপনি নিজে রাসূল (স:)-এর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে জনগণকে আশ্বস্ত ও শান্ত করেন। কিন্তু আপনার চলে যাওয়ার পর আপনার দরযায় দাঁড়িয়েই মারওয়ান জনগণকে গালি দেয়। আগুন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।[২০]

---

১৮. আত-তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৭৭; ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭৬। আল-বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৮-১৬৯। ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৪৩।

১৯. তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৯৪। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮১-৮২, ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৪৬।

২০. তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৯৬। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮৩-৮৪। ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৪৭।

হযরত তালহা (রাঃ) হযরত যোবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কেও ইবনে জারীর রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন যে, এঁরাও এ পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।[২১] কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে কোন সন্ত্রাস বা বিদ্রোহ সৃষ্টি হোক বা তাঁতে হত্যার সুযোগ ঘটুক, তা এদের কেউই কখনো কামনা করেন নি। তাবারী হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ)–এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

إنما أردنا أن يستعتب أمير المؤمنين عثمان ولم

نرد قتله فغلب سفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه -

—আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল , আমীরুল মোমেনীন ওসমান (রাঃ)–কে এ নীতি ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা। তাঁকে হত্যা করা হোক, এটা কখনো আমাদের অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু আহাম্মকরা ধৈর্যশীলদের ওপর প্রবল হয়ে পড়ে এবং তারা তাঁকে হত্যা করে।

এ সকল ঘটনা এ কথার অনস্বীকার্য সাক্ষ্য বহন করে যে, আত্মীয়–স্বজনদের ব্যাপারে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর অনুসৃত নীতির ফলে গণমনে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তাই ছিল বিপর্যয় সৃষ্টির

---

২১. তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৭৭, ৪৮৬। এ সব উদ্ধৃতি ভুল বলে জনৈক বন্ধু দাবী করেছেন। উর্দুভাষীরা মূল গ্রন্থ দেখে সত্যিকার বিষয় জানতে পারবে না, সম্ভবত এ ভরসায়ই এ দাবী করা হয়েছে। তাহলেও যাদের আরবী জানা আছে তারা তো মূল গ্রন্থ দেখতে পারেন। ৪৭৭ পৃষ্ঠায় এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন বলেন যে, আল্লার শপথ । আমি হযরত ওসমান (রাঃ)–এর রক্তের প্রতিশোধ দাবী করবো, তখন আব্দ ইবনে উম্মে কেলাব বলেন, আল্লার শপথ ! সকলের আগে তো আপনিই তাঁর বিরোধিতা করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাব দেন ঃ "তারা হযরত ওসমান (রাঃ)–কে তাওবা করিয়ে নেয়, অতঃপর তাঁকে হত্যা করে।" এমনিভাবে ৪৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ) বসরাবাসীদের সম্মুখে ভাষণ দান করেন। এ ভাষণে তিনি বলেন ঃ

إنما أردنا أن يستعتب أمير المؤمنين عثمان ... ...

—আমীরুল মো'মিনীন ওসমান (রাঃ)–কে রাযী করানোই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য..........। এতে লোকেরা হযরত তালহা (রাঃ)–কে বলেন ঃ

يا أبا محمد قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا -

— আবু মুহাম্মদ । আমাদের নিকট তোমার পত্র রয়েছে। তাতে তো এ উদ্দেশ্যের উল্লেখ নেই। হযরত যুবায়ের (রাঃ)–এর জবাবে বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)–এর ব্যাপারে তোমাদের কাছে কি কখনো আমার চিঠি এসেছে? ইবনে খালদুনও এ সব ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট—১৫৪–১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মূল কারণ। আর এ অসন্তোষই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী—বিপর্যয়কারীদের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আমি একাই কেবল এ কথা বলছি না, বরং ইতিপূর্বে অনেক সত্যসন্ধানী এ কথা বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ৭ম শতকের শাফেয়ী ফকীহ এবং মুহাদ্দেস হাফেজ মুহেব্বুদ্দীন আত–তাবারী হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাহাদাতের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যেবের এ উক্তি উদ্ধৃত করেন :

لما ولي عثمان كره ولايته نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عثمان كان يحب قومه، فولي اثنتي عشرة حجة، وكان كثيرا ما يولي بني امية ممن لم يكن له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجيء من امرائه ما ينكره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان يستغاث عليهم فلا يغيثهم - فلما كان في الستة الحجج الاواخر استأثر بني عمه فولاهم وامرهم ...

হযরত ওসমান (রাঃ) শাসনকর্তা হলে সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক তাঁর ক্ষমতাসীন হওয়াকে না–পছন্দ করেন ; কারণ, তিনি আপন কবীলার লোকদেরকে ভাল বাসতেন। তিনি ১২ বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি বারবার বনী উমাইয়ার এমন সব লোকদেরকে সরকারী পদে নিয়োগ করেন, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সান্নিধ্য লাভ করেনি। তাঁর নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা এমন সব কাণ্ড সংঘটিত হতো, রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাহাবীরা যা পছন্দ করতেন না। তাঁর নিকট তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো— কিন্তু তিনি এ সব অভিযোগের প্রতিকার করতেন না। তাঁর শাসনকালের শেষ ৬ বছরে তিনি তাঁর বংশের লোকদেরকে বিশেষ অগ্রাধিকার দান করেন এবং তাদেরকে শাসন–কর্তৃত্বের পদে নিয়োগ করেন।[২২]

হাফেয ইবনে হাজারও হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাহাদাতের কারণে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথাই বলেছেন :

---

২২. আর–রিয়াযুন নাযেরা ফী মানাকিবিল আশারাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৪।

وكان سبب قتله ان امراء الامصار كانوا من اقاربه ، كان بالشام كلها معاوية ـ وبالبصرة سعيد بن العاص ، وبمصر عبد الله بن سعد بن ابى سرح ، وبخراسان عبد الله بن عامر وكان من حج منهم يشكوا من اميره ، وكان عثمان لين العريكة كثير الاحسان والحلم ـ وكان يستبدل ببعض امرائه ليرضيهم ثم يعيده بعد ـ

—তাঁর হত্যার কারণ ছিল এই যে, বড় বড় অঞ্চলের শাসকরা ছিল তাঁরই নিকটাত্মীয়। গোটা শাম ছিল হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর অধীনে। বসরায় ছিলেন সাঈদ ইবনুল আ'স, মিসরে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবি সারাহ, খোরাসানে আবদুল্লাহ ইবনে আমের। এ সকল অঞ্চল থেকে হজ্জে আগত ব্যক্তিরা তাদের আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো ; কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন কোমল স্বভাব, অতি দয়ালু এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তি। কোন আমীরকে তিনি বদলী করে জনগণকে খুশী করতেন এবং পরে আবার তাদেরকে নিয়োগ করতেন[২৩]

মাওলানা আনওয়ার শাহ্ সাহেব বলেন ঃ

ثم ان سبب تهيج هذه الفتن ان امير المؤمنين عثمان رضى الله عنه كان يستعمل اقاربه وكان بعضهم لا يحسنون العمل ، فقدح الناس فيهم وبلغوا امرهم

২৩. আল–এছাবা ফি তামঈযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৫৫—৪৫৬।

إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ وَظَنَّ أَنَّهُمْ
يُغْرُونَ بِأَقَارِبِهِ بِلَا سَبَبٍ وَلَعَلَّهُمْ لَا يَطِيبُ بِأَنْفُسِهِمْ تَوْلِيَةُ
أَقَارِبِهِ فَيَشُونَ بِهِ .... ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ وَإِنْ لَمْ يَعْزِلْ
أَقَارِبَهُ مِنْ أَجْلِ شِكَايَاتِ النَّاسِ لَكِنَّهُ لَمْ يَحْمِهِمْ أَيْضًا ـ

—আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে সরকারী পদে নিয়োগ করেন। এটা এ সকল বিপর্যয় তীব্র হওয়ার কারণ। এদের কারো কারো কর্মধারা ভাল ছিল না। এতে লোকেরা আপত্তি জানায় এবং তাদের বিরুদ্ধে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে। কিন্তু তিনি তাকে সত্য বলে মনে করেননি। বরং তিনি মনে করেন যে, এরা আমার আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে শুধু শুধু ক্ষিপ্ত হচ্ছে। সম্ভবত এরা আমার আত্মীয়দেরকে নিয়োগে সন্তুষ্ট নয়, তাই এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে।........হযরত ওসমান (রাঃ) জনগণের আপত্তির মুখে তাঁর আত্মীয়দেরকে পদচ্যুত না করলেও তিনি তাদের সমর্থনও করেননি।[২৪]

হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহদাতের পর যে পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রাঃ)- কে খলীফা মনোনীত করা হয়, তা কারো অজানা নয়। বাইরে থেকে আগত ২ হাযার সন্ত্রাসবাদী রাজধানী অবরোধ করে রেখেছে। তারা খলীফাকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। স্বয়ং রাজধানীতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক তাদের সমমনা ছিল। নতুন খলীফা নির্বাচনে তারা নিঃসন্দেহে অংশ নিয়েছে, এমনসব বর্ণনাও নিঃসন্দেহে বর্তমান রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করা হলে এরা কাউকে কাউকে বায়আত গ্রহণে জোর করে বাধ্য করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ নির্বাচন কি ভুল ছিল? কেবল মদীনায় নয়, গোটা মুসলিম জাহানে তখন এমন কেউ কি বর্তমান ছিলেন, যাকে খলীফা নিযুক্ত করা উচিত ছিল?[২৫] তখনকার প্রচলিত এবং সর্বসম্মত ইসলামী রীতি অনুযায়ী হযরত আলী

---

২৪. ফয়যুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২২২, মজলিসে ইলমী ঢাভিল, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৮ ইসায়ী।

২৫. জনৈক বন্ধু দাবী করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন না, খেলাফতের জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হবে-এমন মর্যাদাও তাঁর ছিল না। কিন্তু আজকের দিনের কোন ব্যক্তি এর সঠিক ফায়সালা করতে পারে না। বরং সে যুগের লোকেরাই এর সঠিক ফায়সালা করতে পারবেন। এ ব্যাপারে তাদের মতামত কি ছিল, তা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর শুরার সদস্যরা যখন খলীফা নির্বাচনের

(রাঃ) কি বৈধ খলীফা নির্বাচিত হননি? নতুন খলিফা নির্বাচনে সাবেক খলীফার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীরাও যদি অংশ নেয়, তবে তার নির্বাচন অবৈধ হবে—ইসলামী সংবিধানে কোথাও কি এমন কিছু পাওয়া যায়?[২৬] এক খলীফা শহীদ হয়েছেন, তাঁর স্থলে যথাশীঘ্র সম্ভব অপর খলীফা নিযুক্ত না করে মুসিলম জাহান দীর্ঘদিন খলীফা বিহীন থাকবে—এটাই কি সঠিক-নির্ভুল ছিল? এমনটিই কি হওয়া উচিত ছিল? যদি এ কথা স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, হযরত আলী (রাঃ) জেনে শোনেই হযরত ওসমানের হন্তাদের গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনায় শৈথিল্য করছিলেন অথবা তিনি তাদের সামনে অক্ষম ছিলেন, তাহলেও ইসলামী আইন এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এটা কি তাঁর খেলাফতকে না-জায়েয অবৈধ এবং তাঁর বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে দাঁড়ানো বৈধ করার জন্য যথেষ্ট? এ সবই হচ্ছে মৌলিক প্রশ্ন। পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সঠিক নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রশ্নের গুরুত্ব অপরসীম।

কেউ এ সকল প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দিতে চাইলে তাকে তার দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু প্রথম শতক থেকে আজ পর্যন্ত সকল আহলে সুন্নাহ সর্বসম্মতভাবে হযরত আলী (রাঃ)-কে

ব্যাপারটি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর ওপর ন্যস্ত করেন এবং তিনি মদীনায় জনমত যাঁচাই করেন, তখনই তা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হাফেযইবনে কাসীর লিখেন ঃ

অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) লোকদের সাথে পরামর্শ এবং সাধারণ মুসলমানদের মতামত যাচাইয়ের জন্য বেরিয়ে পড়েন। তিনি প্রকাশ্যে এবং গোপনে, একক এবং সমবেতভাবে জনগণের নেতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মতামত যাচাই করতে থাকেন। এমনকি, তিনি পর্দানশীল মহিলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছাত্র এবং মদীনায় বহিরাগতদেরকেও জিজ্ঞেস করেন। তিন রাত তিন দিন তিনি এ কাজে ব্যস্ত ছিলেন।........................ অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলেন ঃ আমি আপনাদের উভয়ের ব্যাপারে জনগণের মতামত যাচাই করেছি। অন্য কাউকে আপনাদের দু'জনের সমান মনে করে, এমন কাউকে আমি দেখতে পাইনি।...এরপর তিনি (মসজিদে নববীর সমাবেশে ভাষণদান প্রসঙ্গে) বলেন ঃ বন্ধুগণ! আমি প্রকাশ্যে এবং গোপনে আপনাদের মতামত যাচাই করেছি। আপনাদের কেউ অপর কাউকে এদের সমান মনে করেন—এমন কাউকে আমি পাইনি।—আল-বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৪৬।

এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতিই জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

২৬. বিপর্যয় বা বিরোধকালে খলিফা নির্বাচন জায়েয নয় কেবল মুতাযিলারাই এ মত পোষণ করতো। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের যুগের আহলে সুন্নার কিছু সংখ্যক আলেম হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেছেন, কারণ তা সংঘটিত হয়েছিল বিপর্যয়কালে। অবশ্য এ ব্যাপারে আহলে সুন্নার দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পরে আলোচনা করবো হেদায়া, ফাতহুল কাদীর এবং শরহে ফিকাহ আকবরের উদ্ধৃতি দিয়ে ইতিপূর্বে কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবীর আহকামুলকুরআনের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা স্বীকার করে আসছেন। স্বয়ং আমাদের দেশেও প্রতি শুক্রবার যথারীতি তার খেলাফতের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। অল্প-বিস্তর হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত কালেও এ পরিস্থিতি ছিল। কেবল শাম প্রদেশ বাদ দিয়ে জাযিরাতুল আরব এবং বাইরের গোটা মুসলিম জাহানে তাঁর খেলাফত স্বীকৃতি লাভ করে। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা কার্যত তাঁর খেলাফতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উম্মতের বিপুল সংখ্যাধিক্য তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। আমি যতদূর অনুসন্ধান করতে পেরেছি, হযরত ওসমান (রাঃ)- এর পর হযরত আলী (রাঃ)-কে চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদ স্বীকার করেনি, এমন একজন আলেমও ছিলেন না। এমন কোন আলেমও ছিলেন না, যিনি তাঁর বায়আতের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বরং হানাফী মাযহাবের আলেমরা তো তাঁর খেলাফত স্বীকার করে নেয়াকে আহলে সুন্নার অন্যতম আকীদা বলে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে আলোচ্য গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে শারহুত তাহাবিয়ার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। এটাও সত্য যে, সকল মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং ফকীহ জামাল, সিফফীন খারেজীদের বিরুদ্ধে হযরত আলী—(রাঃ)-এর সংঘটিত যুদ্ধকে কুরআন মজীদের আয়াত—

فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى

حتى تفيء الى امر الله -

(একদল যদি অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তোমরা বাড়াবাড়িকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তা আল্লার নির্দেশ পূর্ণ করে দেয়) অনুযায়ী হযরত আলী (রাঃ)-এর যুদ্ধকে ন্যায়ানুগ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ, তাদের মতে তিনি ছিলেন সত্য-সঠিক ইমাম। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জায়েয নয়। এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন এমন একজন ফকীহ, মুহাদ্দিস বা মুফাসসিরের নাম আমার জানা নেই। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের আলেমরা তো ঐকমত্য হয়ে বলেছেন যে, এ সকল যুদ্ধেই হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন সত্যাশ্রয়ী। আর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীরা ছিল বিদ্রোহী। উদাহরণ স্বরূপ হেদায়া গ্রন্থ রচয়িতার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি লক্ষণীয়ঃ

ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز التقلد

من السلطان العادل لان الصحابة رضى الله عنهم تقلدوه

من معاوية رضى الله عنه والحق كان بيد على رضى الله

عنه فى نوبته -

—অত্যাচারী শাসকের পক্ষ থেকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করা জায়েয, যেমন জায়েয ন্যায়-পরায়ণ শাসকের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তাঁর খেলাফতের সুযোগ লাভের পর হক ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে।[২৭]

আল্লামা ইবনে হুমাম এ উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'ফাতহুল কাদীর'-এ লিখেন ঃ

এটা হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর অন্যায়ের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। আর এর অর্থ আদালতের ফায়সালায় তাঁর অবিচার নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে তাঁর বিদ্রোহ।..............আসল কথা এই যে, সত্য হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিল। কারণ, তাঁর পালা আসার পর তিনি সঠিক বায়আতক্রমে খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর তাঁর খেলাফত গৃহীত হয়েছিল। সুতরাং জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে এবং সিফ্‌ফীন ময়দানে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি ছিলেন সত্যের পক্ষে। উপরন্তু, 'তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে'—হযরত আম্মার (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লা (সঃ)-এর উক্তি এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ কবে যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর সঙ্গীরা বিদ্রোহী ছিল। কারণ, হযরত আম্মার (রাঃ)-কে তারাই হত্যা করেছিল।[২৮]

মোল্লা আলী কারী হানাফী দৃষ্টিকোণের প্রতিনিধিত্ব করে 'ফিকাহে আকবার'-এর ভাষ্য হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণটাই দেখার মতো। তিনি লিখেন ঃ

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর বড় বড় মুহাজের-আনসাররা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নিকট সমবেত হয়ে খেলাফত গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান এবং তাঁরা তাঁর হাতে বায়আত করেন। কারণ, সমকালীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম এবং খেলাফতের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তিনি যে সবচেয়ে হকদার ছিলেন—এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। অবশ্য সাহাবা (রাঃ)-দের একদল তাঁর সাহায্য-সহায়তা থেকে বিরত থাকে। সাহাবা (রাঃ)-দের একদল জামাল এবং সিফ্‌ফীন যুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু এটা তাঁর খেলাফত শুদ্ধ না হওয়ার কোন দলীল নয়।..................রাসূলুল্লা (সঃ)-এর একটি মশহুর হাদীস—

اَلْخِلَافَةُ بَعْدِىْ ثَلٰثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يَصِيْرُ مُلْكًا عَضُوْضًا ـ

(আমার পর ৩০ বছর খেলাফত থাকবে, এরপর রক্তক্ষয়ী বাদশাহীর সূচনা হবে)—এ হাদীসটি তাঁর খেলাফতের বিশুদ্ধতার অন্যতম প্রমাণ। আর এটা সত্য যে, রাসূলুল্লা (সঃ)-এর ওফাতের ৩০ বছরের সূচনায় হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হয়েছেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লা (সঃ)-এর উক্তি ঃ

تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

২৭. হেদায়া, আদাবুল কাযী অধ্যায়।

২৮. ফতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৬১, মিসর ১৩১৬ হিজরী।

একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে—হযরত আলী (রাঃ)–এর ইজতিহাদের নির্ভুলতা এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)–এর উদ্দেশ্যের ভ্রান্তি প্রমাণ করে।......................এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মুআবিয়া (রাঃ) এবং তৎপরবর্তীরা খলীফা ছিলেন না, ছিলেন রাজা–বাদশাহ।

সামনে অগ্রসর হয়ে মোল্লা আলী কারী আরও লিখেন ঃ

উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা খেলাফত সংগঠনের শর্তের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং উম্মাতের কিছুসংখ্যক সাধু সজ্জন ব্যক্তি এ পদের কোন যোগ্য লোকের ওপর খেলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত করলে তা সংঘটিত হয়। এরপর তার বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই। এ জন্য ঐকমত্যের শর্ত আরোপের কোন কারণ নেই। কারণ, এ শর্ত আরোপের ফলে আশংকা দাঁড়ায় যে, ইমাম নিযুক্তির প্রয়োজন দেখা দিলে তাতে বিলম্ব ঘটতে পারে। তাছাড়া খলীফা নিযুক্তি এবং বায়আতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঐকমত্যকে কখনো শর্ত মনে করেননি।.........................যারা বলে যে, হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ) বাধ্য হয়ে বায়আত করেছিলেন এবং তাঁরা বলেছিলেন ঃ আমাদের হস্ত আলী (রাঃ)–এর বায়আত করেছিল কিন্তু আমাদের অন্তর তাঁর বায়আত করেনি, এ থেকে তাদের এ উক্তির অসারতাও প্রতিপন্ন হয়। এমনি করে তাদের এ উক্তিও অসার প্রতিপন্ন হয় যে, হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ), সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) এবং আরও অনেকে আলী (রাঃ)–এর সাহায্য থেকে বিরত থাকেন এবং তাঁর আনুগত্য করেননি। তাঁদের এ উক্তি এ জন্য বাতেল যে, এদের বায়আত ছাড়াও হযরত আলী (রাঃ)–এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাকী থাকে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যাকারীদেরকে হত্যা করেননি। এর কারণ ছিল এই যে, তারা নিছক হত্যাকারী ছিলো না, বরং তারা বিদ্রোহীও ছিল। বিদ্রোহী তাকে বলে যার কাছে শক্তি থাকে এবং থাকে বিদ্রোহের বৈধতার ব্যাখ্যাও। তাদের শক্তিও ছিল এবং ব্যাখ্যাও ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)–এর কোন কোন কার্য সম্পর্কে তাদের আপত্তি ছিল এবং এ কারণে তারা তাদের বিদ্রোহকে হালাল বা বৈধ মনে করতো। শরীয়াতে এ ধরনের বিদ্রোহীদের বিধান এই যে, তারা ইমাম এবং ন্যায়পরায়ণদের আনুগত্য স্বীকার করে নিলে ইতিপূর্বে সত্য ও ন্যায়পরায়ণদের জান–মালের যে ক্ষতি সাধন করেছে ; তার জন্য শাস্তি দেয়া হবে না। এ কারণে তাদেরকে হত্যা করা বা হত্যার প্রতিশোধের (কেসাস) কাছে তাদেরকে সোপর্দ করা হযরত আলী (রাঃ)–এর ওপর ওয়াযেব ছিল না। যে সকল ফকীহদের মতে এমন বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করা ওয়াযেব তারাও বলেন যে, ইমামের উচিত তাদেরকে তখন গ্রেফতার করা, যখন তাদের শক্তি খর্ব হয় তাদের ক্ষমতার দর্প চূর্ণ হয়, পুনরায় বিপর্যয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না— এ ব্যাপারে ইমাম নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হন। হযরত আলী (রাঃ) এ সবের কোন একটিও লাভ করেননি। বিদ্রোহীদের প্রভাব–প্রতিপত্তি ছিল অবশিষ্ট এবং স্পষ্ট। তাদের প্রতিরোধ–প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা ছিল অটুট এবং অব্যাহত। তাদের যথারীতি এ প্রতিজ্ঞাও ছিল যে, যে কেউ তাদের নিকট হযরত ওসমান (রাঃ)–এর রক্তের প্রতিশোধ দাবী করবে, তারা তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এ ব্যাপারে হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ)–এর কর্মপন্থা (যা জামাল যুদ্ধের কারণ হয়েছিল) ছিল ভুল। যদিও তাঁরা যা কিছু করেছেন, ইজতিহাদের ভিত্তিতেই করেছিলেন। এবং তাঁরা ইজতিহাদের যোগ্য ছিলেন।................এবং পরে উভয়ে তাঁদের কাজের জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)–তাঁর কাজের জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন। আর এ জন্য তিনি এত কাঁদতেন যে, তাঁর দোপাট্টার আঁচল সিক্ত হয়ে যেতো। আর মুআবিয়া (রাঃ)

-ও ভুল করেছিলেন। অবশ্য তিনি যা কিছু করেছিলেন তা করেছিলেন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। এ কারণে সে ভুলের জন্য তিনি ফাসেক হননি। তাঁকে বিদ্রোহী বলে অভিহিত করা যায় কিনা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ এ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তাদের কথাই সত্য, যারা তাঁর সম্পর্কে এ শব্দটি প্রয়োগ করেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ হযরত আম্মার (রাঃ)-কে বলেছিলেন, একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।[২৯]

এ আলোচনা থেকে গোটা শরীয়াত ভিত্তিক পজিশন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত এবং তাঁর বিরোধীদের ব্যাপারে আহলে সুন্নার সত্যিকার মত এবং পথও জানা যায়। হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতে সন্দিগ্ধ ছিল, অপ্রমাণিত আর তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য শরীয়াতের অনুমতির অবকাশও আছে—এ দাবীর জন্য বিপুল প্রমাণ আবশ্যক। বিশেষ করে যারা একদিকে ইয়াযীদের খেলাফতকে সত্য এবং হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তৎপর এবং অন্যদিকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে সাফাই পেশ করার জন্য আদা-নুন খেয়ে লেগেছেন, তাদের এ কাণ্ড দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। অথচ যেসব প্রমাণ দ্বারা ইয়াযীদের খেলাফত সত্য প্রমাণ করা হয়, তার তুলনায় হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফত নির্ভুলভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার প্রতিশোধের জন্য যারা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, তাঁদের এ কাজের সপক্ষে কোন শরীয়াত সম্মত প্রমাণ পেশ করা যায় না। আল্লার শরীয়াত অটুট। কারো মর্যাদার বিচার করে ভুলকে সত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করার কোন অবকাশ নেই।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের ব্যাপার

শরীয়াতের বিধান সম্পর্কে আমি যতটুকু চিন্তা-ভাবনা করেছি, তার ভিত্তিতে আমার মতে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের একটি মাত্র শরীয়াত সম্মত উপায় ছিল। তা ছিল এই যে, সমকালীন খলীফার খেলাফত স্বীকার করে নিয়ে তার নিকট দাবী জানান যে, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং এ বিরাট অপরাধে যাঁর যতটুকু অংশ ছিল, সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তা নির্ণীত করে আইন অনুযায়ী তার শাস্তি বিধান করবেন। অপর দিকে তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি যতটুকু অধ্যয়ন করেছি, তার ভিত্তিতে আমি মনে করি যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে সকলের সহযোগিতা এবং তাঁকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দেয়া ছাড়া এ আইনানুগ ব্যবস্থা কার্যতঃ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা ষড়যন্ত্র করে মদীনায় হামলা চালিয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ২ হাযারের কাছাকাছি। স্বয়ং মদীনায়ও তাদের কিছু সংখ্যক সমর্থক বর্তমান ছিল। মিসর, বসরা এবং কূফায়ও তাদের পেছনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উপস্থিত ছিল। সকল সত্যসন্ধানী ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-এর পাশে সমবেত হলে এবং তার সাথে সহযোগিতা করলে তিনি এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে তাদের দিকে হাত বাড়াতে পারতেন। কিন্তু একদিকে যখন প্রভাবশালী সাহাবী (রাঃ)-দের একটি অংশ পক্ষপাতহীনের ভূমিকা গ্রহণ করে অপরদিকে বসরা এবং শাম এ শক্তিশালী সেনাবাহিনী হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়, তখন তাঁর জন্য এদের ওপর হস্ত প্রসারিত করাই কেবল অসম্ভব হয়ে ওঠেনি, বরং শক্তিশালী

২৯. ফিকহে আকবার-এর ভাষ্য, পৃষ্ঠা—৮৮-৮৯।

বাহিনীর বিরুদ্ধে যাদের কাছ থেকেই সাহায্য লাভ করা যায়, তা গ্রহণ করতে তিনি কার্যত বাধ্য হন, বাধ্য হন হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যাকারীদের দলের সাথে তৃতীয় একটি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়তে। আমার এ মতের সাথে কেউ যদি দ্বিমত হন তাহলে বলুন হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শক্তিশালী হত্যাকারীর দলকে কখন পাকড়াও করতেন? খেলাফতের দায়িত্ব তার গ্রহণের পরপরই? না জামাল যুদ্ধের সময়ে? না সিফ্‌ফীন যুদ্ধ কালে? না সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পর এমন সময়ে যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের এক একটি প্রদেশকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলেন আর অপর দিকে খারেজীরা তাঁর বিরুদ্ধে কাতার বন্দী হয়েছিল?

ইজতিহাদী ভুল কি আর ভুল নয়?

উপরে আমি যা কিছু আরয করেছি, তা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যারা যুগের খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, তাদের এ কাজ শরীয়াতের দৃষ্টিতে বৈধ ছিল না, কৌশলের দিক থেকেও ছিল ভুল।

এ কথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই যে, তাঁরা এ কাজ করেছিলেন সদুদ্দেশ্যে নিজেদেরকে সত্যাশ্রয়ী মনে করে। কিন্তু আমি একে নিছক ভুল মনে করি, এটাকে ইজতিহাদী ভুল বলে স্বীকার করতে আমার ভীষণ দ্বিধা–দ্বন্দ্ব রয়েছে।

আমার মতে যে মতামতের ব্যাপারে শরীয়াতে কোন অবকাশ পাওয়া যায়, কেবল তার সম্পর্কেই ইজতিহাদ প্রযোজ্য। যে মতামতের সপক্ষে শরীয়াতের কোন যুক্তি–প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু তা সত্য সঠিক নয়, অথবা একান্ত দুর্বল, কেবল তাকেই আমরা ইজতিহাদী ভুল বলে অভিহিত করতে পারি। হযরত আলী (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের বৈধতার কোন দুর্বলতম অবকাশও শরীয়াতে থেকে থাকলে তা কি ছিল, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অনুগ্রহ করে বলুন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ)—উভয়েই জামাল যুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে তাদের ভুল স্বীকার করে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে দাঁড়ান। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) পরে তাঁর ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সর্বদা নিজেকে সত্যাশ্রয়ী মনে করতেন। কিন্তু তাঁর যুদ্ধের জন্য বৈধতার যুক্তিযুক্ত অবকাশ কোন্ বিষয়টিকে করা যেতে পারে। নূতন খলীফা একজন গভর্ণরকে পদচ্যুত করেছেন, এটা? না, নূতন খলীফা সাবেক খলীফার হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করা? না নূতন খলীফার ওপর সাবেক খলীফার হত্যাকারীদের প্রভাব বিস্তার? না, একটা প্রদেশের গবর্ণরের মতে নূতন খলীফার খেলাফত আইনানুগ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া? অথচ কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রদেশে তাঁর খেলাফত স্বীকৃত হয় এবং কার্যতঃ তা প্রতিষ্ঠিতও ছিল। এর কোন একটিকেও যুগের খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের বৈধ কারণ বলে অভিহিত করার কোন দূরতম অবকাশও যদি শরীয়াতে থাকে, তবে তা উল্লেখ করা হোক।

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ـ

এ ক্ষেত্রে হযরত মুআবিয়া (রাঃ এ আয়াত দ্বারা যে যুক্তি পেশ করেছেন তা ছিল সর্বতোভাবে ভুল। কারণ, এ আয়াতের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, যুগের খলিফা হত্যাকারীদের গ্রেফতার না করলে নিহত ব্যক্তির ওলী অভিভাবকরা খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার লাভ করবে। তা ছাড়া হযরত মুআবিয়া (রাঃ) নিহত ব্যক্তির শরীয়াত সম্মত ওলী ছিলেন না। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তিনি নিহত ব্যক্তির ওলী ছিলেন, তা হলেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের কোন অধিকার আদৌ ছিল না।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর ব্যাপারেও একই অবস্থা দাঁড়ায়। সিফ্‌ফীন যুদ্ধে বর্শা ফলকে কুরআন উত্তোলনের প্রস্তাব এবং দুমাতুল জান্দাল-এ সালিসির বিবরণী সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা দেখে এ কথা বলা ছাড়া উপায় নেই যে, এটা ছিল নিছক 'ভুল'। এটাকে ইজতিহাদী ভুল বলে অভিহিত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না।

ইবনে সাআদ ইমাম যুহরীর বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, সিফ্‌ফীন যুদ্ধে লড়াই যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, জনগণের সাহস যখন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম, তখন হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে বলেন ঃ

هَلْ أَنْتَ مُطِيعِي فَتَأْمُرَ رِجَالًا بِنَشْرِ الْمَصَاحِفِ ثُمَّ يَقُولُونَ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نَدْعُوكُمْ إِلَى الْقُرْآنِ - وَإِلَى مَا فِي فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ ذَالِكَ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَلَا يَزِيدُ ذَالِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشَّامِ إِلَّا اسْتِجْمَاعًا عَلَى طَاعَةٍ -

—আপনি আমার কথা মানলে জনগণকে নির্দেশ দিন যে, তারা যেন কুরআন খুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে যে, ইরাকবাসীরা ! আমরা তোমাদেরকে কুরআনের প্রতি আহ্বান জানাই। আলহামদু থেকে ওয়ান-নাস পর্যন্ত এতে যা কিছু রয়েছে, তদনুযায়ী ফায়সালা হোক। আপনি এ কাজটি করলে ইরাকবাসীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি হবে, আর শামবাসীদের ঐক্য অটুট থাকবে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৩০]

এ কথাই আরও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, ইবনে আসীর এবং ইবনে খালদুন। এদের সকলের সর্বসম্মত বর্ণনা এই যে, হযরত আমর (রাঃ) কুরআনকে হাকাম (সালিস) করার প্রস্তাব পেশকালে এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলেন ঃ "এর ফল হয় এ দাঁড়াবে যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর বাহিনীতে ভাঙ্গন দেখা দেবে, অথবা তাদের সকলে এটা স্বীকার করে নিলে

৩০. তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫৫।

কিছু দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখার সুযোগ লাভ করবো আমরা।'[৩১] এ ছাড়া কুরআন উত্তোলনের অপর কোন উদ্দেশ্য যতদূর আমার জানা আছে, কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেননি। আর এ সর্বসম্মত বর্ণনা থেকে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মূলত এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কুরআনের ভিত্তিতে ফায়সালা করানো ছিল না। বরং এটাকে পেশ করা হয়েছিল নিছক যুদ্ধের চালবাযী হিসেবে। সত্যি কি এটাকে 'ইজতিহাদ' নামে অভিহিত করা যায়।

অতঃপর দুমাতুল জান্দাল-এ তাহকীম উপলক্ষে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তাবাকাত-ই ইবনে সাআ'দ, তারীখে তাবারী, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ইবনে আসীর এবং ইবনে খালদুনের সর্বসম্মত বর্ণনা এই যে, হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) এবং আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর মধ্যে একান্তে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, হযরত আবু মূসা (রাঃ) সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তা-ই ঘোষণা করেন। আর হযরত আমর (রাঃ) এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ফায়সালা করেন।[৩২] এ বিবরণী পাঠ করে কোন্ ইনসাফ প্রিয় ব্যক্তি এ কথা বলতে পারে যে, এটা 'ইজতিহাদ' ছিল?

ইয়াযীদের উত্তরাধিকারীর প্রসঙ্গ

যে যুক্তি দেখিয়ে ইয়াযীদের উত্তরাধিকারীকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, তা দেখে আমার সবচেয়ে বিস্ময় হয়। কোন কোন বন্ধু এ কথা স্বীকার করেন যে, এর ফল হয়েছিল খারাপ। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) তার জীবদ্দশায় ইয়াযীদকে উত্তরাধিকার না করলে তাঁর পরে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হতো, রোম সম্রাট হামলা চালাতো এবং ইসলামী রাষ্ট্রেরই অবসান ঘটতো। এ কারণে ইয়াযীদকে উত্তরাধিকার করার ফলে যে কুফল দেখা দিয়েছে, তা সে সকল কুফলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম খারাপ। আমি জিজ্ঞেস করি, সত্যিই যদি তাঁর উদ্দেশ্য এই থাকে, যে তাঁর পরে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে উম্মাতের মধ্যে গৃহযুদ্ধ না ঘটুক, আর এ জন্য তাঁর জীবদ্দশায়ই উত্তরাধিকারের বায়আত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাই তিনি অনুভব করে থাকেন, তবে কি তিনি এ পবিত্র উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন না? তিনি কি অবশিষ্ট সাহাবী এবং বড় বড় তাবেয়ীদের সমবেত করে তাদেরকে বলতে পারতেন না যে, আমার উত্তরাধিকারের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমার জীবদ্দশায়ই বাছাই করে নিন। তিনি তাঁদের নির্বাচিত ব্যক্তির সম্পর্কে বায়আত গ্রহণ করতে পারতেন না? এ কর্মপন্থা গ্রহণে কি বাধা ছিল? হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এ পথ অবলম্বন করলে আপনি কি মনে করেন যে, তারপরও গৃহযুদ্ধ দেখা দিতো? তারপরও কি রোম সম্রাট হানা দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অবসান ঘটাতো?

---

৩১. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৪। আল-বেদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৭২। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬০। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭৪।

৩২ তাবাকাতে, ইবনে সাআ'দ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫৬, ২৫৭। তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৯-৫২ ; আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৮১-২৮৩। ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৭-১৬৮। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—১৭৮।

হযরত আলী (রাঃ)–এর অহেতুক ওকালতীর অভিযোগ

সমালোচক বন্ধুরা আমার প্রতি এ সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে, আমি হযরত আলী (রাঃ)–এর পক্ষে অহেতুক ওকালতী করছি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে আমার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি আমি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, তাঁদের কোন বাক্য বা কর্ম বাহ্যত ভুল মনে হলে তাঁদের নিজস্ব কোন উক্তি বা তৎকালীন পরিবেশ–পরিস্থিতি অথবা তাঁদের সামগ্রিক কর্মধারায় তার সঠিক সমাধান খুঁজে বের করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করতে হবে। আর তার স্বপক্ষে এমন সব যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করতে হবে, যা অহেতুক এবং নিকৃষ্ট ওকালতীর সীমায় না পৌঁছে। সাইয়্যেদেনা হযরত আলী (রাঃ)–এর ব্যাপারে রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ডে হযরত আলী (রাঃ)–এর খেলাফতের 'পদ প্রার্থনা' বিষয়ে এবং বক্ষমান নিবন্ধে আমি যে পন্থা অবলম্বন করেছি, তা মূলত এ নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ; কোন অহেতুক ওকালতি নয়, আমাকে যার জন্য দোষারোপ করা হচ্ছে। আমি যখন দেখি যে, সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)–এর গোটা খেলাফতকালে তাঁরা যে নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার সাথে খলীফাত্রয়ের সহযোগিতা করেছেন, এবং তাঁদের মধ্যে যে প্রীতি–ভালোবাসা সম্পর্ক ছিল, হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)–এর ইন্তেকালের পর তাঁরা যেভাবে প্রাণ খুলে তাঁদের প্রশংসা করেছেন, তখন সে সব বর্ণনা আমার কাছে দুর্বল মনে হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, তাঁরা এদের প্রত্যেকের খলীফা নির্বাচনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমার নিকট সে সব বর্ণনা অধিক শক্তিশালী বলে মনে হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, তাঁরা প্রত্যেকেই শুরুতেই মনে প্রাণে খেলাফত গ্রহণ করেছিলেন। যখন উভয় পক্ষের বর্ণনা বিদ্যমান, এবং সনদের সাথে বর্ণিত, তখন আমরা কেন সেসব বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেবো না, যা তাঁদের সামগ্রিক কর্মধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেন শুধু শুধু সে সব বর্ণনা গ্রহণ করবো, যা তার পরিপন্থী প্রতীয়মান হয়? এমনি করে হযরত ওসমান (রাঃ) –এর শাহাদাত থেকে শুরু করে তাঁর (আলী) নিজের শাহাদাত পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর যে কর্মধারা ছিল, তার প্রতিটি খণ্ড চিত্রের একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আমি সন্ধান করেছি, এবং তাঁর নিজস্ব বর্ণনা, তৎকালীন পরিবেশ–পরিস্থিতি এবং ঘটনা প্রবাহের মধ্যে আমি তা খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু মালেক আল–আশতার এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবুবকর গভর্ণরের পদে নিয়োগ করার ব্যাপারটি এমন মালেক আল–আশতার এবং মুহাম্মদ ইবনে আবুবকরকে গভর্ণরের পদে নিয়োগ করার ব্যাপারটি এমন ছিল, যাকে কোন ব্যাখ্যায়ই সত্যাশ্রয়ী বলে মনে করার কোন অবকাশ আমি খুঁজে পাইনি। এ কারণে কার্যের সমর্থনে আমি আমার অক্ষমতা প্রকাশ করেছি।

কোন কোন বন্ধু বারবার এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ)–এর মতো হযরত আলী (রাঃ)–ও তো তাঁর খেলাফত কালে আত্মীয়–স্বজনকে বড় বড় পদ দান করেছেন। কিন্তু তাঁরা এ কথা ভুলে যান যে, আমার এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় কি। আমি এ গ্রন্থে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছি না, বরং কোন ঘটনাপ্রবাহ বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়েছিল, সে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি। স্পষ্ট যে, এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)–এর শাসনকালই আলোচ্য বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত হবে, হযরত আলী (রাঃ)–এর শাসনামল নয়। তিনি তাঁর শাসনাকালে যা কিছুই করেছেন, তাকে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ বলে গণ্য করা যায় না।

শেষ কথা

এ আলোচনা শেষ করার আগে সমালোচক বন্ধুদের প্রতি আমি নিবেদন জানাবো, আমার যুক্তি-প্রমাণ এবং যেসব তত্ত্ব-তথ্যের ওপর যুক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, এ সব যুক্তি-প্রমাণ থেকে আমি যে ফল আহরণ করেছি, তাদের নিকট এ সবই ভুল হলে তাঁরা সানন্দে তা প্রত্যাখ্যান করুন। কিন্তু কেবল প্রত্যাখ্যান করলেই চলবে না। তাদেরকে ইতিবাচক পন্থায় সাফ সাফ বলতে হবে ঃ

এক ঃ কুরআন এবং সুন্নার দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি এবং ইসলামের শাসন নীতি মূলত কি?

দুই ঃ খেলাফতে রাশেদার সত্যিকার বৈশিষ্ট্য কি, যার ভিত্তিতে তাকে খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত—নবুয়াতের অনুসরণে খেলাফত—বলে অভিহিত করা হয়?

তিন ঃ এ খেলাফতের পরে মুসলমানদের মধ্যে রাজতন্ত্রের আগমন ঘটেছিল কি-না?

চার ঃ যদি আপনারা দাবী করেন যে, রাজতন্ত্রের আগমন ঘটেনি, তাহলে পরবর্তী কালের রাষ্ট্রে খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত—নবুয়াতের অনুসরণে খেলাফতের— বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল কি?

পাঁচ ঃ আপনারা যদি স্বীকার করেন যে, রাজতন্ত্রের আগমন ঘটেছিল, তবে কি কারণে এবং কি ভাবে তা এসেছিল?

ছয় ঃ কোন্ পর্যায়ে রাজতন্ত্র খেলাফতের স্থান গ্রহণ করেছিল, বলে আপনি বলবেন?

সাত ঃ খেলাফতে রাশেদা এবং সে রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি? একের স্থানে অন্যের আগমনের ফলে মূলত কি পরিবর্তন সূচীত হয়েছিল?

আট ঃ ইসলামে খেলাফত এবং রাজতন্ত্র উভয়ই কি এক রকম? না, তাদের মধ্যে একটি ব্যবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে ঈপ্সিত ; আর দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি কেবল তখন বরদাস্ত করার যোগ্য যখন তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা আরও অধিক বিপর্যের কারণ বলে মনে হয়?

এ হচ্ছে সে সব প্রশ্ন যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা থেকে আজ আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষের মন-মগযকে স্তব্ধ করতে পারেন না, যারা আজ ইসলামের ইতিহাস এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ইসলামী বিভাগে অধ্যয়ন করছে। আমি এ সকল প্রশ্নের ভুল জবাব দিয়ে থাকলে আপনারা সঠিক জবাব দিন। উভয় জবাবের মধ্যে কোন্‌টি যুক্তিপূর্ণ এবং প্রমাণসিদ্ধ সাধারণ বিজ্ঞ মহল নিজেরাই সে ফায়সালা করবেন।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

আমি বক্ষমান গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রতি কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করেছি যাতে রেফারেন্স ব্যতীত কোন বিষয় উল্লেখ করা না হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ১১১ পৃষ্ঠায় একটি বিষয় কোন রেফারেন্স ছাড়াই উল্লেখিত হয়েছে। বিষয়টি ছিল এই যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ প্রথমে মোরতাদ হন। মক্কা বিজয়ের সময় হজরত ওসমান (রাঃ)-এর সুপারিশক্রমে নবী (সঃ) তাঁকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর বায়আত কবুল করেন। আবু দাউদ—মোরতাদের বিধান অধ্যায়, নাসায়ী—মোরতাদের অধ্যায়, মুস্তাদরাকে হাকেম, মাগাযী অধ্যায়, তাবাকাতে ইবনে সাআদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৬-১৪১ ; সিরাতে ইবনে হিশাম ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫১-৫২ (মিসরীয় সংস্করণ, ১৯৩৬) আল-ইস্তীআব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৮১ এবং আল-এসাবা, পৃষ্ঠা—৩০৯-এ এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ সব গ্রন্থে ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার এই যে, ইনি প্রথমে মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন এবং নবী (সঃ) তাকে ওহী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি মোরতাদ হয়ে মক্কা শরীফ চলে যান এবং অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন—এ মর্যদা দ্বারা তিনি বিপরীত ফল লাভ করে হুযুরের রেসালাত এবং কুরআন শরীফ সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়াতে থাকেন। এ কারণে মক্কা বিজয়কালে হুযুর (সঃ) যাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা কা'বার পর্দায় আত্মগোপন করে থাকলেও তাদেরকে হত্যা করো, ইনিও ছিলেন তাদের অন্যতম। এ ঘোষণার কথা শোনে তিনি তাঁর দুধভাই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তিনি তাঁকে লুকিয়ে রাখেন। মক্কায় যখন শান্তি স্থাপিত হয় এবং নবী (সঃ) মক্কাবাসীদের বায়আত গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হন, তখন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে নিয়ে হুযুরের সামনে উপস্থিত হন এবং তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে বায়আত কবুল করার আবেদন জানান। হুযুর চুপ থাকেন। তিন বার তাঁর আবেদনে চুপ থাকার পর হুযুর (সঃ) তাঁর বায়আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলেন তোমাদের মধ্যে এমন কোন ভাল লোক কি ছিল না যে, আমি যখন তার বায়আত কবুল করছিলাম না, তখন সে ওঠে তাকে হত্যা করে দেবে? আরয করা হয় যে, আমরা আপনার ইশারার অপেক্ষায় ছিলাম। হুযুর (সঃ) বলেন, চক্ষু দ্বারা গোপন ইঙ্গিত করা নবীর কাজ নয়।

সন্দেহ নেই যে, অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান প্রমাণিত হয়েছিলেন। এর পরে তাঁর দ্বারা কোন আপত্তিকর কাজ সংঘটিত হয়নি। এ জন্য হযরত

ওমর (রাঃ) তাঁকে প্রথমে হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর অধীনে একজন সামরিক অফিসার নিযুক্ত করেন পরে আবার তাঁকে মিসরের সাঈদ অঞ্চলের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু পরে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে তাঁকে মিসর সহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর জেনারেল ও সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তার অতীত জীবন যেসব লোকের সামনে ছিল তারা যদি তাকে এতবড় পদে অধিষ্ঠিত দেখে এটা অপসন্দ করে থাকে তাহলে সেটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

১. কুরআন মজীদ (কিতাবুল্লাহ)।

২. সহীহ বুখারী, ইমাম বুখারী (রঃ)।

৩. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম (রঃ)।

৪. সুনানে আবু দাউদ।

৫. সুনানে তিরমিযী।

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ্।

৭. সুনানে নাসাঈ।

৮. তাব্‌রানী।

৯. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়াহ, ইবনে কাসীর, মাতবাআতুস সা'আদাহ্ মিসর।

১০. আল-বায়ান ওয়াত তাব্‌ঈন, আল-জাহেয, মাতবাআতুল ফুতুহিল আদাবিয়্যাহ, মিসর, ১৩৩২ হিজরী।

১১. আল-জাওহারাতুল মুনীফা ফী শারহি ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আবু হানিফা (রঃ), মুল্লা হোসাইন, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, ১৩২১ হিজরী।

১২. আদদুরারুল কামেনা, ইবনে হাজার আসকালনী, দায়েরাতুল মাআরেফ হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৪৮ হিজরী।

১৩. আররিয়াযুন নাযেরাহ ফী মানাকিবিল আশারাহ, মুহিব্বুদ্দীন আত্‌তাবারী, মাতবাআতু হুসাইনিয়া, মিসর, ১৩২৭হিজরী।

১৪. আস্‌-সিয়ার, ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী।

১৫. আস-সীরাতুন নববীয়্যাহ, ইবনে হিশাম, মাত্‌বাআতু মুস্তফা আল-বাবী, মিসর, ১৯৩৬।

১৬. আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৫৫ হিজরী।

১৭. আসসাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ, ইবনে হাজার আল-হায়সামী (১৫০৪—১৫৬৭ ঈসায়ী)।

১৮. আল-ইক্‌দুল ফরীদ, ইবনে আবদুরাব্বিহী, লাজনাতুত তালীফ ওয়াত তারজামাহ, কায়রো, ১৯৪০ ঈসায়ী।

১৯. আল-আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম, কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী।

২০. আল-গোফরান, আবুল আলা আল মাআরাবী, দারুল মাআরেফ, মিসর ১৯৫০ ঈসায়ী।

২১. আল-ফাস্‌লু ফিল মিলালি ওয়াল আহ্‌ওয়া ওয়ান নিহাল, ইবনে হায্‌ম, আল-মাতবাআতুল আদাবিয়্যাহ্‌, মিসর ১৩১৭ হিজরী।

২২. আল-ফারকু বাইনাল ফিরাকি, আবদুল কাহের বাগদাদী, মাতবাআতুল মাআরেফ, মিসর।

২৩. আল-ফিকহুল আবসাত, আস-সালাফী।

২৪. আল-ফিকহুল আকবর, ইমাম আবুহানিফা (রঃ)।

২৫. আল-ফিহরিস্ত, ইবনে নাদীম, মাতবাআতুর রাহমানিয়া, মিসর, ১৩৪৮ হিজরী।

২৬. আল-কাশ্‌শাফ, যামাখশারী, আল-মাতবাআতুল বাহিয়্যা, মিসর, ১৩৪৩।

২৭. আল-কামিল ফিততারীখ, ইবনে আসীর, ইদারাতুত তিবাআতিল মুনীরিয়্যাহ, মিসর, ১৩৫৬ হিজরী।

২৮. আল-মাবসূত, আস্‌সারাখসী, মাতবাআতুস সাআদাত, মিসর ১৩৬৪ হিজরী।

২৯. আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, ইবনে কোদামাহ্‌ মাতবাআতুল মানার, মিসর, ১৩৪৮ হিজরী।

৩০. আল-মুয়াত্তা, ইমাম মালেক (রঃ)।

৩১. আমালিল মুরতাযা, মাতবাআতুস সাআদাহ, মিসর, ১৯০৭ ঈসায়ী।

৩২. আল-ওয়াসিয়্যাহ, ইমাম আবুহানিফা (রঃ)।

৩৩. তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, আত্‌তাবারী আল-মাতবাআতুল ইস্তেকামা, কায়রো ১৯৩৯।

৩৪. তারীখুল খোলাফা, আস-সয়ুতী, গভর্ণমেন্ট প্রেস, লাহোর, ১৮৭০ ঈসায়ী।

৩৫. তারীখুল ওযারা, আল-জিহিশইয়ারী, ভিয়েনা সংস্করণ, ১৯২৬।

৩৬. তারীখে বাগদাদ, আল-খতীব, মাতবাআতুস সাআদাহ, মিসর, ১৯৩১।

৩৭. তুহফা-ই ইসনা আশারিয়্যাহ, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী।

৩৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায আয্‌-যাহাবী।

৩৯. মাসিক তরজমানুল কুরআন, আবুল আ'লা মওদুদী সম্পাদিত।

৪০. তাফসীরুল কুরআনিল, আযীম, ইবনে কাসীর, মুস্তফা মুহাম্মাদ প্রেস, মিসর, ১৯৩৯ ঈসায়ী।

৪১. তাফহীমাত, আবুল আ'লা মওদুদী।

৪২. তাফহীমুল কুরআন, আবুল আ'লা মওদুদী, তামীরে ইনসানিয়্যাত লাইব্রেরী, লাহোর।

৪৩. তাকমেলা (পরিশিষ্ট) তারীখে ইবনে খালদুন, আল-মাতবাআতুল কুবরা, মিসর, ১২৮৪ হিজরী।

৪৪. তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার।

৪৫. সালাসু রাসায়েল, আল-জাহেয, আল-মাতবাআতুল সালাফিয়্যাহ, ১৩৪৪ হিজরী।

৪৬. জামেউল বয়ান ফী তাফসীরুল কুরআন, ইবনে জারীর তাবারী, মাতবাআতুল আমিরিয়্যাহ, মিসর, ১৩২৪ হিজরী।

৪৭. হুসনুল মুহাযারাহ ফী আখবারে মিসরা ওয়াল কাহেরাহ আস সুয়ূতী, মাতবাআতুল শারফিয়্যাহ, মিসর, ১৩২৭ হিজরী।

৪৮. হুলইয়াতুল আওলিয়া, আবুনঈম ইসফাহানী, আল-মাতবাআতুস সাআদাহ, মিসর, ১৩৫৫ হিজরী।

৪৯. যায়লুল জাওয়াহেরিল মুযিয়্যাহ, মোল্লা আলী কারী, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ ১৩২২ হিজরী।

৫০. রেসালাতুস সাহাবাহ, ইবনুল মুকাফ্‌ফা।

৫১. রাসায়েল ও মাসায়েল, আবুল আ'লা মওদূদী।

৫২. রুহুল মাআনী, আল্লামা আলুসী, ইদারাতুত্ তিবাআতিল মুনীরিয়্যাহ, মিসর, ১৩৪৫ হিজরী।

৫৩. সীরাতু ওমারাবনিল খাত্তাব, ইবনে জাওযী।

৫৪. আল-ইসাবাহ ফী তামঈযিস সাহাবাহ, হাফেয ইবনে হাজার, মাতবাআতু মুস্তফা মুহাম্মদ, মিসর, ১৯৩৯ ঈসায়ী।

৫৫. আল-এস্তীআব ঃ হাফেয আবু ওমর ইবনে আবদুল বার্ দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য।

৫৬. সুনানে দারামী।

৫৭. আল-ইশাআহ ফী আশ্‌রাতিস সাআহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রাসূল আল-বারযাঞ্জী।

৫৮. আল-ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ, ইবনে কোতায়বা।

৫৯. শারহুস সিয়ারিল কাবীর, আস-সারাখসী, মাতবাআতুস শিরকাতে মুসাহামাতে মিসরিয়্যাহ, মিসর, ১৯৫৭ ঈসায়ী।

৬০. শারহুত তাহাবিয়্যাহ, ইবনে আবিল ইয্ আল-হানাফী, দারুল মাআরেফ, মিসর, ১৩৭৩ হিজরী।

৬১. শারহুল ফিকহিল আযহার, আল-মাগনীসাবী, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২১ হিজরী।

৬২. শারহুল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলী কারী, মাতবাআ মুজতাবাঈ, দিল্লী, ১৩৪৮ হিজরী।

৬৩. শারহু মুসলিম, ইমাম নববী।

৬৪. শারহু নাহজিল বালাগাহ, ইবনু আবিল হাদীদ, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, মিসর, ১৩২৯ হিজরী।

৬৫. শাহাদাতে হোসাইন, আবুল আ'লা মওদূদী।

৬৬. আহকামুল কুরআন ঃ কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী মিসরীয় সংস্করণ, ১৯৫৮।

৬৭. উসুদুল গাবাহ, ইবনুল আসীর।

৬৮. আল-ইস্তিকা, হাফেয আবু ওমর ইবনে আবদুল বার, আল-মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো ১৩৭০ হিজরী।

৬৯. তাবাকাত, ইবনে সাআ'দ দারু সাদের, বৈরুত, ১৯৫৭।

৭০. আকীদা-ই তাহাবিয়্যাহ, ইমাম তাহাবী।

৭১. উমদাতুল কারী, বদরুদ্দীন আইনী, ইদারাতুত তিবাআ'তিল মুনীরিয়্যাহ, মিসর।

৭২. উয়ুনুল আখবার, ইবনে কোতায়বা, মাতবাআতু দারিল কুতুব, মিসর, ১৯২৮।

৭৩. ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, মাতবাআতু কুর্দিস্তান আল-ইলমিয়্যাহ, মিসর, ১৩২৬ হিজরী।

৭৪. ফাতাওয়া বাযযাযিয়্যাহ।

৭৫. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী, আল-মাতবাআতুল খাইরিয়্যাহ, মিসর, ১৩২৫ হিজরী।

৭৬. ফাতহুল কাদীর, ইবনে হুমাম।

৭৭ ফাওয়াতুল ওয়াফায়াদ, মুহাম্মাদ ইবনে শাকের আল-কাতবী, মাতবাআতুস সাআ'দাহ, মিসর।

৭৮. ফায়যুল বারী, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মজলিসে ইলমী, ডাভিল, ১৯৩৮।

৭৯. আহকামুল কুরআন ঃ আবুবকর আল-জাস্সাস আল-মাতবাআতুল বাহিয়্যাহ, মিসর, ১৩৪৭ হিজরী।

৮০. কিতাবুল আগানী, আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, মাতবাআতুল মিসরিয়্যাহ, বুলাক, মিসর, ১২৮৫ হিজরী।

৮১. কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফেয়ী (রঃ)।

৮২ কিতাবুল হায়াওয়ান, আল-জাহেয, আল-মাতবাআ'তুত তাকাদ্দুম, মিসর, ১৯০৬।

৮৩. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) আল-মাতবাআতুস সালাফিয়্যাহ, মিসর, ১৩৫২ হিজরী।

৮৪. কিতাবুস সুলুক, আল-মাকরিযী, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৪।

৮৫. কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরিস্তানী।

৮৬. কিতাবুল মীযান, আশ-শিরানী, আলমাতবাআতুল আযহারিয়্যাহ, মিসর ১৯২৫।

৮৭. কিতাবুল মাগাযী, ওয়াকেদী।

৮৮. কিতাবুস সিয়ার, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী।

৮৯. কাশফুয যুনুন, হাজী খলীফা।

৯০. কানযুল ওম্মাল, শায়খ আলী মুত্তাকী, দায়েরাতুল মা'আরেফ, হায়দরাবাদ, ১৯৫৫।

৯১. লিসানুল মীযান, ইবনে হাজার।

৯২. মুহাদারাতুল উদাবা, রাগেব ইসফাহানী, মাতবাআতুল হিলাল, মিসর, ১৯০২।

৯৩. মিরআতুল জানান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান, আল-ইয়াফেয়ী, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দরাবাদ, ১৩৩৭ হিজরী।

৯৪. মুরুজুয যাহাব, আল-মাসউদী, মিসর ১৩৪৬ হিজরী।

৯৫. মুস্তাদরাক, হাকেম।

৯৬. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী, হায়দারাবাদ, ১৩২১ হিজরী।

৯৭. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, মিসর, ১৯৪৯।

৯৮. মিশকাতুল মাসাবীহ।

৯৯. মু'জামুল বুলদান, ইয়াকুত হামাবী, বৈরুত, ১৯৫৭।

১০০. মাফাতীহুল গায়েব ইমাম, রাযী, মিসর, ১৩২৪ হিজরী।

১০১. মিফতাহুস সাআদাহ, তাশ কুবরাযাদাহ, হায়দরাবাদ, ১৩২৯ হিজরী।

১০২. আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, রাগেব ইসফাহানী, মিসর, ১৩২২ হিজরী।

১০৩. মাকালাতুল ইসলামিইয়্যীন, আল-আশআরী, কায়রো।

১০৪. আল-মুকাদ্দেমা, ইবনে খালদুন, মিসর।

১০৫. মানাকেবুল ইমাম আবি হানীফা ওয়া ছাহেবাইহে, আয-যাহাবী, মিসর, ১৩৬৬ হিজরী

১০৬. মানাকেবুল ইমাম আযম, ইবনুল বায্যায্ আল–কারদারী, হায়দরাবাদ, ১৩২১ হিজরী।

১০৭. মানাকেবুল ইমাম আযম আবি হানীফা, আল–মুয়াফ্ফাক আল–মাক্কী, হায়দরাবাদ, ১৩২:
হিজরী।

১০৮. মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমিয়াহ, মিসর ১৩২২ হিজরী।

১০৯. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়াম, ইবনে খাল্লেকান, মিসর, ১৯৪৮।

১১০. হেদায়াহ।

১১১. ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া, ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ), ইবনে তাইমিয়া একাডেমী, করাচী।

খেলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সাহাবীদের সর্বসম্মত মত এই ছিল যে, খেলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক পদ্ধতি। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খেলাফত নয় বরং তা বাদশাহী–রাজতন্ত্র। খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবায়ে কেরামগণ পোষণ করতেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) তা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

"এমারাত (অর্থাৎ খেলাফত) হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে, আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।" –(৮১ – ৮২ পৃঃ)